2 – year B. Ed Programme

Part – I

Method Paper : বাংলা

UNIVERSITY OF BURDWAN

DIRECTORATE OF DISTANCE EDUCATION

Golapbag, P.O – Rajbati,

Burdwan – 713104

পাঠ-প্রণেতা

ডঃ সেলিমউদ্দিন শেখ

অ্যাসিস্টান্ট প্রফেসর
সোনার তরী কলেজ অফ এডুকেশন, বর্ধমান

যুগ্ম সম্পাদক

অধ্যাপক তুহিন কুমার সামন্ত

শিক্ষা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ শাঁওলী চক্রবর্ত্তী

বিভাগীয় প্রধান (বি.এড)
ডিরেক্টরেট অফ ডিসট্যান্স এডুকেশন,
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

গ্রন্থসত্ত্ব © ২০১৬

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান—৭১৩ ১০৪
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

প্রকাশনা

ডিরেক্টর, দূরশিক্ষা অধিকরণ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ

সরস্বতী প্রেস লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা - ৭০০ ০৫৬

সম্পাদকের নিবেদন

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে দূরশিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে ১৯৯৪ সাল থেকে। আর দূরশিক্ষার মাধ্যমে বি.এড. চালু করার পরিকল্পনাটি রূপায়িত হয়েছে ২০১৪ সালে, যা দূরশিক্ষা অধিকরণের তথা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বড় প্রাপ্তি। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এই প্রচেষ্টা এই প্রথম। ভারতের মতো জনবহুল ও উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষক-শিক্ষিকার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য এবং এই পেশামূলক কোর্সটির বিস্তার ঘটানোর জন্য এই কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

বি.এড. কোর্সটি NCTE-র (National Council For Teacher Education) নিয়মানুসারে দ্বি-বার্ষিক কোর্স হিসাবে কার্যকরী হয়েছে। Part-I ও Part-II-এর চারটি করে আবশ্যিক পেপার এবং সর্বমোট ১২টি মেথড পেপারের পাঠ্যবিষয়গুলি যাতে ছাত্রছাত্রীদের কাছে সহজবোধ্য হয় এবং অন্য কারও সাহায্য ছাড়াই যাতে তারা তা অনুধাবন করতে পারে, সেজন্য প্রতিটি পেপারের জন্য একটি পাঠ্যপুস্তক আবশ্যিক হয়ে পড়ে, যা কিনা সম্পূর্ণভাবে এখানকার পাঠক্রম অনুসারী। এই কাজটি সুসম্পন্ন করার জন্য দূরশিক্ষা অধিকরণ; বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগ এবং অন্যান্য অনুমোদিত কলেজগুলি থেকে দক্ষ অধ্যাপক/অধ্যাপিকা নিযুক্ত করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই যথাযোগ্য মর্যাদায় তাঁদের কাজটি সম্পন্ন করেছেন। তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

দূরশিক্ষা অধিকরণের অধিকর্তা ডঃ দেবকুমার পাঁজা মহাশয় এই কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনা করেছেন। উপ-অধিকর্তা শ্রী অংশুমান গোস্বামীর অকুণ্ঠ সহযোগিতার ফলেই কাজটি সংক্ষিপ্ত সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। তাঁদের উৎসাহ ও পরামর্শ প্রতি মুহূর্তে আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছে।

দূরশিক্ষা অধিকরণের অন্যান্য সকল আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দ এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের ধন্যবাদ জানাই। মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ও কর্মীদের সহযোগিতা অবশ্য-স্মরণীয় এবং সামগ্রিকভাবে সবক্ষেত্রে আমাদের পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাই বি.এড.-এর দুইজন কোর-ফ্যাকাল্টি ডঃ সোমনাথ দাস এবং শ্রী অর্পণ দাসকে।

আগস্ট, ২০১৬

প্রফেসর তুহিন কুমার সামন্ত

ডঃ শাঁওলী চক্রবর্ত্তী

CONTENTS

	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	বিভাগ - ক	
একক - ১ :	পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বা সমধর্মী পর্ষদের নবম ও দশম শ্রেণীর উপযোগী বাংলা বিষয়ের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী গদ্য, কবিতা ও ব্যাকরণ	১
একক - ২ :	বিষয় ও শিক্ষককল্পে বিষয় বিশ্লেষণ	১২
	বিভাগ - খ	
একক - ৩ :	মাতৃভাষা-শিক্ষা	২৭
একক - ৪ :	বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার পদ্ধতি সমূহ	৫৪
একক - ৫ :	বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষণ কৌশল সংক্রান্ত পদ্ধতি	১২৩

বিভাগ - ক

একক-এক : পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বা সমধর্মী পর্ষদের নবম ও দশম শ্রেণীর উপযোগী বাংলা বিষয়ের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী গদ্য, কবিতা ও ব্যাকরণ।

বিন্যাস :

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ উদ্দেশ্য

১.৩ শ্রেণীকক্ষে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ (নবম ও দশম শ্রেণীর ক্ষেত্রে)

১.৪ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বা সমধর্মী পর্ষদের নবম ও দশম শ্রেণীর উপযোগী বাংলার

পাঠ্যসূচীর দৃষ্টান্তসমূহ (প্রাসঙ্গিক প্রশ্নোত্তর সমেত)

১.৫ সংক্ষিপ্তকরণ

১.৬ অনুশীলনী

১.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১.১ প্রস্তাবনা

'ভাষাশিক্ষা'-র সঙ্গে 'মাতৃভাষা' শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে ভাবপ্রকাশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল মাতৃভাষা। বাংলা ভাষার পাঠ্যসূচীতে গদ্য, কবিতা, ব্যাকরণ প্রভৃতি স্থান করে নিয়েছে। জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখার (২০০৫) অনুসরণে একথা ঘোষণা করা যায় যে, মাতৃভাষার পাঠক্রম পাঠ্যপুস্তকের সীমানা অতিক্রম করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উত্তীর্ণ হয়ে উঠবে। সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এর উত্তরণ ঘটবে। বাংলা পাঠক্রমের মূলনীতি হবে সার্বিকভাবে মনস্তাত্ত্বিক এবং বিজ্ঞানসম্মত। নবম এবং দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক স্তরের অন্তর্গত। এই বয়সের শিক্ষার্থীদের সাহিত্যবোধ ও সৃজনশীলতা বাড়িয়ে তোলার জন্যে তাদের মননের উপযোগী পাঠ্যসূচী রচনা করার চেষ্টা করা হয়। নবম ও দশম শ্রেণীর উপযোগী গদ্য ও কবিতা ছাড়াও সেক্ষেত্রে অনুবাদ এবং ব্যাকরণ শিক্ষাদানে জোর দেওয়া হয়। এভাবেই বিভিন্ন শাখায় বিন্যস্ত করে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদানের মাধ্যমে নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক তথা সামাজিক বিকাশ ঘটে থাকে।

১.২ উদ্দেশ্য

আলোচ্য এককটি পাঠের পর আপনি —

- ভাষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারবেন।
- ভাষাশিক্ষার সঙ্গে মাতৃভাষার যোগাযোগ স্মরণ করতে পারবেন।

- ভাষা-শিখনে পাঠ্যক্রমের কার্যকারিতা সম্পর্কে সচেতন হবেন।
- শ্রেণীকক্ষে (বিশেষত নবম ও দশম ক্ষেত্রে) বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি জানতে আগ্রহী হবেন।
- মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সার্বিক শিক্ষণ-কৌশল প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হবেন।
- পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বা সমধর্মী পর্ষদের নবম ও দশম শ্রেণীর উপযোগী বাংলার পাঠ্যসূচী অনুযায়ী গদ্য, কবিতা অথবা ব্যাকরণের অংশবিশেষ শ্রেণীকক্ষে যথাযথভাবে পাঠদানের প্রচেষ্টা করবেন।
- পাঠদানকালে শিক্ষক বা শিক্ষিকা যেন সর্বদা শিক্ষার্থীর আগ্রহ, মনোযোগ এবং চাহিদাকে গুরুত্ব দেন — সে সম্পর্কে আরো বেশি সচেতন হবেন।

১.৩ শ্রেণীকক্ষে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ (নবম ও দশম শ্রেণীর ক্ষেত্রে)

নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের বয়স, চাহিদা এবং পরিণমন অনুযায়ী পাঠক্রম রচনা করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। কতগুলি দিক এক্ষেত্রে আলোকপাত করা প্রয়োজন —

- নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি পরিণত, তাই তাদের মননের ওপর গুরুত্ব দিয়ে শ্রেণীকক্ষে ভাষাশিক্ষা দান করতে হবে।
- নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বয়সোপযোগী গদ্য, কবিতা, ইত্যাদি পাঠের মধ্যে দিয়ে যেন সৃজনশীলতা, নান্দনিকতাবোধ বৃদ্ধি পায় লক্ষ্য রাখতে হবে।
- এই বয়সের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেইসঙ্গে জাতীয়তাবোধ আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে।
- পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও সহায়ক গ্রন্থপাঠে এই বয়সী শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তুলতে হবে এবং তাদের গ্রন্থগারমুখী করে তোলার ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালানো একান্ত বাঞ্ছনীয়।
- এই বয়সের শিক্ষার্থীদের 'পাঠ দক্ষতা'-র উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে শ্রেণীকক্ষে, যাতে তাদের মধ্যে অর্জন দক্ষতা (Gathering Skill), ধারণ ক্ষমতা (Storing Skills) এবং পুনরুদ্রেক ক্ষমতার (Retrieval Skills) সমন্বয়ন ঘটে।

১.৪ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বা সমধর্মী পর্ষদের নবম ও দশম শ্রেণীর উপযোগী বাংলার পাঠ্যসূচী র দৃষ্টান্তসমূহ (প্রাসঙ্গিক প্রশ্নোত্তর - সমেত/অগ্রগতি যাচাই-এর সাপেক্ষে উত্তর সংকেত)

অগ্রগতি যাচাই করুন - ১

১। 'পতিত হেরিয়া কাঁদে' - শীর্ষক পদে পদকর্তা গোবিন্দদাস নিজেকে বঞ্চিত মনে করেছেন কেন?

উত্তর - নবম শ্রেণীর পাঠ্য 'পতিত হেরিয়া কাঁদে' শীর্ষক পদে পদকর্তা গোবিন্দদাস নিজেকে 'বঞ্চিত'

বলে মনে করেছেন। এর কারণ শ্রী চৈতন্যদেবের অপূর্ব প্রেমসম্পদ লাভ করে জগৎবাসী পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গোবিন্দদাস প্রত্যক্ষভাবে ঐ সুমধুর প্রেমধনে ধনী হতে পারেননি। কারণ তার মৃত্যু হয় আনুমানিক ১৫৩৪ খ্রীস্টাব্দে। সেকারণেই কবি স্বয়ং শ্রী চৈতন্যদেবকে প্রত্যক্ষ করতে পারেননি এবং মহাপ্রভুর কৃপা ও করুণা থেকে নিজেকে বঞ্চিত মনে করে আক্ষেপের সঙ্গে বলেছেন,

..... ''প্রেমধনের ধনী করল অবনি

বঞ্চিত গোবিন্দদাস।''

অগ্রগতি যাচাই করুন - ২

২। 'পরিবেশ দূষণ' প্রবন্ধে জীবজগতের জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয় কোনগুলিকে বলা হয়েছে?

উত্তর - 'পরিবেশ দূষণ' প্রবন্ধে সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র জীবজগতের জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয় হিসেবে আলো, বাতাস, খাদ্য, ও জলের কথা বলেছেন।

অগ্রগতি যাচাই করুন - ৩

৩। বাংলা ভাষায় কতগুলি উপভাষা আছে?

উত্তর - বাংলা ভাষায় পাঁচটি উপভাষা আছে। যথা - রাঢ়ী, বরেন্দ্রী, বঙ্গালী, ঝাড়খণ্ডী, এবং কামরুপী বা রাজবংশী উপভাষা।

অগ্রগতি যাচাই করুন - ৪

৪। গঠন অনুসারে বাক্য কয়প্রকার?

উত্তর - গঠন অনুসারে বাক্য চারপ্রকার - সরল বাক্য, জটিল বাক্য, যৌগিক বাক্য এবং মিশ্র বাক্য।

অগ্রগতি যাচাই করুন - ৫

৫। ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় যেকোনো দুটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লিখুন।

উত্তর - i) সানুনাসিক স্বরধ্বনির প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন - উট, চাঁ, চঁ, গঁধাচ্ছে ইত্যাদি।

ii) 'ও'- কারের স্থানে 'অ'- কার ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা যায়। যেমন - লোক > লক, শোক > শক, রোগ > রগা ইত্যাদি।

অগ্রগতি যাচাই করুন - ৬

৬। ''উলঙ্গ রাজা'' - কবিতাটিতে ''রাজা'' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

উত্তর - উলঙ্গ রাজা কবিতাটি কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর এক অনবদ্য সৃষ্টি। টলস্টয়ের রচিত ''The Naked King''-গল্প অবলম্বনে রচিত হলেও কবি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের চরিত্র অঙ্কন

করেছেন। এখানে রাজা বলতে গল্পে বর্ণিত রাজা মাত্র বোঝানো হয়নি, রূপকার্থে বর্তমান ক্ষমতাসীন রাজশক্তি ও শাসকশক্তিকে বোঝানো হয়েছে। রাজার পরিষদবর্গ স্বার্থান্বেষী, তোষণকারীর দল, যারা 'পরান্নভোজী, কৃপাপ্রার্থী, উমেদার ও প্রবঞ্চক'।

অগ্রগতি যাচাই করুন - ৭

৭। 'মুক্তির কাঁটা' - গল্পে গল্পকার - রমেশচন্দ্র সেন বংশী চরিত্রের মুক্তিপথের কাঁটা বলতে কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর - রমেশচন্দ্র সেনের 'মুক্তির কাঁটা' গল্পে দারিদ্র্য ক্লিষ্ট চর্মকার বংশীর কঠিন জীবন সংগ্রামের বৃত্তান্ত উপস্থাপিত হয়েছে। দারিদ্র্যের জন্যই সে সংসারী হয়নি। এক জ্ঞাতিকন্যাকে সে কন্যার মত পালন করেছিল। কিন্তু কলেরায় তারও অকাল মৃত্যু ঘটে। নিরন্ন নিঃসঙ্গ জীবনে দারিদ্র্যকে জীবনের এক বিড়ম্বনাময় অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য আত্মঘাতী হবার সংকল্প করে। কিন্তু বিষপানের পূর্বমুহূর্তে তার কাছে বেশি মজুরির প্রতিশ্রুতি নিয়ে এক খদ্দের এসে হাজির হয়। এতে বংশীর মধ্যে জীবনতৃষ্ণা ফিরে আসে, সে বিষপানের বদলে আবার জুতো সেলাই করতে বসে গেল। এই প্রবল জীবনতৃষ্ণাই বংশীর অস্বাভাবিক মুক্তিপথের কাঁটা। সে বুঝতে পারল মুক্তি আত্মহননে নয়, 'কণ্টকময় কঠোর সংগ্রামেই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা। আর সেই সংগ্রামকে মুখোমুখি করাই উচিত।

অগ্রগতি যাচাই করুন - ৮

৮। জসীমউদ্দিনের 'কবর' কবিতাটির কথক তাঁর পৌত্রের কাছে কীভাবে দুঃখ করতে চেয়েছেন?

উত্তর - জসীমউদ্দিনের লেখা 'কবর' কবিতাটি কথক তিরিশ বছর আগে হারিয়েছেন তাঁর প্রিয়তমা পত্নীকে। তাঁর নাতিকে সেই প্রিয়তমা পত্নীর কবর দেখাতে নিয়ে গিয়ে তিনি ফিরে গেছেন অতীতের মধুর দিনগুলিতে। তাঁর স্মৃতিপটে ভিড় করেছে সুখী দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন ঘটনা। এপ্রসঙ্গে তিনি তাঁদের দাম্পত্য জীবনের গভীর বন্ধনের কথাও ব্যক্ত করেছেন। কবিতাটির কথক জীবনের বেশির ভাগ সময় কৃষিকর্মে নিযুক্ত ছিলেন বলে মাটির সঙ্গে রয়েছে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক এবং সেই মাটিতেই তাঁর বহুপ্রিয়জন আজ শায়িত রয়েছে - এভাবেই মাটির প্রতিও তাঁর গভীর মমত্ববোধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুর পর কথকের দীর্ঘজীবনে আরও বহু প্রিয়জনের মৃত্যুশোকে তাঁকে উদ্বেল করেছে, শূন্য থেকে শূন্যতর করেছে তাঁর হৃদয়। যাকেই তিনি আঁকড়ে ধরেছেন, সেই তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে। তাই এই দুঃখময় জীবনের ভার লাঘবের জন্য তিনি তাঁর নাতিটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে সুখের সন্ধান করেছেন।

অগ্রগতি যাচাই করুন - ৯

৯। 'মৃত্যুঞ্জয়' - কবিতার শেষ ছত্রে কবির (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) উপলব্ধি সংক্ষেপে তুলে ধরুন।

উত্তর - 'মৃত্যুঞ্জয়' - কবিতাটির শেষে কবির আত্মোপলব্ধি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কবিতার শেষ ছত্রে দেখা যায় কবির মধ্যে সেই মূল্যবান আত্মোপলব্ধি জেগে উঠেছে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁর ভয় দূর হয়েছে।

মৃত্যুর অশনি সংকেতকে তাঁর নিজের চেয়ে ছোট বলে মনে হয়েছে, যা লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। এখানে মৃত্যুর কঠিন আঘাত কবিকে যেন এক ত্যাগ এবং সহিষ্ণুতার প্রতীক করে তুলেছে। মৃত্যু মানবজীবনের এক চরম পরিণতি, তাকে তিনি আগের মত দেখে চমকে ওঠেননি। বরং মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবি বলতে পেরেছেন যে তিনি 'মৃত্যুঞ্জয়ী'! মৃত্যু মানবজীবনের ধ্বংসকে প্রভাবিত করলেও সম্পূর্ণ নিঃশেষ করতে পারে না তার অমর সৃষ্টিকে। আর সেই সৃষ্টির মাঝে কবি হবেন মৃত্যুঞ্জয়; এভাবেই মৃত্যুকে জয় করার আত্মোপলব্ধি ঘটেছে তাঁর।

অগ্রগতি যাচাই করুন - ১০

১০। 'বলাই' - গল্পে নাম চরিত্রটির নিঃসঙ্গতা লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কীভাবে দূর করতে চেয়েছেন?

উত্তর - রবীন্দ্র 'গল্পগুচ্ছ' থেকে 'বলাই' গল্পটি সঙ্কলিত হয়েছে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে প্রবাসী পত্রিকায়।

মাতৃহীন বালক বলাই। সে তার সন্তানহীন কাকা ও কাকীমার কাছে মানুষ। শৈশবে মাতৃহারা বলাই বাবার সান্নিধ্য থেকেও বঞ্চিত হয়। প্রকৃতির ভাবরাজ্যে একাত্ম বলাই গাছপালার সঙ্গে সময় কাটাত। তার মধ্যে ছিল না কোন বালক সুলভ স্বাভাবিক আচরণ। শুধু বাগানে ঘুরে ঘুরে গাছেদের সঙ্গে সে কথা বলতো। প্রকৃতির সান্নিধ্যে বলাই খুঁজে পেত মনের শান্তি। দূর হয়ে যেত তার নিঃসঙ্গতা। ঠিক যেমন রবীন্দ্রনাথ 'সুভা' চরিত্রের মধ্যে এই প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা ফুটিয়ে তুলেছিলেন। বহু চরিত্রের মধ্যেই বিভিন্ন প্রকারে শূন্যতা দূর করে প্রকৃতির প্রতি একাত্মতা, নিবিড় টান চিত্রিত করে গেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

অগ্রগতি যাচাই করুন - ১১

১১। 'বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিৎ' - কাব্যাংশে (কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত) ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে বারবার কোন অনুরোধ জানিয়েছিলেন?

উত্তর - নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে দ্বাররক্ষীর ভূমিকায় বিরাট ত্রিশুল হাতে বিভীষণকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ইন্দ্রজিৎ বুঝতে পারলেন যে, লক্ষ্মণ বিভীষণের সহায়তায় যজ্ঞাগারে প্রবেশ করতে পেরেছেন। নিজের পিতৃব্যকে এভাবে শত্রুর ভূমিকায় দেখে ইন্দ্রজিৎ বিষণ্ণ কণ্ঠে বলেন যে, রাবণের সহোদর ভাই, অন্য একটি ভাই শিবতুল্য কুম্ভকর্ণ, তাঁর ভাই-এর পুত্র স্বয়ং ইন্দ্রজিৎ এবং সতীরমণী নিকষার পুত্র বিভীষণের পক্ষে চিরশত্রু লক্ষ্মণকে নিজের গৃহে প্রবেশের পথ দেখানো উচিত হয়নি। লক্ষ্মণের উপস্থিতিতে লঙ্কাপুরী কলঙ্কিত, সেই কলঙ্ক দূর করার জন্য ইন্দ্রজিৎ পিতৃব্যকে পথ ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলেন। কারণ তিনি চান অস্ত্র এনে লক্ষ্মণকে বধ করতে।

বিভীষণ ইন্দ্রজিৎ -এর অনুরোধ রাখতে অক্ষম, কারণ তিনি রামচন্দ্রের দাস, প্রভুর বিরুদ্ধতা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। খুল্লতাত বিভীষণের এমন কাপুরুষের মতো কথায় ইন্দ্রজিৎ ধিক্কার জানিয়ে বলেন রামচন্দ্রের সঙ্গে বিভীষণের এই সম্পর্ক মানায় না। তিনি উপমা দিয়ে বলেন, মহাদেবের ললাটে শোভিত চাঁদ কখনও ধূলায় লুণ্ঠিত হয় না, স্বচ্ছ সরোবর ছেড়ে রাজহাঁস কখনও পঙ্কিল জলে বিচরণ করে না, পশুরাজ সিংহ কখনো শৃগালের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে না। বিভীষণের এসব কথা অজানা নয়। লক্ষ্মণ অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন, তা না হলে

অস্ত্রহীন যোদ্ধাকে কখনও সংগ্রামে আহ্বান করত না। লক্ষ্মণের যুদ্ধরীতির কথা শুনলে লঙ্কাপুরীর শিশুরাও হাসবে। তিনি বিভীষণকে আবারও পথ ছেড়ে দিতে অনুরোধ করেন, কারণ তিনি চান লক্ষ্মণকে উচিত শিক্ষা দিতে। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বিভীষণকে জানান যে কোনো দেবশক্তিই লক্ষ্মণকে তাঁর হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, তাঁদের জন্মভূমিতে লক্ষ্মণের এরূপ অক্ষত্রিয় সুলভ আচরণ বিভীষণেরও সহ্য করা উচিত নয়। ইন্দ্রজিৎ বারংবার বিভীষণকে পথ ছেড়ে দিতে অনুরোধ করেন এভাবেই আলোচ্য কাব্যাংশে।

অগ্রগতি যাচাই করুন - ১২

১২। 'লোহার ব্যথা' - কবিতাটিতে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কীভাবে সমাজ সচেতনতা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর - 'লোহার ব্যথা' কবিতায় কবি নিপীড়ক কামার ও নিপীড়িত লোহার রূপকে সমাজে গরীব মানুষের পীড়ন ও শোষণের চিত্রটি তুলে ধরেছেন। কবি দেখিয়েছেন লোহাকে ভোর থেকে গভীর তার পর্যন্ত কামারের হাতে নির্যাতন সহ্য করতে হয়।

কামারের চাতুরিতে, হাতুরি লোহা দিয়ে তৈরি হলেও জাতভাই লোহাকে পেটানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। এই রূপকের মাধ্যমে কবি বলতে চেয়েছেন যে, শোষক শ্রেণী সুকৌশলে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং একে অন্যের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে। এর থেকে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি নেই। কারণ শোষক শ্রেণী মাঝে মাঝে শোষিত শ্রেণীকে মুনাফার লোভ দেখালেও শোষিত শ্রেণী কখনোই উৎপাদকের স্থান দখল করতে পারে না। তাই শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের যন্ত্রণা একইভাবে সমাজে থেকে যায়। 'লোহার ব্যথা' কবিতাটির মাধ্যমে সেই শোষণ ও অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরে সমস্ত সমাজ ও সমাজে অবস্থিত মানুষকে সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন।

অগ্রগতি যাচাই করুন - ১৩

১৩। 'ছেঁড়া তার' - নামকরণটির মধ্য দিয়ে নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী রহিমের কোন্ যন্ত্রণার কথা তুলে ধরতে চেয়েছেন?

উত্তর - বাংলার ১৩৫০ সন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে চোরাকারবারি, কালোবাজারি, সরকারী কর্মচারীদের চক্রান্তে বেআইনিভাবে অত্যাবশ্যক জিনিস মজুত করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করলে সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ হয়। এই দুর্ভিক্ষ বাংলার ইতিহাসে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। তুলসী লাহিড়ীর ছেঁড়া তার নাট্যকটি এই মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত। এই নাট্যাংশে দুর্ভিক্ষপীড়িত উত্তরবঙ্গের লোকজীবনের এক চাষী পরিবারের করুণ ছবি ফুটে উঠেছে। যেখানে গরীব মুসলমান কৃষক রহিম এই দুর্ভিক্ষের দুর্দিনে দিশেহারা হয়ে পড়ে। দিনের পর দিন না খেয়ে থাকতে হয় স্ত্রী-পুত্র নিয়ে। রহিমের প্রিয় বাদ্যযন্ত্র দিলরুবাটি হাতে নিয়ে তাকে বলতে শোনা যায় যে, জীবনটাও যেন এই বাজনাটার মতো। ভালো করে জীবনরূপ বাদ্যযন্ত্রটি বাজাতে পারলে যেন কত সুর ওঠে! রহিম তার 'দিলরুবার' মতো নিজের জীবনকে অনেক সুর মেলাবার চেষ্টা

করেছে কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে বারবার। ছিঁড়ে গেছে যেন নিজের জীবনের তার - মর্মান্তিক সামাজিক পরিস্থিতির কবলে পড়ে তার স্ত্রী ফুলজানকে সে তালাক দিয়েছে। গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে গেছে রহিম। সেই ছেঁড়া তার জোড়া লেগে রহিমের জীবনে আর কোনো সুর বেজে উঠবে না। এভাবেই রহিমের জীবনের বিপর্যয় যেন সমস্ত দেশ-কাল-সমাজের এক করুণ মর্মান্তিক ছবি এঁকে দিয়ে গেল - যেখানে ছেঁড়া তার জোড়া লেগে তার প্রিয় বাজনাটি কখনোই বেজে উঠলো না।

অগ্রগতি যাচাই করুন - ১৪

১৪। ''বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' - কবিতায় কবি জীবনানন্দ দাশের উপলব্ধ সত্যটি কী?

উত্তর - কবিতায় এই বাংলাকেই মাতৃরূপ কল্পনা করেছেন কবি জীবনানন্দ দাশ। অন্য কোনো দেশ অপেক্ষা মাতার মুখচ্ছবিই কবির কাছে শ্রেষ্ঠ; তাই সেখানে যেন পৃথিবীর রূপও তাঁর কাছে ম্লান হয়ে গেছে।

কবি একাগ্র চিত্তে, 'অনাস্বাদিত' ভোরের, ঘুমঘোর বাংলা প্রকৃতির রূপময় চিত্র তুলে ধরেছেন। সেইসঙ্গে, মধ্যযুগীয় অনুষঙ্গ তথা লোকপুরাণ 'মনসামঙ্গল' কাব্যের প্রসঙ্গ এনে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এক অপূর্ব যোগসূত্র ঘটিয়েছেন।

আজকের দৃশ্যমান বাংলা প্রকৃতির রূপ শুধু কবির চোখেই সত্য নয়; এরূপ প্রাচীন কাব্য-কাহিনীর যুগেও একই রকম ছিল। আলোচ্য 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কবিতায় কবি জীবনানন্দ দাশ বাংলার এই চিরন্তন সৌন্দর্যকেই অপরূপ কাব্যময়তার মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছেন বারংবার বিভিন্ন ছত্রে বিচিত্র বর্ণনার মধ্যে দিয়ে। 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' - কবিতায় এই নামকরণটিও সেক্ষেত্রে কবির বাংলাপ্রাণা আত্মোপলব্ধির মধ্যে সার্থক হয়ে উঠেছে। 'বঙ্গমাতার' কাছে পৃথিবীর অন্যান্য সৌন্দর্য, আকর্ষণ যেন ম্লান হয়ে গেছে কবির চেতনায়।

অগ্রগতি যাচাই করুন - ১৫

১৫। 'হারুন সালেমের মাসি' (মহাশ্বেতা দেবী) - গল্পের কাহিনী সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর - অজ পাড়াগাঁয়ে, জীর্ণ এক কুঁড়েঘরে জন্ম-খোঁড়া বিধবা (গৌরবির) বাস। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে তাকে দেখে না, থাকে অন্যত্র। শাক, পাতা, গুগলি তোলার জন্য তাকে প্রতিবেশী হারার মায়ের উপর নির্ভর করতে হয়। সেগুলি সে বিক্রি করে যশির কাছে। গল্পের শুরুতে মুসলমান রুগ্ন শিশু হারা গৌরবি মাসিকে জানায়, তার মা ডাকলে সারা দিচ্ছে না। অনাথ হয়ে গেলে হারা। এই অনাথ শিশুর দায়িত্ব নিতে তার কাকা রাজি নয়। হারা তাই গৌরবির কাছে চলে এলে গৌরবি অগত্যা তাকে আশ্রয় দেয়। নিজে একগাল খুদ খায় ও হারাকেও খাওয়ায়। কিন্তু অনাথ হারা যদি গৌরবির কাছে থাকে তাহলে গৌরবির মহাবিপদ কারণ গৌরবির নিজেরই চলে না, পরের জমিতে বাস, তার উপর হারা মুসলমানের ছেলে। পরদিন সকালে গৌরবি হারাকে দিয়ে যশিকে ডেকে পাঠায়। আর হারাকে বলে সে যেন খালপাড় থেকে থানকুনি পাতা তুলে আনে। আর কেউ জিজ্ঞেস করলে সে যেন বলে সে মাসির উঠোনে শুয়েছিল। ঘরে নয়। গৌরবি পরম স্নেহে হাঁড়ির মধ্যে পড়ে থাকা মিয়োনো চালভাজা ছোট্ট পোটলা করে হারাকে দিয়ে বলে সে এই খাবার খেয়ে যেন

জল খায়। হারা খালপাড়ে গেলে গৌরবি চাল, ডুমুর, মোচার কচি ফুল নুন দিয়ে উনুনে চাপিয়ে ভাবতে থাকে কী করে সে হারার সাথে একসাথে খাবে। কেমন করে জাতধর্ম বজায় রাখবে? তার সমাজের লোকই বা কী বলবে? ইতিমধ্যে যশির সঙ্গে কথা হয় গৌরবির। যশি হারাকে শহরে ছেড়ে দিয়ে আসতে বলে। সেখানে সে ভিক্ষে করে খাবে। যশির এই প্রস্তাব মানতে পারে না গৌরবি। শেষে অনেক ভেবেচিন্তে গৌরবি নিজের বিবাহিত ছেলে নিবারণের কাছে যায় একটু আশ্রয়ের খোঁজে। ছেলে সে সময় বাড়িতে ছিল না। ছেলের বউ ভালো ব্যবহারই করে। গৌরবি বউয়ের কাছে একশ টাকা নেবার জন্য আবদার করে। সে একটা গরু কিনবে যাতে দুধ, ঘুঁটে বেচে তাদের দুটি প্রাণীতে চলে যায়। দুটি প্রাণী শুনে বউয়ের প্রশ্নে হারার কথা এসে পড়ে। পরে নিবারণ বাড়ি ফিরে সেকথা শুনে মায়ের উপর প্রচণ্ড রেগে গিয়ে হারাকে বিদেয় করতে বলে। হারাকে বিদেয় করতে পারলেই সে গৌরবিকে আশ্রয় দেওয়ার কথা ভাববে। সে হারাকে মুসলমানদের সমাজে পাঠিয়ে দিতে বলে। এরপর নানান কথায় ছেলে ও বউয়ের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া বেধে গেলে গৌরবি হারাকে নিয়ে তার কুঁড়েঘরে ফিরে আসে। কদিন পরে মুকুন্দ এসে হারাকে বিদেয় করে গৌরবিকে ছেলের কাছে চলে যেতে বলে কারণ পালবাবুদের কাছে সে তার ভিটেটা বেচে দেবে, তারা এঘরে গুদাম বানাবে। মুসলমান ছেলেকে গৌরবি ঘরে তুলেছে শুনলে পালবাবুরা রেগে যাবে। দিশেহারা গৌরবি রেগে গিয়ে হারাকে দূর করে দিলে নিজের ঘরে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে হারা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলে গৌরবি বলে সে তার মাসি। সে হারাকে জানায় যে তারা শহরে চলে যাবে। সেখানে ফুটপাতে শোবে, ভিক্ষে করে দিন কাটাবে। কেউ তাদের পরিচয় জানবে না। একবার শহরের জনসমুদ্রে মিশে গেলে আর জাতিধর্মের ভয় থাকবে না। ধর্মের অসহায় ছবি এখানে ফুটে উঠেছে।

অগ্রগতি যাচাই করুন - ১৬

১৬। 'দুই বিঘা জমি'-তে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে উপেন চরিত্রের যন্ত্রণা তুলে ধরেছেন?

উত্তর - 'কাহিনী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'দুই বিঘা জমি'-তে বর্ণিত হয়েছে যে, বাংলাদেশের কোন এক গ্রামে উপেন নামে গরীব প্রজা বাস করত। তার নিজ সম্পদ বলতে ভিটাসহ দুই বিঘা জমিই শেষ সম্বল ছিল। তার বাড়ির পাশেই জমিদারের একটি বাগান ছিল। সেই বাগানটির দৈর্ঘ্য-প্রস্থের পরিমাণ সমান করার জন্য উপেনের বাড়ির উপর নজর পড়ল। জমিদার উপেনের জমি কিনে নেওয়ার প্রস্তাব জানালেন কিন্তু উপেন তার সাতপুরুষের জমিটিকে সোনার চেয়েও মূল্যবান ও মায়ের মত বলে জমি হাতছাড়া করতে অস্বীকার করে। এর ঠিক দেড়মাস পর জমিদার কৌশলে মিথ্যা ঋণের দায়ে আদালতে ডিক্রিজারি করে ঐ জমিটি কিনে নিলেন। এরপর অসহায়, নিরুপায় আশ্রয়হীন উপেন সন্ন্যাসীর বেশে নিরুদ্দেশের পথে বের হল। বছরের পর বছর উপেন মাঠে-ঘাটে, হাটে, মন্দিরে ঘুরে বেড়াতে লাগল কিন্তু উপেন কিছুতেই মাতৃভূমি বাংলাদেশকে ভুলতে পারল না। মাতৃভূমির টানে দীর্ঘ ১৫ থেকে ১৬ বছর পর পরিচিত মনোরম পরিবেশে ফিরে এসে উপেনের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তার রুগ্ন শরীরে একটু আরাম পাওয়ার জন্য অতিপরিচিত আম গাছের তলায় বসে পড়ল। মৃদুমন্দ বাতাসের দোলায় গাছে ঝুলে থাকা দুটি আম হঠাৎ তার সামনে পড়ে গেল। আম দুটি মায়ের দান হিসাবে মনে করে নিজের মাথায় ঠেকাল। এমন কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বাগানের মালী যমদূতের মতো হাজিরে হলেন এবং তাকে অকথ্য গালিগালাজ দিয়ে জমিদারের কাছে নিয়ে গেলেন। উপেন জমিদারের কাছে আম দুটি ভিক্ষা হিসাবে চেয়ে বসল। জমিদার মালীর কথামতো উপেনকে ''সাধুবেশে

চোর'' বলে গালাগালি দিয়ে অসম্মান করলেন। গালি শুনে উপেনের দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। সে দুঃখের হাসি হেসে ভাবতে লাগল তার ভাগ্যে বুঝি এমনই লেখা ছিল। যা কিনা জমিদার হলেন 'সাধু' আর সে হল 'চোর'! তার ভাগ্যের এ কী অদ্ভুত পরিনাম। 'উপেন' চরিত্রের মতই অসহায় দরিদ্র বহু প্রজা নীরবে চোখের জল ফেলে চলেছে যুগে-যুগে।

অগ্রগতি যাচাই করুন - ১৭

১৭। 'অগ্নিদেবের শয্যা'-তে প্রকৃতির ভয়াবহ ও সুন্দর রূপ কীভাবে একত্রে স্থান করে নিয়েছে?

উত্তর - দুই অভিযাত্রী বঙ্গসন্তান শংকর ও পোর্তুগিজ আলভারেজের আফ্রিকার ঘন জঙ্গলে মাঝরাতে এক অদ্ভুত শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। টর্চের আলোয় দেখা গেল বন্যজন্তুর দল ঊর্ধ্বশ্বাসে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পশ্চিম থেকে পুবের পাহাড়ের দিকে ছুটে চলেছে। এই দৃশ্যে দুজনেই হতভম্ব। পৃথিবী দুলে ওঠায় তারা পড়ে গেল মাটিতে। আলভারেজের অনুমান ভূমিকম্পই এর কারণ। কিন্তু পরক্ষণেই অজস্র বিজলির আলোয় তা আগ্নেয়গিরি বলে প্রতিভাত হল। সেখান থেকেই আসছে হাজার হাজার বোমা ফাটার মতো বিকট আওয়াজ।

শংকর ও আলভারেজ তাঁবুতে প্রবেশ করলে প্রাণের ভয়ে আশ্রয় নেওয়া একটি নেকড়ে বাঘের ছানা তাদের দৃষ্টি গোচর হয়। কোনো এক শব্দে বাইরে এসে জলন্ত কয়লার মতো পাথরে ঝোপ জ্বলতে দেখে তাঁবু গুটিয়ে তারা পুবের পাহাড়ের দিকে চলে গেল। সকালে সূর্য উঠলে অগ্ন্যুৎপাতের সৌন্দর্য ক্রমশ ম্লান হতে থাকল। অগ্ন্যুৎপাতের ছাই চারিদিককে ঢেকে ফেলেছে। রাত্রিতে হঠাৎ বিস্ফোরণে পাহাড়ের জলন্ত চূড়া উড়ে গিয়ে তাদের তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

প্রকৃতির ভয়াল ও একই সঙ্গে অসম্ভব সুন্দর এই বিরল রূপের সাক্ষী শংকরের মনে হল সভ্য সমাজ এর ভাগীদার নয়। আর আলভারেজ আবিষ্কার করলেন আগ্নেয়গিরি 'ওলডোনিয়া লেঙ্গাই' অর্থাৎ 'অগ্নিদেবের শয্যা'। শংকর তার দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রমাণ জানাল ও তার সমস্ত কষ্ট সার্থক হল। বিভূতিভূষণ অপূর্ব সুন্দর ও জীবন্ত করে এহেন প্রাকৃতিক চিত্র অঙ্কন করেছেন।

অগ্রগতি যাচাই করুন - ১৮

১৮। 'মহেশ'-গল্পে প্রসিদ্ধ গল্পকার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মূলভাবনা কী ছিল?

উত্তর - কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'মহেশ' ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে লেখক তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় গ্রামের দরিদ্র মানুষ কীভাবে সমাজে উঁচুতলার মানুষের হাতে পীড়িত ও নির্যাতিত হত তার একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত পাঠকদের সমানে তুলে ধরেছেন।

কাশীপুর নামে হিন্দু প্রভাবিত এক গ্রামের সীমানায় গফুর জোলার বাড়ী। বাড়ীটির পাঁচিল ভেঙে পড়ায় উঠোন আর পথ প্রায় এক হয়ে গেছে। বাড়ী বলতেও আছে একটি মাত্র ঘর এবং তারও ছাউনি যথেষ্ট জীর্ণ। বর্ষায় জল পড়ে গফুর সেই বাড়িতে তার দশ বছরের মেয়ে আমিনা এবং তার পরম স্নেহ পোষ্য 'মহেশ' অর্থাৎ একটি জীর্ণ, খেতে না পেয়ে শুকিয়ে যাওয়া গরুকে নিয়ে থাকে। এই গল্পের কেন্দ্রীয় বিষয়ই হল

মহেশের প্রতি গফুরের গভীর ভালবাসা। সে এবং তার মেয়ে নিজেরা ক্ষুধার্ত থেকেছে কিন্তু মহেশকে কখনও ক্ষুধার্ত রাখেনি। খড়ের চাল থেকে খড় বার করে এনে তার মুখ দিয়েছে। মহেশ খিদের জ্বালায় দড়ি ছিঁড়ে গ্রামের জমিদারবাবু শিবচরণবাবুর বাড়ি গিয়ে অনিষ্ট করে এসেছে, কিন্তু গ্রামের অন্যান্য লোকের বিনামূল্যে পরামর্শ অনুযায়ী মহেশকে গোহাটায় বিক্রি করে দিয়ে আসতে পারেনি। এমনকি অসুস্থ শরীরেও গফুর নিজের খাবার মহেশের মুখে তুলে দিয়েছে। সম্প্রদায়গত ভেদাভেদ ও অস্পৃশ্যতার কবল থেকেও গফুর নিস্তার পায়নি। মুসলমান কন্যা হওয়ার কারণেই তার মেয়ে আমিনা অন্যদের মতো জলাশয় থেকে জল নেওয়ার অধিকার পায় না - 'ঘণ্টার পর ঘণ্টা দূরে দাঁড়াইয়া বহু অনুনয়-বিনয়ে কেহ দয়া করিয়া যদি তাহার পাত্রে ঢালিয়া দেয় সেইটুকুই ঘরে আনে।' এমনই এক পরিস্থিতিতে গফুর মহেশের পশুবৃত্তির কারণে জমিদারবাবুর কাছ থেকে নির্যাতন সহ্য করে ফিরে এসে বাড়িতে দেখে যে, আমিনা জলের কলসি নিয়ে উঠানে পড়ে গেছে আর কলসি থেকে পড়ে যাওয়া সেই জল মহেশ মরুভূমির মতো শুষে খাচ্ছে। তখন এক মুহূর্তের জন্য গফুরের সব রাগ গিয়ে পড়ে মহেশের উপর এবং সে লাঙলের আঘাতে মহেশকে হত্যা করে। গো-হত্যার অপরাধে গ্রামের মানী লোকজন গফুরকে প্রায়শ্চিত্ত করার কথা বলে। গফুর সেই রাতের অন্ধকারে মেয়েকে নিয়ে ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে যাবে বলে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। আর যেতে যেতে আল্লার কাছে প্রার্থনা করে যে, যাদের জন্য মহেশের এই করুণ পরিণতি তিনি তাদের যেন ক্ষমা না করেন। গফুরের এই প্রার্থনার কথা লেখক সমাজের সেই উচ্চবিত্ত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, নির্যাতন প্রবণ মানুষগুলির ধিক্কার জানিয়ে তাদের শাস্তি কামনা করেছেন।

এইভাবেই 'মহেশ' গল্পে লেখক দারিদ্র্য, কুসংস্কার, উচ্চবর্ণ শ্রেণীর নির্যাতন, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে এক মূক পশুর সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক স্নেহমমতার এক কাহিনী রচনা করেছেন। যার মধ্য দিয়ে পরিবেশিত হয়েছে এক অপূর্ব জীবনরস। মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীর এক গভীর নিঃস্বার্থ ঘনিষ্ঠতা নিপুণভাবে শিল্পীর তুলিতে চিত্রিত হতে দেখা গেছে এভাবেই গল্পকারের নৈপুণ্যে।

১.৫ সংক্ষিপ্তকরণ

আলোচ্য এককে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে।

মাতৃভাষায় শিখন সহজতর হয়ে ওঠে। আদর্শ শিক্ষণ সুপরিকল্পিত এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে দেওয়া জরুরী। শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশের সম্ভাবনা থাকে। শিক্ষার্থীর মৌলিক চিন্তনের সহায়ক। পাঠ্যপুস্তকের সঠিক নির্বাচন জরুরী। শ্রেণীশিক্ষণের সময়ের অপচয় রোধ করা যায়।

শিক্ষার্থীর পাঠদক্ষতার বৃদ্ধি পায়। শ্রেণীকক্ষে উপযুক্ত শিক্ষণের ফলে শিক্ষার্থীদের অর্জন দক্ষতা, ধারণা ক্ষমতা এবং পুনরুদ্রেক ক্ষমতার সমন্বয়ন ঘটে এবং একাধারে তাদের মধ্যে বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক এবং সামাজিক বিকাশ ঘটে। সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা বোধ গড়ে ওঠে। পিছিয়ে পড়া শিশুরাও শ্রেণীকক্ষে আদর্শ শিখন পদ্ধতির প্রভাবে উৎসাহ বোধ করে। সর্বোপরি, শিক্ষার্থীর আগ্রহ এবং প্রেষণার (Motivation) ওপরেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

আলোচ্য এককে বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অথবা সমধর্মী পর্ষদের নবম ও দশম শ্রেণীর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী (গদ্য, কবিতা, ব্যাকরণ ইত্যাদি) বিভিন্ন বিষয় সহজভাবে

আলোচনা করা হয়েছে। অগ্রগতি যাচাই-এর সাপেক্ষে এবং শ্রেণীকক্ষে যথার্থ পাঠদানের সুবিধার্থে উপরের আলোচনার নিরিখে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা করা হয়েছে।

১.৬ অনুশীলনী

- শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণের প্রয়োজনীয় শর্তগুলি লিখুন।
- আদর্শ পাঠদানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শ্রেণীতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (বিশেষত নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যসূচী অনুযায়ী দৃষ্টান্ত তুলে ধরুন।)

১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। Cameron, Lynne, "Teaching Languages to Young Learner," Cambridge University Press, 2001.

২। সেন, মলয়কুমার, ''শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞান'', 'সোমা বুক এজেন্সী', ২০০৪।

৩। ''গুপ্ত, অশোক, ''বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতির রূপরেখা'', সেন্টাল লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০০৬।

৪। এস.ই.সি.এম-০২।। বাংলা শিক্ষণ পদ্ধতি।। নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

৫। চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক, ''মাতৃভাষা শিক্ষণ বিষয় ও পদ্ধতি'', রীতা পাবলিকেশন, আগস্ট ২০১৪-১৫।

৬। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা - ২০০৫ - এস.সি.ই.আর.টি।

৭। বাংলা পাঠ্যপুস্তক (নবম ও দশম শ্রেণী), ''পঃ বঃ মঃ পর্ষদ এবং সমধর্মী পর্ষদ''।

৮। চক্রবর্তী, বামনদেব, 'উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ'', অক্ষয় মালঞ্চ, ২০০৩।

৯। মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য, ''বাংলা ভাষা পরিচয়'', সোমা বুক এজেন্সী, ২০০৭।

১০। hedge, Tricia, "Teaching and Learning in the Language Classroom", Ocford University Press, London, 2008.

বিভাগ - ক

বিষয় ও শিক্ষণকল্পে বিষয় বিশ্লেষণ

একক - দুই : 'নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যসূচী অনুযায়ী শিক্ষণকল্পে বিষয় বিশ্লেষণ' এবং ('পঠনীয়-একক-দুই) উপরোক্ত বিষয়সমূহ নিম্নে বিশ্লেষণ।

বিন্যাস :

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ উদ্দেশ্য

২.৩ বিষয়বিশ্লেষণ

২.৪ শিক্ষণকল্পে বিষয়বিশ্লেষণ

২.৪.১ পাঠের চিহ্নিতকরণ

২.৪.২ পাঠএককের উপএকক নির্বাচন

২.৪.৩ পাঠের উদ্দেশ্যসমূহ (রসোপলব্ধিমূলক/দক্ষতামূলক)

২.৪.৪ শিক্ষণ পদ্ধতি/কৌশল নির্বাচন

২.৪.৫ ভাষামূলক দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে চিন্তনধর্মী প্রশ্নের সাহায্যে প্রকাশধর্মিতা

২.৪.৬ উদ্দেশ্যভিত্তিক অভীক্ষা

২.৪.৭ শিক্ষামূলক প্রদীপন নির্বাচন এবং প্রস্তুতি

২.৫ নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যসূচী অনুযায়ী শিক্ষণকল্পে বিষয় বিশ্লেষণ

২.৬ শিক্ষণকল্পে বিষয় বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা

২.৬.১ নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যসূচী অনুযায়ী শিক্ষণকল্পে বিষয় বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিকতা

২.৭ সংক্ষিপ্তকরণ (Summing Up)

২.৮ অনুশীলনী

২.৯ গ্রন্থপঞ্জি

২.১ প্রস্তাবনা

শ্রেণী-শিক্ষণে সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'শিক্ষণকল্পে বিষয় বিশ্লেষণ'-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আজ অনস্বীকার্য বিষয়। যেকোন দায়িত্ববান শিক্ষক নির্দিষ্ট শ্রেণীতে কোন কোন বিষয়, কত সময়ে, কিসের মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন সেই সম্পর্কে তার পূর্ব পরিকল্পনা থাকা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষণ সংক্রান্ত এই পরিকল্পনার ক্ষেত্রে (Planning of teaching) শিক্ষণকল্পে বিষয় বিশ্লেষণ অপরিহার্য বিষয়। যেকোনো শ্রেণীর নির্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত পাঠদানের ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতিতে পাঠ পরিকল্পনা (Lesson Planning), একক সম্পর্কিত পরিকল্পনা (Unit Planning) এবং পাঠক্রম পরিকল্পনা (Curriculum Planning) করতে গেলে অবশ্যই তার শিক্ষণ সম্বন্ধীয় বিশ্লেষণ (Pedagogical Analysis) করা প্রয়োজন। শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিষয় বিশ্লেষণ না হলে শিক্ষকের কাছে বিষয় পাঠের একটি সুপরিকল্পিত ছক পরিষ্কার হয় না এবং শিক্ষার্থীদের কাছেও পাঠ্যবিষয় স্পষ্ট ও সাবলীলভাবে সঠিক পদ্ধতিতে উপস্থাপিত হতে পারে না। কাজেই সামগ্রিক শিক্ষা পদ্ধতিতে আবশ্যিক পর্যায়ে বিভক্ত ও বিশ্লেষণ করে নির্দিষ্ট পাঠের শিক্ষণ সম্বন্ধীয় বিষয় বিশ্লেষণ হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২.২ - উদ্দেশ্য

আলোচ্য পাঠ করার পর আপনি —

- বিষয় বিশ্লেষণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করবেন।
- শিক্ষণকল্পে বিষয় বিশ্লেষণের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠসূচী সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবেন। পাঠএককের বিজ্ঞানসম্মত উপএকক নির্বাচন করতে সক্ষম হবেন।
- শিক্ষণকল্পে বিষয় বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা কোথায় তা উপলব্ধি করবেন। এরই পাশে ভাষামূলক দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে চিন্তনধর্মী প্রশ্ন বুঝতে পারবেন সঠিকভাবে।
- নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যসূচী অনুযায়ী বিষয় বিশ্লেষণের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা বিচার করতে পারবেন।
- শিক্ষামূলক প্রদীপন নির্বাচন ও প্রস্তুত করতে পারবেন।
- নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী এবং প্রয়োজন অনুসারে 'শিক্ষণকল্পে বিষয় বিশ্লেষণ' করতে পারবেন।
- উদ্দেশ্যভিত্তিক অভীক্ষা প্রস্তুত করতে পারবেন।

২.৩ - বিষয় বিশ্লেষণ

বিষয় বিশ্লেষণের মূল লক্ষ্য হল, শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠনের মূল উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা। নির্দিষ্ট শ্রেণীতে পাঠদান চলাকালীন শিক্ষণীয় বিষয়টিতে শিক্ষার্থীদের যথার্থ শিখন গড়ে ওঠে বিষয় বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে। এর

মাধ্যমে বিচিত্র উপাদানের সমন্বয়ে একাধিক দক্ষতা বা নৈপুণ্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিকশিত হয়। আদর্শ পরিবেশ এবং শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এক্ষেত্রে জরুরী বিষয়। একটি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি এক্ষেত্রে তুলে ধরা যায় -

"The essence of being an effective teacher lies in knowing what to do to foster pupils. Learning and being able to do it. Effective teaching is primarily concerned with setting up a learning activity for each pupil which is successful in bringing about the type of learning the teacherintends."[Chris Kyriacou / (1998) Essential Teaching Skills.]

একজন শিক্ষার্থীর কাছে বিষয় বিশ্লেষণের গুরুত্ব অপরিসীম। অপরদিকে, শিক্ষকের কাছেও বিষয় বিশ্লেষণের গুরুত্ব অপরিসীম। অপরদিকে, শিক্ষকের কাছে বিষয় বিশ্লেষণ নির্দিষ্ট পাঠের একটি সুবিন্যস্ত রূপ যার মাধ্যমে 'Output' যথার্থই বাড়তে থাকে। সেক্ষেত্রে শিখনও সম্ভাব্য স্তরে পরিপূর্ণতা পায় এবং সমগ্র শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতিকেই পরিপূর্ণতা দেয় বললে অত্যুক্তি হয় না।

২.৪ - শিক্ষণকল্পে বিষয়বিশ্লেষণ

২.৪.১ - পাঠের চিহ্নিতকরণ :

নির্দিষ্ট শ্রেণীকক্ষে নির্দিষ্ট শ্রেণীর পাঠটি নির্বাচন করে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে স্পষ্টভাবে পাঠের চিহ্নিতকরণ করা হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ -

i. একটি কবিতা "উলঙ্গ রাজা"

ii. কবি - নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

iii. শ্রেণী - দশম

২.৪.২ - পাঠএককের উপএকক নির্বাচন :

শ্রেণীশিক্ষণে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ এককটি (গদ্য, কবিতা, দ্রুতপঠন, ব্যাকরণ, নাট্যাংশ, পত্রলিখন, রচনা, প্রভৃতি যে বিষয়ই হোক না কেন) ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরা এককথায় অসম্ভব। তাই শ্রেণীপাঠের পরিকল্পনাতে অবশ্যই নির্দিষ্ট শ্রেণীর নির্দিষ্ট পাঠএককের বিজ্ঞানসম্মতভাবে উপএককের বিভাজন করা হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে শ্রেণীশিক্ষণ ফলপ্রসূ হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে এবং শিক্ষক তথা শিক্ষার্থীগণ উভয়েই বিশেষভাবে উপকৃত হয়ে থাকেন। শিক্ষণকল্পে বিষয় বিশ্লেষণের বিভিন্ন বিভাজনগুলি তুলে ধরতে দশম শ্রেণীর একটি নির্দিষ্ট কবিতাকে ("উলঙ্গ রাজা" / নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী) কেন্দ্র করেই সমস্ত দৃষ্টান্তগুলি বিশেষত ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য ব্যাখ্যা করা হল।

❖ **উপএককে বিভাজন ও শ্রেণীপাঠের পরিকল্পনা :-**

একক	উপএকক	পিরিয়ড সংখ্যা	মন্তব্য
	১। ১ম ও ২য় স্তবক	১	বর্তমান পরিস্থিতিকে সামনে রেখে সরস আলোচনা ও ছান্দিক বৈশিষ্ট্য সহকারে পাঠদান
	২। ৩য় ও ৪র্থ স্তবক	১	
উলঙ্গ রাজা [কবি - নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী]	পাঠের মূল্যায়ন	১	পাঠশেষে পাঠের মূল্যায়ন ও পুনঃশিক্ষণ
	মোট	৩	

❖ **<u>পাঠএককের সারাংশ / মূলকথা ও অন্তর্নিহিত ধারণা :-</u>**

বর্তমান ক্ষমতাসীন শাসকশক্তির নগ্নতাকে প্রকাশের উদ্দেশ্য কবি উলঙ্গ রাজার কাহিনীকে রূপকার্থে প্রয়োগ করেছেন। রাজশক্তি সর্বকালে সর্বযুগে পারিপার্শ্বিক স্তাবকদল পরিবৃত্ত হয়ে আত্মম্ভরিতায় ও শক্তিদম্ভে থাকে অন্ধ। ফলে নিজের সত্যপরিচয় লাভের উপযোগী অমলিন স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে। সুযোগসন্ধানী ও স্বার্থপর পারিপার্শ্বিক স্তুতিবাদীর দল অবিরত চাটুবাক্য ক্ষমতাসীন শাসক শক্তিকে তোষণ করতে থাকে। যে দুএকজন সত্যবাক্য বলার সৎসাহস রাখে, সুবিধাবাদীর দল হয় তাকে লুকিয়ে রাখে না হয় নানা প্রলোভনে তাকে প্রতিনিবৃত করে। অথচ উলঙ্গ রাজার সত্য পরিচয় উদঘাটনের জন্য পুরাতনী গল্পের সেই সরল, সাহসী, সত্যবাদী শিশুটির উপস্থিতি অপরিহার্য। ওই শিশু সত্য ও স্পষ্টবাদিতার প্রতীক। সেই পারে সকলরকম স্তাবকতার কলধ্বনির ঊর্ধ্বে গলা চড়িয়ে বলতে, 'রাজা তোর কাপড় কোথায়।' তখনই ক্ষমতাসীন রাজশক্তি ও তার স্বার্থান্বেষী স্তাবকদলের মুখোশ যাবে খুলে। নগ্নরূপের প্রকাশ ঘটবে।

২.৪.৩ পাঠের উদ্দেশ্য-সমূহ (রসোপলব্ধিমূলক/দক্ষতামূলক)

পাঠএককের উদ্দেশ্য-নির্ধারণ (রসোপলব্ধিমূলক/দক্ষতামূলক) করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তুলে ধরতে হবে।

শিক্ষক বা শিক্ষিকা যখন কোনো বিষয় সম্পর্কে পাঠদান করেন, তখন তাঁকে কতগুলি উদ্দেশ্য সামনে রেখে পাঠদানে অগ্রসর হতে হয়। তাই পাঠের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। শিক্ষার উদ্দেশ্য জটিল ও বহুমুখী। এইসব উদ্দেশ্যগুলিকে সহজবোধ্য করার জন্য বহু মনোবিদ এবং শিক্ষাবিদগণ উদ্দেশ্যগুলি বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে (যেমন-জ্ঞানমূলক, বোধমূলক, প্রয়োগমূলক এবং দক্ষতামূলক) স্পষ্টরূপে বিশ্লেষণ করেছেন।

- **জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্য** - কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জিত হতে পারে যখন শিক্ষার্থী সেই বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যাখ্যা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানবে। যখন শিক্ষার্থী বিষয়টির পরিচয় জানবে, বিষয়টি সম্পর্কে নানা বিষয় স্মরণ করতে পারবে, বিষয়টির কৌতুকভাব, ব্যাঙ্গাত্মকভাব এবং রূপক অর্থের বিভিন্ন বিষয় চিনতে পারবে এবং ঘটনাটির স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারবে তখনই বোঝা যাবে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জনে সক্ষম ও সফল হয়েছে।

- **বোধমূলক উদ্দেশ্য** - শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট পূর্বপরিকল্পিত বিষয়টির মর্মার্থ যখন বুঝিয়ে বলতে পারবে, শ্রেণীবিভাগ করতে পারবে এবং নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর তুলনাও করতে পারবে, বিষয়ের অন্তর্নিহিত ত্রুটিগুলি খুঁজে বের করতে পারবে; সঠিক ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করতে পারবে এবং উপযুক্ত কারণ দেখাতে সক্ষম হবে - তখনই শিক্ষার্থীর বোধমূলক উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে বলে বোঝা যাবে।

- **প্রয়োগমূলক উদ্দেশ্য** - শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে নতুন কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারলে এবং তার জন্য বিষয়টিতে যেসব তথ্য বা পরিসংখ্যান দেওয়া আছে তা যথেষ্ট কিনা বলতে পারলে তা প্রয়োগমূলক উদ্দেশ্যপূরণ করে থাকে। আবার, নতুন কোনো তথ্যের প্রয়োজন আছে কিনা তা ছাত্রছাত্রীরা বলতে পারলে, নির্দিষ্ট বিষয়ের অন্তর্নিহিত নতুন শব্দ দিয়ে বাক্যরচনা করতে পারলে এবং বিভিন্ন শব্দের সঠিক অর্থ প্রয়োগ করতে সক্ষম হলে তা প্রয়োগমূলক উদ্দেশ্য পূরণ করে থাকে।

- **দক্ষতামূলক উদ্দেশ্য** - শিক্ষার্থীর যখন আলোচ্য বিষয় এবং বিষয়কেন্দ্রিক বিভিন্ন বিষয় বস্তুর সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির ভালো-মন্দ ঘটনার বর্ণনা, বিচার-বিশ্লেষণ, সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য করতে সফল হবে এবং নৈপুণ্যের সঙ্গে ভাষা ব্যবহার করতে পারবে তখনই তাদের দক্ষতা বা পটুত্ব প্রকাশ পাবে। এছাড়াও কোনো ঘটনা বা বিষয়বস্তুর উপযুক্ত চিত্র, মডেল, তালিকা প্রভৃতি তৈরী করে এক ধরনের উপস্থাপনা থেকে অন্যভাবে প্রাসঙ্গিক উপস্থাপনায় পৌঁছতে পারবে এবং স্বরচিত প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, নাট্যাংশ প্রভৃতি লিখতে পারবে তখনই প্রমাণ হবে শিক্ষার্থী দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এরপর শিক্ষার্থীরা যেকোন একটি পাঠএককের মধ্যে দিয়ে এই ধরনের উদ্দেশ্যগুলি নিজেরা প্রয়োগ করে তৃপ্ত হতে পারবে।

২.৪.৪ শিক্ষণ পদ্ধতি/ কৌশল নির্বাচন

- **<u>শিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন</u>** -

একক	উপ-একক	শিক্ষণপদ্ধতি	শিক্ষাসহায়ক উপকরণ
	● ১ম ও ২য় স্তবক	● স্বাদনা পদ্ধতি	● সাধারণ উপকরণ (বোর্ড, চক, ডাস্টার ইত্যাদি)
		● স্বাদনা পদ্ধতি	
কবিতা- উলঙ্গরাজা (কবি- নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী)	● ৩য় ও ৪র্থ স্তবক		● কবিতার সমার্থক একটি চিত্র বা প্রাসঙ্গিক তালিকা ● কবি নীরেন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি অথবা প্রাসঙ্গিক মডেল।

- **<u>শিক্ষণ পদ্ধতি বা কৌশল নির্বাচন</u>** -

স্বাদনা পদ্ধতির সঙ্গেই আলোচনা পদ্ধতির সংমিশ্রণে শিক্ষক বা শিক্ষিকা প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠে অগ্রসর হতে পারেন। এর পরবর্তী পর্যায়ে তিনি কীভাবে স্তাবকদল পরিবৃত্ত হয়ে গল্পের উলঙ্গ রাজা নিজের সত্য পরিচয় লাভের উপযোগী অমলিন স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে, সেটি শিক্ষার্থীদের সামনে আকর্ষনীয় করে বর্ণনা করবেন। এরপর উলঙ্গ রাজার সত্য পরিচয় উদঘাটনের জন্য সরল, সাহসী, সত্যবাদী শিশুটির উপস্থিতি আলোচনা করেও শিক্ষক বা শিক্ষিকা তা উপস্থাপিত করবেন। এর মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা কবিতাটির রূপকার্থ, অন্তর্নিহিত রস, হাস্য ও কৌতুকরস, মর্মার্থ সহজে অনুধাবন করতে পারবে এবং অন্যান্য পাঠএককের আদর্শ শিক্ষা পদ্ধতি বা কৌশল নির্বাচনের প্রচেষ্টা করবে।

- **পদ্ধতি পর্যায় -**

শিক্ষক/শিক্ষিকা		**শিক্ষার্থীরা**
● কবিতাটি সরসভাবে পাঠ করবেন।	→	সরব পাঠ শুনবে
● সরব পাঠ করতে বলবেন শিক্ষার্থীদের।	→	সরব পাঠ করবে
● স্বল্প সময় নীরবে পাঠ করতে নির্দেশ দেওয়া হবে।	→	নীরব পাঠ করবে।

- চিত্র এবং প্রাসঙ্গিক তালিকা প্রভৃতি প্রয়োগ করে → প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি খাতায় লিখে নেবে।
- সরস বর্ণনা এবং কৌতুক ও হাস্যরস তুলে
- ধরে লিখে নিতে নির্দেশ দেবেন ছাত্রছাত্রীদের।
- তাৎক্ষণিক জ্ঞান যাচাই করতে প্রশ্ন করবেন শিক্ষার্থীদের। → সম্ভাব্য উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে।

২.৪.৫ ভাষামূলক দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে চিন্তনধর্মী প্রশ্নের সাহায্যে প্রকাশধর্মিতা

উপরোক্ত বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য আলোচ্য বিষয়ের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পূর্ব দৃষ্টান্তটি ব্যবহার করা হল।

এই আলোচনার সূত্র ধরেই 'উলঙ্গ রাজা' কবিতাটির অন্তর্নিহিত বিষয়গুলি তুলে ধরা হল-

- শক্তিদম্ভ ও গাম্ভীর্যতাই ধ্বংসের কারণ।
- পরান্নভোজী ও কৃপাপ্রার্থী হয়ে জীবনধারণ করা দুর্বলব্যক্তির লক্ষণ।
- অহংকার করা উচিত নয়, অহংকারই পতনের মূল কারণ।
- কুসংস্কারকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া মানে সমাজকে অগ্রগতির পথ থেকে পিছনে ফেলা।
- সত্যবাদী এবং সৎ, সরল ব্যক্তিদের সবক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- স্বার্থান্বেষী এবং মুখোশধারীদের সমাজ থেকে বহিষ্কার করতে হবে।
- রাজরূপের আড়ালে মানব সভ্যতার গূঢ় সত্যকে জানা দরকার; এক্ষেত্রে ভণ্ডামি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে।
- মানুষের মধ্যে বিনীতভাব, সরলতা, নিরহঙ্কার, সততা প্রভৃতি গুণগুলি থাকা একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়।

পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত অনুসারে এবার কয়েকটি চিন্তনধর্মী প্রশ্নের সাহায্যে প্রকাশধর্মিতা চিত্রিত করা যেতে পারে। যেমন -

(ক) 'উলঙ্গ রাজা' কবিতাটি কোন লেখকের কোন গল্পের অনুকরণে কবি রচনা করেছেন?

(খ) সমাজের আধুনিক পরিস্থিতি এবং বিচিত্র রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে রূপকার্থে কবিতাটির সামঞ্জস্য তুলে ধর।

(গ) টলস্টয়ের '**The naked king**' - গল্পটি বর্ণনা কর- (যে গল্পের অনুকরণেই কবিতাটি রচিত হয়েছে।)

(ঘ) 'উলঙ্গ রাজা' কবিতাটির মর্মার্থ সংক্ষেপে সম্পূর্ণ নিজের ভাষায় লেখ।

শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে এরপর দশম শ্রেণীর পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত 'উলঙ্গ রাজা'- কবিতাটির সূত্র ধরেই ভাষামূলক দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ধরা হল। যেমন -

ক) 'উলঙ্গ রাজা' কবিতাটির মধ্যে মূলত কবি কোন সত্যকে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন?

খ) কবিতাটিতে অন্তর্নিহিত নান্দনিক দিকটি সংক্ষেপে তুলে ধর।

গ) 'গল্পটা সবাই জানে' - সেটা কী?

ঘ) সমার্থক শব্দ লেখ -

i) পরান্নভোজী

ii) আপাদমস্তক

ঙ) বাক্যরচনা কর -

i) গুহা

ii) স্তাবক

চ) প্রাসঙ্গিক একটি সমধর্মী স্বরচিত কবিতা অথবা গল্প লেখার চেষ্টা কর।

২.৪.৬ উদ্দেশ্যভিত্তিক অভীক্ষা

উদ্দেশ্যভিত্তিক অভীক্ষা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে প্রশ্নকরণে সারণী তৈরী করা সবথেকে আগে প্রয়োজন।

সাধারণভাবে ভাষাগত দক্ষতা উন্নয়নে তিনধরনের প্রশ্ন করা হয়ে থাকে -

ক) অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর বা নৈর্ব্যক্তিক।

খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর।

গ) রচনাধর্মী উত্তর।

নীচে নির্দিষ্ট উপএকক অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত অবলম্বনে 'প্রশ্নকরণে সারণী' বা 'চার্ট নির্মাণ করা হল :

একক	উপএকক	জ্ঞানমূলক			বোধমূলক			প্রয়োগমূলক			দক্ষতা মূলক	মোট	আনুপাতিক হার
		অ.স.উ.	স.উ.	র.ধ	অ.স.উ.	স.উ.	র.ধ	অ.স.উ.	স.উ.	র.ধ			
কবিতা	এক ১ম ও ২য় স্তবক	১(২) ১(৪)	১(১১)		১(৩) ১(৯)			১(৩) ১(১০)		২(১৩)	১(১৪)	১০	৫০ %
	দুই ৩য় ও ৪র্থ স্তবক	১(৭) ১(৮)			১(৫)	১(১১)	২(১৩)	১(৬)	২(১২)		১(১৪)	১০	৫০ %
প্রশ্নের মান		৫			৬			৭			২	২০	১০০ %

উল্লেখযোগ্য - প্রশ্নের মান (প্রশ্নক্রম) অর্থাৎ - ২(১২) / প্রশ্নের মান - ২ এবং প্রশ্নের ক্রম - ১২

এক্ষেত্রে, 'প্রশ্নের ধরন' হতে পারে -

অতিসংক্ষিপ্ত -

১) বহুনির্বাচনী

২) স্মৃতিমন্থন,

৩) সম্পূর্ণকরণ - ইত্যাদি।

সংক্ষিপ্ত -

১) প্রশ্ন-উত্তরভিত্তিক,

২) যুক্তিভিত্তিক - ইত্যাদি।

রচনাধর্মী -

১) বর্ণনা বা ব্যাখ্যাদান,

২) বিশ্লেষণভিত্তিক - ইত্যাদি।

এরপর উপরোক্ত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই শিক্ষার্থীদের কাছে উদ্দেশ্যভিত্তিক অভীক্ষাপত্র প্রস্তুত করা হল।

উদ্দেশ্যভিত্তিক অভীক্ষাপত্র

পূর্ণমান - ২০

সময় - ৩০/৩৫ মিনিট

নির্দেশমতো প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর লেখ :-

(ক) অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও : (প্রতিটির মান - ১) (১× ১০= ১০)

১। কবিতাটিতে কবি মূলত কোন অর্থ প্রয়োগ করতে চেয়েছেন? (প্রয়োগমূলক)

২। কবিতাটিতে সবাই কী দেখেছে ? (জ্ঞানমূলক)

৩। কবিতাটিতে সবাই কী জানে? (বোধমূলক)

❖ কোনটি সঠিক?-

৪। কবিতাটির লেখক কে? নীরেন্দ্রনাথ / জ্যোতিন্দ্রনাথ / রবীন্দ্রনাথ (জ্ঞানমূলক)

৫। কবিতায় ভিড় জমে উঠেছে - স্তাবকবৃন্দের / পরান্নভোজীদের (বোধমূলক)

৬। 'স্তাবক' কোন অর্থে প্রয়োগ / ব্যবহার হয়েছে? - স্তুতির অভিলাষী / প্রত্যাশাকারী (প্রয়োগমূলক)

৭। কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া - উলঙ্গ রাজা / কলকাতার যিশু / নীল নির্জন (জ্ঞানমূলক)

❖ শূন্যস্থান পূরণ কর -

৮। আবার _____ উঠেছে মুহূর্মুহু। (জ্ঞানমূলক)

৯। পাহাড়ের গোপন _____ লুকিয়ে রেখেছে। (বোধমূলক)

১০। _____ সবাই জানে। (প্রয়োগমূলক)

(খ) সংক্ষেপে উত্তর দাও - (প্রতিটির মান - ২) (২ × ২= ৪)

১১। উলঙ্গ রাজা কবিতায় কবি ছোট শিশুটিকে কেন খুঁজেছেন? (জ্ঞান /বোধমূলক)

১২। 'গল্পটা সবাই জানে' - গল্পটা কী? (প্রয়োগমূলক)

(গ) রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর দাও। (মান - ৪) (১×৪= ৪)

১৩। কবিতাটির মর্মার্থ লেখ। (বোধ/প্রয়োগমূলক)

(ঘ) অর্থ লেখ - (মান - ২) (দক্ষতামূলক) (১/২×৪= ২)

১৪। i) পরান্নভোজী - ii) স্তাবক -

iii) আপাদমস্তক - iv) গুহা -

২.৪.৭ শিক্ষামূলক প্রদীপন নির্বাচন এবং প্রস্তুতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

শিক্ষামূলক প্রদীপন নির্বাচন এবং প্রস্তুতি -

১) শিক্ষক বা শিক্ষিকা তাঁর আলোচনার সুবিধার জন্য বিভিন্ন উদাহরণ ও কাহিনীর উল্লেখ করতে পারেন।

২) নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যেহেতু টলস্টয়ের '**The naked King**' গল্প অবলম্বনে কবিতাটি রচনা করেছেন, সেহেতু টলস্টয়ের বহু ব্যবহৃত উপকরণ (যেমন - তাঁতির ধূর্তামী) শিক্ষক বা শিক্ষিকা বাক্য বা শব্দ ব্যবহারের জন্য বেছে নিতে পারেন।

সাধারণ উপকরণের ব্যবহার : (ব্ল্যাকবোর্ড, চক, ডাস্টার ইত্যাদি)

শিক্ষক বা শিক্ষিকা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে উদাহরণ উপস্থাপিত করে, শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠটিকে সহজ ও মনোযোগী করে তোলার জন্য। কবি পরিচিতির জন্য কবি প্রতিকৃতি-ও ব্যবহার করতে পারেন ব্ল্যাকবোর্ডে এঁকে। এছাড়াও কবিতায় ব্যবহৃত নতুন নতুন শব্দের অর্থ, সমার্থক শব্দ শিক্ষক বা শিক্ষিকা বোর্ডে লিখে দেবেন এবং শিক্ষার্থীরা সেগুলি তাঁদের খাতায় তুলে নেবেন।

যেমন -

পরান্নভোজী - যে পরের অন্নে প্রাণধারণ করে।

কৃপাপ্রার্থী - দয়ার আকাঙ্ক্ষী।

উমেদার - প্রার্থী, প্রত্যাশাকারী।

প্রবঞ্চক - ঠগ।

আপাদমস্তক - পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

স্তাবক - স্তুতিকার।

বাংলা ভাষাসাহিত্য শিক্ষার উদ্দেশ্যে বহুমুখী এবং শ্রেণীতে নির্দিষ্ট বিষয়টি নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থাপন করা আদর্শ শিক্ষকের কর্তব্য। আর শিক্ষামূলক প্রদীপন প্রস্তুতি এবং সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে বিষয়টি আরো সুন্দরভাবে ও আকর্ষণীয় করে আলোচনা করা হয়ে থাকে।

২.৫ নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিক্ষণকল্পে বিষয় বিশ্লেষণ

শিক্ষণকল্পে বিষয়-বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে সাধারণভাবে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যগুলি চরিতার্থ হতে দেখা যায়, নবম-দশম শ্রেণির ক্ষেত্রেও তা প্রায় একইরকম ইতিবাচক উদ্দেশ্যপূরণ করে থাকে -

- সাহিত্য শিক্ষার বহুমুখী উদ্দেশ্যকে সফল করে তোলার প্রচেষ্টায় শিক্ষণকল্পে বিষয়-বিশ্লেষণ প্রয়োজন।
- নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যসূচীর ক্ষেত্রেও অধিক শিখন সার্থক হয়ে ওঠে।
- নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যসূচী অনুযায়ী বিষয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে অর্থপূর্ণ শিক্ষণ প্রক্রিয়া নিখুঁত রূপে সম্পাদিত হওয়ার সুযোগ পায়।
- 'গ্রহণধর্মীতা' এবং 'প্রকাশধর্মীতা' উভয় ক্ষেত্রেই বিকাশধর্মী উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়ে থাকে।
- নবম-দশম শ্রেণীর নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয়গুলি শিক্ষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সহায়তায় ধাপে ধাপে শিক্ষার্থীদের কাছে, স্পষ্ট, সহজ ও সাবলীলভাবে পৌঁছে যায়।

২.৬ শিক্ষণকল্পে বিষয় বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা

২.৬.১ নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিক্ষণকল্পে বিষয় বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিকতা

২.৬ শিক্ষণকল্পে বিষয় বিশ্লেষনের প্রয়োজনীয়তা :-

পাঠএককের ক্ষেত্রে শিক্ষনকল্পে বিষয়-বিশ্লেষণের (Pedagogy Analysis) গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রিক শব্দ 'পেডাগজিও' (Pedagogio) শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ করা যায় শিশুর ভরণপোষণ করা (To load the child)। পরবর্তীকালে এই শব্দটির অর্থ অনেকখানি সম্প্রসারিত হয়ে 'শিক্ষার বিজ্ঞান' রূপে গৃহীত হয়েছে। অবশ্য 'pedagogy' শব্দটির ব্যবহার নিয়ে বহু মতাদর্শ আজ পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়।

'pedagogy' সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় মতাদর্শ নির্মাণে ফ্রয়বেল, ডিউই, পিঁয়াজে, ওয়াটকিনসন, প্রমুখ শিক্ষাবিদের পরামর্শ স্মরণ করে নিলেও বিশিষ্ট অধ্যাপক বেঞ্জামিন এস.ব্লুম এবং তাঁর অনুগামীদের 'Taxonomy' সংক্রান্ত তত্ত্বটির বিশেষভাবে মেনে চলি বললে অত্যুক্তি হয়না।

শিক্ষণকল্পে বিষয় বিশ্লেষণ বেশ কতকগুলি দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ -

- বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের প্রথমেই সমগ্র পাঠটিকে কতগুলি উপএককে বিশ্লেষণ করে নেওয়ার ফলে নির্দিষ্ট পিরিয়ডে ছাত্রছাত্রীরা নির্দিষ্ট উপএকক সম্পর্কে নিখুঁত ও সুন্দরভাবে জানার সুযোগ পায়।
- নির্দিষ্ট উপএককের মূল বিষয়গুলি এরপর ধাপে ধাপে স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট শ্রেণীতে পরিবেশন করা হয়।
- শিক্ষার্থীদের 'সম্ভাব্য পূর্বার্জিত জ্ঞানের পরিসর' গুলি এক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে তাদের আগ্রহ, মনোভাব এবং প্রেষণার দিকগুলিও প্রাধান্য লাভ করে।
- পরবর্তী পর্যায়ে নির্দিষ্ট পাঠএককটি শ্রেণীকক্ষে ছাত্রছাত্রীদের কাছে পূর্ণাঙ্গভাবে উপস্থাপনা করা এবং সংশ্লিষ্ট পাঠের জ্ঞানমূলক, বোধমূলক, প্রয়োগমূলক তথা দক্ষতামূলক উদ্দেশ্যপূরনের প্রচেষ্টা করা হয়ে যাবে। এর ফলে শিক্ষণকল্পে বিষয় বিশ্লেষণের ইতিবাচক প্রচেষ্টা সামগ্রিকভাবে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া (Teaching-learning process) সফল করে তোলে।
- যেকোনো শ্রেণির, যেকোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের শিক্ষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 'শিক্ষণ কৌশল' নির্মানের নিঁখুত পরিকল্পনা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শিক্ষণ-শিখন উপকরন বা শিক্ষা-প্রদীপনের (প্রাসঙ্গিক চিত্র, তালিকা, মডেল, সিডি বা ক্যাসেটের ব্যবহার ইত্যাদি) সঠিক ব্যবহার ছাত্রছাত্রীদের বিশেষভাবে উপকৃত ও আগ্রহী করে তোলে।
- শিক্ষণ-কল্পে বিষয় বিশ্লেষণের সর্বশেষ ধাপে 'ওয়ার্কশপের' পরিকল্পনা করে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা এবং অনুশীলনের মধ্যে রাখা যেতে পারে। তবে সর্বশেষ পর্যায়টি নিয়ে সম্প্রতি বহু মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়।

২.৬.১ নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিক্ষণকল্পে বিষয় বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিকতা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেকোন শ্রেণির যেকোন বিষয়ের পাঠএককের শিক্ষণ-কল্পে বিষয় বিশ্লেষণ (Pedagogical Analysis) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচিও তার ব্যাতিক্রম নয়। এই বিষয়ে নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে আলোকপাত করা যায়-

- শিক্ষণ-কল্পে বিষয় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নবম ও দশম শ্রেনির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী নির্দিষ্ট পাঠক্রম-টিকে কয়েকটি উপএককে বিভক্ত করে নেওয়া হয়ে থাকে নির্দিষ্ট শ্রেণির পিরিয়ড সংখ্যা অনুযায়ী।
- পরবর্তী পর্যায়ে উপএককের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি পরিকল্পনা অনুযায়ী ধাপে ধাপে স্পষ্ট করে বোঝানোর চেষ্টা হয়।

- নবম ও দশম শ্রেণির নির্দিষ্ট পাঠ্যাংশটি তুলে ধরার পূর্বেই শিক্ষক বা শিক্ষিকা বিশেষত শিক্ষার্থীর আগ্রহ, পূবার্জিত জ্ঞানের পরিধি এবং সামর্থ্যের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

- নবম ও দশম শ্রেণির নির্দিষ্ট উপএককটি পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষক-মহাশয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জ্ঞানমূলক, বোধমূলক, প্রয়োগমূলক, দক্ষতামূলক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্যগুলি বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেন।

- নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিক্ষণ-কল্পে বিষয়-বিশ্লেষণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের সহজ, স্পষ্ট ও সাবলীল-ভাবে নির্দিষ্ট পাঠ্যাংশটি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা। যেমন, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'সাগরসংগমে' গদ্যাংশটি পড়াতে গিয়ে আলোচনাধর্মী ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠএককের মূল বিষয়বস্তু তুলে ধরতে হবে। আবার, জসিমুদ্দিনের 'কবর' কবিতাটি পড়াতে হলে গল্পচ্ছলে কবিতাটির মূল ভাব, গভীর অনুভূতির বিষয় আকর্ষণীয় করে ছাত্রছাত্রীদের কাছে তুলে ধরতে হবে। আবার, ব্যাকরনের অন্তর্গত 'সমাস' বিশ্লেষন করতে হলে কোন একটি সমাস অবলম্বন করে আরোহী পদ্ধতিতে (Induction Method) শিক্ষার্থীদের কাছে উদাহরনের মাধ্যমে ক্রমে বিশেষ সূত্রে উপনীত হতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অবশ্য প্রাসঙ্গিক শিখন-সহায়ক উপকরনের ব্যবহার বিশেষভাবে ফলপ্রসু।

২.৭ সংক্ষিপ্তকরণ

বাঙালির শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হল বাংলাভাষা। বাংলাভাষায় নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষণকল্পে বিষয় বিশ্লেষনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর সার্থক শিখন সম্ভব হয় এবং সামগ্রিক শিক্ষালাভের গতি ত্বরান্বিত হয়ে ওঠে। এককথায়, শিক্ষা হয় আনন্দময়। শিক্ষণ-কল্পে বিষয় বিশ্লেষন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়।

নির্দিষ্ট পাঠের চিহ্নিতকরন করা হয়।

পাঠএককের বিজ্ঞানসম্মতভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে নির্দিষ্ট বিষয়টি উপস্থাপনা করা হয়। ভাষামূলক দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে চিন্তনধর্মী প্রশ্নের সাহায্যে প্রকাশধর্মিতা দেখা যায়। ব্লু-প্রিন্ট সহ উদ্দেশ্যভিত্তিক অভীক্ষা প্রস্তুত করা হয়ে থাকে নির্বাচিত উপএককটির ক্ষেত্রে।

শিক্ষামূলক প্রদীপন নির্বাচন করা হয় এবং প্রস্তুতির সংক্ষিপ্ত বিবরন দেওয়া হয়ে থাকে।

শিক্ষণ-কল্পে বিষয় বিশ্লেষনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে।

নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিক্ষণ-কল্পে বিষয়-বিশ্লেষনের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরা হয়।

বাস্তবপক্ষে, যেকোন বিষয়ের, যেকোন শ্রেণির শিক্ষণ-কল্পে বিষয়-বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে সমগ্র পাঠদান প্রক্রিয়া গতিশীল ও সজীব হয়ে ওঠে।

২.৮ অনুশীলনী (অগ্রগতি যাচাইমূলক প্রশ্ন)

1) শিক্ষণ-কল্পে বিষয়-বিশ্লেষন কাকে বলে?

2) নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিক্ষণ-কল্পে বিষয়-বিশ্লেষনের প্রাসঙ্গিকতা কোথায়?

২.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১। Stephens, J.M., Handbook of Classroom Learning, New York : Holt, 1965.

২। Camer, Lynne, "Teaching Languages to Young Learner", Cambridge University Press, 2001.

৩। এস ই সি এম - ০২ ।। বাংলা শিল্প পদ্ধতি ।। নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

৪। গুপ্ত, অশোক, 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতির রূপরেখা', সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, কলকাতা, ২০০৬।

৫। সেন, মলয়কুমার, 'শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞান,' সোমা বুক এজেন্সী, বৈশাখ, ১৪১৩

৬। মিশ্র, সুবিমল, 'বাংলা শিক্ষণ বিদ্যা', রীতা পাবলিকেশন, জুলাই, ২০১৪-১৫।

৭। Nagaraj, Geeta (2008), "English Language Teaching" (Second Edition), Orient Longman Private Limited, Hyderabad.

৮। চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক, ''মাতৃভাষা শিক্ষণ - বিষয় ও পদ্ধতি", রীতা পাবলিকেশন, আগষ্ট, ২০১৪-২০১৫।

বিভাগ - খ

শিক্ষণ পদ্ধতি

একক ৩ : মাতৃভাষা শিক্ষা

বিন্যাস

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ উদ্দেশ্য

৩.৩.১ মাতৃভাষার সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য

৩.৩.২ মাতৃভাষার উপযোগিতা

৩.৩.৩ মাতৃভাষার গুরুত্ব

৩.৪ বাংলা ভাষা উদ্ভবের প্রাসঙ্গিক ইতিহাস

৩.৫.১ মাতৃভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

৩.৫.২ বিদ্যালয় পাঠক্রমে মাতৃভাষার গুরুত্ব

৩.৬ মাতৃভাষা শিক্ষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অভিমতের মূল্যায়ন

৩.৭ শিক্ষার মাধ্যম রূপে মাতৃভাষা শিক্ষা ও মাতৃভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা

৩.৮ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য

৩.৯ মাতৃভাষা ও সাহিত্য অনুশীলনে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব

৩.১০ মাতৃভাষা ও সাহিত্য অনুশীলনে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব

৩.১১ সংক্ষিপ্তকরণ (Summing Up)

৩.১২ অনুশীলনী

৩.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

৩.১ প্রস্তাবনা

বাঙালির ইতিহাস বিমুখতা চর্চার বিষয়। ঘটে যাওয়া ভুলের মাসুল গুণতে না বলে বর্তমানে সময় এসেছে সমস্ত ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার শপথ নেওয়ার। সামনের পথ তখনই বলিষ্ঠ হয় যখন কোন জাতির ঐতিহ্যানুসরণ যথার্থ থাকে। বলাই বাহুল্য আমাদের বাংলার ঐতিহ্যে মণি-মানিক্যের অপ্রতুলতা কোনকালেই ছিল না। বর্তমান মাতৃভাষা আলোচনার ক্ষেত্রটিকেই যদি ধরা হয় তাহলেও দেখা যাবে বিশ্বের যে কোনো ভাষার সঙ্গে তুলনায় কোথাও আমরা পিছিয়ে নেই। আমাদের এই বর্তমান আলোচনায় তাই উঠে এসেছে আমাদের ভাষার ইতিহাস এবং তার নানান খুটিনাটি তাত্ত্বিক দিক। মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে যেদিকগুলির সম্যক ধারণা শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ের কাছেই সবসময়ই প্রাসঙ্গিক।

৩.২ উদ্দেশ্য

আলোচ্য পাঠ করার পর আপনি—

- মাতৃভাষার সঠিক সংজ্ঞাটি সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- মাতৃভাষার উপযোগিতা ও গুরুত্বগুলি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- মাতৃভাষার উদ্ভব কিভাবে ঘটেছিল এবং তার প্রাসঙ্গিক ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হবেন।
- মাতৃভাষা শিক্ষার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কিছু অভিমত সম্পর্কে অবগত হবেন এবং আজকের শিক্ষায় তা কতটা আলোড়ন ফেলেছে তা জানতে পারবেন
- মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম রূপে গ্রহণ করলে শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহন এবং আত্ম প্রকাশের পথ কতটা সুগম হবে সে সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশে মাতৃভাষা দিবস কতটা প্রাসঙ্গিক তা জানতে পারবেন। এখনও বাংলা ভাষা কতটা অবহেলিত সে সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাবেন।
- মাতৃভাষা ও সাহিত্য অনুশীলনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ বা গ্রন্থাগারের উপযোগিতা কতটা তা অবগত হবেন।
- পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি গণমাধ্যম শিক্ষার্থীদের শ্রবনের অভ্যাস, শুদ্ধ উচ্চারণ, ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধি, আগ্রহ, উৎসাহ ইত্যাদি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে শিক্ষার সর্বাঙ্গীন বিকাশে কতটা সহায়তা করে চলেছে তা জানতে পারবেন।

৩.৩.১. মাতৃভাষার সংজ্ঞা এবং উদ্দেশ্য ঃ

সামাজিক মানুষ একে অপরের সাথে ভাব বিনিময় করে মাতৃভাষার মাধ্যমে। মানুষের জীবনে এই মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। ভাষ্ + আ প্রত্যয় থেকে 'ভাষা' শব্দটির সৃষ্টি। ভাষা সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন। ডঃ সুকুমার সেনের ভাষায়, ''মানুষের উচ্চারিত, অর্থবহ, বহুজনবোধ্য ধ্বনি

সমষ্টি ভাষা।" সুনীতিকুমার চট্টপাধ্যায়ের মতে, ''মনের ভাব প্রকাশের জন্য, বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন শব্দ সমষ্টিকে 'ভাষা' বলে"। আসলে সামাজিক মানুষ আলো, বাতাস ও জলের মতই একান্ত স্বাভাবিক ও অজ্ঞাতসারে ভাষা যেমন সংগ্রহ করে চলেছে তেমনি স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্নরূপে বিভিন্ন ভাষায় তাদের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না প্রকাশ করে চলেছে। আর এই প্রত্যেকটি সামাজিক মানুষের বেশিরভাগই তাদের মাতৃভাষায় কথা বলে।

মাতৃভাষা আসলে কী সে সম্পর্কে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাতৃভাষাকে মাতৃদুগ্ধের সাথে তুলনা করেছেন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টপাধ্যায়ের মতে, ''বাংলাদেশে জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে বাঙালী জন সমাজে ব্যবহৃত শব্দ লইয়া বঙ্গভাষা বা বাঙলা ভাষা গঠিত।" আর বাঙালীর মাতৃভাষা হল বাংলা। আবার কেউ কেউ মায়ের মুখ থেকে নেওয়া ভাষাকে 'মাতৃভাষা' বলেছেন। কিন্তু, মাতৃভাষা যে সব সময় শিশু মায়ের মুখ থেকেই গ্রহণ করবে এমন কোন কথা নেই। জন্মের সাথে সাথে মাতৃহীন শিশু তার প্রমাণ। মূলত ঃ ঐ শিশু প্রথম যে ভাষায় পুরোপুরি মনের ভাব প্রকাশ করে সেখান থেকে তার মাতৃভাষার উৎপত্তি। আসলে শিশু যখন প্রথম কথা বলতে শেখে তখন যে ভাষা তাকে সব থেকে বেশি প্রভাবিত করে এবং পরবর্তীকালে যে ভাষা তার ব্যক্তিজীবনেরও ভাষা হয়ে ওঠে তাই হল 'মাতৃভাষা।' আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, জন্মের পর শিশু তার জীবনের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে যে ভাষা শুনে শেখে ও যে ভাষার মাধ্যমে তার অন্তরের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-অনুভূতি, চিন্তা-চেতনা, মনন-সৌন্দর্য্য ইত্যাদির বহিঃপ্রকাশ করে তাই হল সেই শিশুর 'মাতৃভাষা।'

মাতৃভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি হল :

(ক) মাতৃভাষা কখন দক্ষতার বিকাশে সহায়তা করে।

(খ) মাতৃভাষা লিখন দক্ষতার বিকাশে সহায়ক।

(গ) নির্ভুল পাঠের দক্ষতা নির্মানে মাতৃভাষা শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

(ঘ) মাতৃভাষা পঠন পাঠনের মাধ্যমে সহজ সাবলীল গতিতে পাঠ করা যায়।

(ঙ) মাতৃভাষা সবর পাঠ ও নিরব পাঠের সামর্থ গড়ে তোলে।

(চ) মাতৃভাষায় পঠন-পাঠন করলে নিজস্ব ভাষায় রচিত সাহিত্য রচনা, সংগীত ও কাব্যের প্রতি পাঠকের অনুরাগ বৃদ্ধি করে।

(ছ) মাতৃভাষা ঐতিহ্য উদ্ধার ও জ্ঞান বৃদ্ধির সহায়ক

(জ) মাতৃভাষায় পঠন-পাঠন ভাষা ধ্বনিরূপ ও কাঠামো উদ্ধারে সহায়ক

(ঝ) মাতৃভাষা শিক্ষা মাতৃভাষার প্রতি সদর্থক মনোভাব তথা মূলবোধ গঠনে সহায়ক

(ঞ) মাতৃভাষা শিক্ষা শিক্ষার্থীদের স্বাধীন চিন্তা ও আত্মপ্রকাশে সহায়ক

(ট) মাতৃভাষা ভাষার প্রয়োগ দক্ষতা বিকাশে সহায়ক

(ঠ) সর্বোপরি মাতৃভাষা শিক্ষা শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশে সহায়ক

(ড) নৈতিক-মানসিক-বৌদ্ধিক বিকাশে সহায়ক তথা সর্বাঙ্গীন বিকাশে মাতৃভাষা সহায়তা করে।

৩.৩.২ মাতৃভাষার উপযোগিতা ঃ

শিশু মাতৃগর্ভ থেকে একটি সামাজিক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে। এই সামাজিক পরিবেশের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ হল পরিবার। পরিবারের মধ্যে থেকেই শিশু তার জীবনের গুরত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতাগুলি সংগ্রহ করে। আর এ ব্যাপারে তাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে তার মাতৃভাষা। রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষাকে 'মাতৃদুগ্ধের' সঙ্গে তুলনা করেছেন। মাতৃদুগ্ধ যেমন কোন শিশুর জীবনের ক্রমবিকাশকে সার্থক করে তোলে তেমনি মাতৃভাষা শিশুর সুখ-দুঃখ, আনন্দ অনুভূতি, হাসি-কান্না ইত্যাদি মানবিক ও প্রাক্ষভিক গুণের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটায়। আবার পারিপার্শ্বিক জগৎ-ও জীবন সম্পর্কে শিশুর মনে যে সীমাহীন কৌতুহলের সৃষ্টি হয় মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিশু তা চরিতার্থ করতে পারে। মাতৃভাষা আবার শিশুর জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটানোর সাথে সাথে তার জীবনে সাহিত্য-চর্চা, শিল্প-চর্চা, সৃজনশীল ক্ষমতা ও দক্ষতার বিকাশে সহায়তা করে। তবে শিশুর জ্ঞান ভাণ্ডারকে আরও সম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধ করে তুলতে মাতৃভাষার পাশাপাশি অন্যান্য দেশী-বিদেশী বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা জরুরি। আবার দেশের ইতিহাস, মানচিত্র, হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি সম্পর্কে একজন ব্যক্তির কাজ চালানোর মত জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্যে আমরা দেখি শিশু সর্বাঙ্গীন বিকাশের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। তাই আমরা দেখি বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে মাতৃভাষা, দ্বিতীয় ভাষা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে এইসব বিষয়গুলি চর্চার জন্য শিশুর মাতৃভাষার জ্ঞান থাকা একান্তই জরুরি। তাই নানা কারণে মাতৃভাষার উপযোগিতা অনস্বীকার্য। মাতৃভাষার বিভিন্ন উপযোগিতাগুলি হল—

(ক) ব্যক্তিগত উপযোগিতা :

শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশের জন্য মাতৃভাষার উপযোগিতা সবচেয়ে বেশি। ব্যক্তিগত দিক থেকে মাতৃভাষা ও সাহিত্য চর্চার উপযোগিতাগুলি হল—

(i) ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রগঠনে সহায়ক ঃ–

মাতৃভাষা ও সাহিত্য চর্চার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষার্থীরা সঠিক ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন করতে পারে। মাতৃভাষায় রচিত বিভিন্ন কাব্য-নাটক-উপন্যাস-গল্প ইত্যাদি সাহিত্য পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের নান্দনিক পিপাসার পরিতৃপ্তি ঘটায় তেমনি আবার এগুলি পাঠের মধ্য দিয়ে তারা তাদের রুচিবোধ ও নীতিবোধের উন্নতি ঘটায়। তাছাড়া মাতৃভাষায় রচিত বিভিন্ন কাব্য — আখ্যান ও তার রচয়িতাদের আদর্শে শিক্ষার্থীরা তাদের সুচরিত্র গড়ে তুলতে পারে।

(ii) মাতৃভাষা শিক্ষার্থীদের ক্রমবিকাশের ভিত্তি ঃ

ভাষা হল ভাবের বাহন বা চিন্তার বাহন। তাই ভাষা তথা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের ভাব তথা চিন্তা তথা কল্পনাকে প্রকাশিত করতে পারে। এছাড়া মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের বিচার-বুদ্ধিকে শানিত করতে পারে। আবার মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যেমন অন্যের বক্তব্য পড়ে ও শুনে সহজে বুঝতে পারে তেমনি আবার মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ-সরলভাবে নিজের বক্তব্যকে অন্যের কাছে সহজে বলা এবং লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে।

(iii) চাহিদা ও আকাঙ্খার পরিতৃপ্তি ঃ-

শিক্ষার্থীরা হল দেশের তথা জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিক। যুগে যুগে আমরা তাদের মধ্য থেকেই নতুন নতুন প্রতিভাদের উঠে আসতে দেখি। আর সেই প্রতিভাবান হওয়ার জন্য যে আত্মপ্রকাশ আকাঙ্ক্ষা, যে সৃজনশীলতার আকাঙ্ক্ষা, যে আত্মস্বীকৃতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা তার অনেকটাই মাতৃভাষার মাধ্যমেই সম্ভব। অভিনয়, আবৃত্তি, বিতর্ক, আলোচনা, সঙ্গীত-চর্চা, সাহিত্য-চর্চা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের আত্মপ্রকাশের চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটে। গল্প, ডায়েরী, কবিতা, ছড়া ইত্যাদি লেখার মধ্য দিয়ে শিশুর সৃজনশীল আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটে। আবার এগুলির মধ্য দিয়ে যখন তারা বাহবা বা প্রশংসা পায় তখন তাদের আত্মস্বীকৃতির চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয়।

(iv) অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশ সাধন ঃ

মাতৃভাষা চর্চার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের নানা ধরনের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশ সাধিত হয়। যেমন - শিক্ষার্থীদের সৌন্দর্য্য চেতনা, সাংগঠনিক ক্ষমতা, হাতের কাজ, চিত্রাঙ্কন, শিল্পকলা, সাহিত্যকলা প্রভৃতির বিকাশ মাতৃভাষা চর্চার মধ্য দিয়ে সার্থক হয়ে ওঠে।

(v) জীবনকেন্দ্রীক শিক্ষার সহায়ক ঃ

বর্তমান শিক্ষায় পুঁথিগত শিক্ষার চেয়ে জীবনকেন্দ্রীক সর্বাঙ্গীন শিক্ষার উপরে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই শিক্ষায় বিভিন্ন ধরনের দলবদ্ধ ও সৃজনশীল কাজকর্মে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহমর্মিতা, সহনশীলতা, সহযোগিতা ইত্যাদি মানবিক গুণের বিকাশ ঘটে। বর্তমান শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে তাই মাতৃভাষার প্রয়োজন অনেকটা বেশি। মাতৃভাষায় শিক্ষার্থীর দখল অনেক বেশি। তাই শিক্ষার্থীর জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশে মাতৃভাষার প্রয়োজন অনেকটা।

(vi) অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষার ভিত্তি ঃ

মাতৃভাষা শুধুই যে শিক্ষার বাহন তা নয়, পাঠ্যক্রমের অন্যান্য পাঠ্যবিষয়ের ভিত্তি হিসাবেও মাতৃভাষা কাজ করে। মাতৃভাষার ভিত্তি দৃঢ় হলে শিক্ষার্থীদের ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, অঙ্ক ইত্যাদি অন্যান্য বিষয় শিক্ষার পথও সুগম হয়। তাই মাতৃভাষার ক্লাস ছাড়া অন্যান্য বিষয় পড়ানোর সময় শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের ভাষা ঠিকঠাক বুঝতে পারছে কিনা এবং সাবলীলভাবে সেই বিষয়গুলি মৌখিক ও লিখিতভাবে ঠিকঠাক প্রকাশ করতে পারছে কিনা তা দেখা একান্তই জরুরি।

(vii) মানসিক সুস্থতা রক্ষার সহায়ক ঃ

মাতৃভাষার মাধ্যমেই মানুষ তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, চিন্তা-চেতনা ইত্যাদি অনুভূতি র সার্থক প্রকাশ করতে পারে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের ভিতরের সমস্তরকম অনুভূতি বাইরে প্রকাশ করতে পারে বলে মাতৃভাষা তাদের মানসিক সুস্থতা রক্ষার সহায়ক।

খ) সামাজিক উপযোগিতা ঃ

মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সমাজবদ্ধজীব। তাই সমাজে বসবাস করতে গেলে তাকে নানা ধরনের নিয়ম-কানুন ও দায়িত্ব মেনে চলতে হয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে আমরা আমাদের চিন্তাধারা লিখিত বা মৌখিকভাবে মানুষের কাছে ব্যক্ত করি। ফলে একই ভাষাভাষি বিভিন্ন জনসমষ্টির মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন দৃঢ় হয়। বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা চর্চার মধ্য দিয়ে নিম্নলিখিত প্রয়োজনগুলি সিদ্ধ হয়।

(i) বংশগত ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিতি ঘটায় ঃ

মাতৃভাষা-ও সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা বংশগত ঐতিহ্যের সাথে পরিচিতি হতে পারে। মাতৃভাষা চর্চার দ্বারা শিক্ষার্থীরা তাদের পূর্বপুরুষদের সৃষ্ট শিল্প ও সাহিত্য সমাজের কাছে তুলে ধরতে পারে।

(ii) জাতীয় ঐতিহ্যের সাথে পরিচিতি ঃ

মাতৃভাষায় রচিত কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, মনীষীদের জীবনী প্রভৃতি পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা জাতীয় ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত হতে পারে। ফলে শিক্ষার্থীরা জাতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছুটা পরিচিত হতে পারে এবং জাতির প্রতি তাদের শ্রদ্ধা বেড়ে যায়।

(iii) সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ ঃ

মাতৃভাষায় রচিত গল্প, উপন্যাস, কবিতা, মনীষীদের জীবনী প্রভৃতি পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা জাতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের নানা সামাজিক গুণাবলীর সাথে পরিচিত হয়। সেই গুণাবলীর অনুকরণে তারা নিজেদেরকে অনেকটা সংশোধন ও পরিমার্জন করে গড়ে নিতে পারে। ফলে সহযোগিতা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, পরমতসহিষ্ণুতা, বন্ধুপ্রীতি প্রভৃতি সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। এগুলির অভাবে তারা অসামাজিক, হিংসাপরায়ণ হয়ে পড়ে।

(iv) সুনাগরিক শিক্ষা ঃ

একজন সৎ নাগরিকের যে সমস্ত গুণ থাকা দরকার যে সুস্পষ্ট চিন্তাশক্তি, সুস্পষ্ট প্রকাশভঙ্গী, অনুভূতি ও কর্মের সততা প্রভৃতি শিক্ষা মাতৃভাষা ও সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে সম্ভব হয়ে ওঠে।

(v) জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও জাতীয় ভাবগত সংহতি রক্ষা ঃ

মাতৃভাষা ও সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটতে পারে ও জাতীয় ভাবগত সংহতি রক্ষার পরিবেশ তৈরী হতে পারে। বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন কর্ম শুরু হওয়ার আগে শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে সমবেতভাবে জাতীয় সঙ্গীত গায়। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় দিবস স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, শিক্ষক দিবস, রাখী উৎসব ইত্যাদি পালন ও মহাপুরুষদের জন্ম-জয়ন্তী পালনের মধ্য দিয়ে এ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনচর্যা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটানো যেতে পারে। এছাড়া বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠনের মধ্যে দিয়ে মানবপ্রীতি, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ, শান্তি-মৈত্রী, প্রগতি, বৈচিত্র্যের মধ্যের ঐক্য, বিভিন্ন প্রকার সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস প্রভৃতির আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে হবে তাতে ভাল ফল হতে পারে।

(vii) প্রগতিশীল চিন্তার সঙ্গে পরিচয় ঃ

বর্তমানে পৃথিবীর নানা দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তার জগতে যেসব অহরহ অগ্রগতি ঘটে চলেছে মাতৃভাষা ও সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা সেগুলির সাথে পরিচিত হতে পারে এবং তার দ্বারা তারা নিজেদেরকে অনুপ্রাণিত ক'রে পরবর্তীকালে প্রগতিশীল কর্মে আত্মনিয়োগ করতে পারে। ফলে সমাজে অগ্রগতির পথ প্রশস্থ হয়।

গ) জাতীয় দৃষ্টিতে উপযোগিতা ঃ

(i) জাতীয় শিল্প সাহিত্য সৃষ্টিতে উপযোগিতা ঃ-

মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চার ফলে ও মাতৃভাষায় লেখার ফলে মানুষের কাছে জাতীয় সাহিত্য পাঠ সহজ হয়ে পড়ে। ফলে জাতিয় সাহিত্য সম্ভার দিনে দিনে বাড়তে থাকে।

(ii) মাতৃভাষা পাঠের মধ্য দিয়ে জাতীর সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা সহজে জানতে পারে এবং তার মাধ্যমে নিজেদের অনুপ্রাণিত করতে পারে। ফলে জাতীর প্রত্যেকটি পাঠক খুব সহজে একে অপরের সংস্পর্শে আসতে পারে।

(iii) মাতৃভাষা পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা একত্রে একটা দেশ তথা জাতিকে বিশ্বায়ণের পথে নিয়ে যেতে পারে সুতরাং বলা যায়, ব্যক্তি থেকে সমাজ তথা জাতি থেকে বিশ্বের উন্নতি সাধনে মাতৃভাষায় পঠন-পাঠন একান্ত অপরিহার্য। মাতৃভাষাই শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত করে তোলে।

৩.৩.৩ শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব (Importance of the mother tongue in education)

মানুষ স্বভাবতই সমাজবদ্ধ জীব। এই সামাজিক মানুষের আবেগ, অনুভূতি, কল্পনা, সৃজন ক্ষমতা প্রভৃতি বিকাশ সার্থক হয়ে ওঠে মাতৃভাষা চর্চার মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষাকে 'মাতৃ দুগ্ধে'র সাথে তুলনা করেছেন। মধুসূদন দত্ত 'বঙ্গভাষা' নামক সনেটে মাতৃভাষাকে গৌরবান্বিত করেছেন। তেমনি আবার যুগে যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমস্ত দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট মনিষীরা মাতৃভাষার গুরুত্বের কথা স্বীকার করেছেন শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্বের নানা দিকগুলি হল—

(i) ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে সহায়ক ঃ-

যুগে যুগে সভ্যতা সংস্কৃতির যে ইতিহাস রচিত হয় মাতৃভাষাই তাকে নিয়ে যায় যুগ থেকে যুগান্তরের পথে। মাতৃভাষাকে মাধ্যম করেই জাতির লেখা বিভিন্ন কথা কাহিনী, আঞ্চলিক সাহিত্য প্রভৃতি ভবিষ্যৎ জাতির কাছে পৌঁছায়। আমরা বাংলা ভাষার ইতিহাস ঘাঁটলে দেখব যে, অনেক প্রবাদ প্রবচন, রূপকথা গল্প প্রভৃতি কোন নির্দিষ্ট লেখক নেই কিন্তু যুগে যুগে যেগুলি বাঙালির মুখে মুখে চলে আসছে মাতৃভাষা চর্চার মধ্য দিয়ে। হয়তো ভবিষ্যতেও যেটা চলতে থাকবে। তাই মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম।

(ii) আত্মপ্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম ঃ-

যে কোন মানুষের আত্মপ্রকাশের সর্বকৃষ্ট মাধ্যম হল মাতৃভাষা, একজন বাঙালীকে যদি তামিল ভাষা কোন রচনা লিখতে বলা হয় সেটা খুবই কষ্টকর। কিন্তু তাকে যদি তার নিজের ভাষার ভাব ব্যক্ত করতে বলা হয় তবেই সে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করতে পারবে। নিজের মনের কথাকে ব্যক্ত করার সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হল মাতৃভাষা।

(iii) ভাবগ্রহণের সহজ মাধ্যম ঃ-

মাতৃভাষা পঠন-পাঠনের মাধ্যমে আমরা অতীত ও বর্তমানের কোন সাহিত্যের রস সহজে উপলব্ধি করতে পারে। বাংলা ভাষায় কোন লেখা যেমন সহজে বুঝতে পারি তেমনি আবার অন্যের মুখে শুনেও সহজে কোন বিষয় বোধগম্য হয়ে ওঠে, অন্যভাষায় যা দ্রুত সম্ভব হয় না।

(iv) ভাবপ্রকাশেরও সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম ঃ-

মাতৃভাষার মাধ্যমে যেমন ভাবগ্রহণ সহজ হয় তেমনি ভাবপ্রকাশও সহজ হয়ে ওঠে। অন্য ভাষায় ভাব প্রকাশ করা অনেকটা কঠিন হয়ে ওঠে।

(v) মাতৃভাষা সামাজিক ও মানবিক সম্পর্কের বন্ধনকে দৃঢ় করে। একই মাতৃভাষা-ভাষি অঞ্চলে দীর্ঘ দিন ধরে বসবাস করার ফলে মানুষ সহজেই একে অপরকে বুঝতে পারে এবং খুব সহজেই সম্পর্ক দৃঢ় হয়।

(vi) একটি দেশে একটি ভাষা চালু থাকলে দেশের সমস্ত নাগরিকদের একের অপরের কাছাকাছি আসতে পারে এবং মানবিক সম্পর্ক দৃঢ় হয় ও দেশের সমস্ত নাগরিকদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে।

(vii) সর্বাঙ্গীন বিকাশের শ্রেষ্ঠ সহায়ক :

শিশু মাকে দেখে সবচেয়ে বেশি শেখে। মাকে সে অধিক বিশ্বাস করে এবং তাকে দেখেই প্রায় সবটাই অনুকরণ করে। যতদিন পর্যন্ত সে শিক্ষালয়ে না পৌঁছায় ততদিন পর্যন্ত মাকে দেখেই এবং মাকে অনুকরণ করেই তার সমস্ত দিক বিকশিত হয় এবং পরবর্তী জীবনেও তা প্রভাব ফেলে। অবশ্য মা ছাড়া পরিবারের অন্যান্যদের জীবনও তাকে প্রভাবিত করে।

(viii) মাতৃভাষা অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুর বুদ্ধির বিকাশ সহজ এবং সাবলীল হয়।

(ix) অস্তিত্ব রক্ষার শর্ত ঃ

মাতৃভাষা সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ় করে। একই পরিবারে মা, বাবা, ভাই, বোন, আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে দীর্ঘদিন থাকা এবং একভাষায় কথা বলার জন্য মানুষের নাড়ির টান গড়ে ওঠে। তেমনি সমগ্র জাতিও একই মাতৃ ভাষাভাষি হলে একে অপরের কাছাকাছি আসতে পারে, একে অপরকে বুঝতে পারে এবং জাতীর মধ্যে একটা টান তৈরী হয়। তাই জাতীর বিপদের সময় সহজে সমগ্র জাতি এক হয়ে উঠতে পারে।

(x) মাতৃভাষা অন্যান্য বিষয় শিক্ষার মাধ্যম ঃ-

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা, মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বহুদিন বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা চালু হয়েছে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেই বাংলা ভাষার পথ ক্রমশঃ প্রশস্ত হচ্ছে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ পেলে শিক্ষার্থীরা সহজে জ্ঞান - বিজ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করতে পারবে। বিদেশী ভাষায় তা সম্ভব নয়। তাই প্রথম ভাষার পাশিপাশি অন্যান্য বিষয় চর্চাও মাতৃভাষা মাধ্যমে হওয়া উচিত। পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য যে কোন বিষয় চর্চার সময় শিক্ষার্থীরা তাদের ধারণাকে যাতে সাবলীলভাবে ব্যক্ত করতে পারে তার জন্য মাতৃভাষা চর্চা করা প্রয়োজন। মাতৃভাষা কেবল শিক্ষার বাহন নয়, অন্যান্য বিষয়ের ভিত্তিও।

(xi) মাতৃভাষা ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনে সহায়ক ঃ

যে কোন মাতৃভাষায় রচিত কাব্য সাহিত্যে সাধারণত সেই ভাষা-ভাষি অঞ্চলের মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, জীবন বৃত্তান্ত লেখা থাকে। শিক্ষার্থীরা সেই কাব্য সাহিত্য পাঠ করে। সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষার্থীরা তাদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রকে সঠিকভাবে গড়ে নিতে পারে।

(xii) শিক্ষার্থীদের চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটে ঃ-

বস্তুগত চাহিদাগুলি ছাড়াও মানুষের জীবনে কিছু মানসিক চাহিদা থাকে। অন্যান্য প্রাণীদের মত মানুষ শুধু বস্তুগত প্রয়োজন সিদ্ধ হলে সন্তুষ্ট হতে পারে না। কখন কাব্য, সাহিত্য পাঠ, আবার কখনো কাব্য, সাহিত্য, শিল্প সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মানুষের সৌন্দর্য সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষার কিছুটা পরিতৃপ্তি ঘটে;মাতৃভাষা চর্চার মধ্য দিয়ে তা অনেকটাই সম্ভব হয়ে ওঠে।

(xiii) মাতৃভাষা মানসিক সুস্থতা রক্ষায় সহায়ক হিসাবে কাজ করে। জীবনে চলার পথে প্রতি মুহূর্তে শিক্ষার্থীদের মনে সুখ-দুঃখ-আবেগ, ঘৃণা ভালোবাসা প্রভৃতি ভাবের জাগরণ ঘটে যা তাদের উত্তেজিত করে। মাতৃভাষার মাধ্যমে বহিঃপ্রকাশ হলে শিক্ষার্থীদের মানসিক সুস্থতা বজায় থাকে।

(xiv) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রত্যন্ত নিরক্ষর গ্রামবাসীদের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া যায়। তাই মাতৃভাষা সর্বসাধারণের ভাষা।

(xv) কোন জটিল বিষয় বা তত্ত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিতে গেলে মাতৃভাষা পঠন-পাঠন করা জরুরি।

(xvi) ইংরাজি, হিন্দি বা অন্যান্য ভাষায় পঠন করতে ও বুঝতে যত সময় লাগে মাতৃভাষায় পঠন করলে অনেক কম সময় লাগে মাতৃভাষা সময়ের অপচয় রোধ করে।

(xvii) জাতীয়তা বন্ধন দৃঢ় করে তুলতে মাতৃভাষা অপরিহার্য।

(xviii) উচ্চ-নীচ-মধ্য- সমাজের সর্বস্তরে মাতৃভাষা সেতু রচনা করতে পারে।

(xix) মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার আকাঙ্ক্ষা সহজে চরিতার্থ হতে পারে।

(xx) মাতৃভাষা চর্চা শিক্ষার্থীদের বিচারবুদ্ধিকে শানিত করে। মানুষের চিন্তা জগতের ভাষা হল মাতৃভাষা। মানুষের চেতন অবচেতন স্তরে প্রতিনিয়ত যে চিন্তন-প্রক্রিয়ার কাজ চলছে মাতৃভাষাই তার প্রধান অবলম্বন। সুতরাং বলা যায় মাতৃভাষা হচ্ছে জীবনের এমন একটা অপরিহার্য আচরণীয় বিষয় যা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রসারিত;— যা অস্বীকার করা যায় না।

৩.৪ বাংলা ভাষা উদ্ভবের প্রাসঙ্গিক ইতিহাস ঃ

মূল ইন্দো ইউরোপীয় ভাষার একটি অংশ ইরান - পারস্যে প্রবেশ করে (Indo-Iranian Branch) আর একটি অংশ ভারতবর্ষে প্রবেশ করে (Indo - Aryan or Indic Language) নাম ধারণ করে। আনুমানিক ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ভারতবর্ষে আর্যভাষা প্রবেশ করে। তারপর থেকে আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসে ভারতবর্ষে নতুন-নতুন রূপে আর্যভাষা আজও বেঁচে আছে। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছরের সুদীর্ঘ ইতিহাসকে পরিবর্তনের লক্ষণীয় পদক্ষেপ অনুসারে তিনটি প্রধান যুগে ভাগ করা হয়।

(1) প্রাচীন ভারতীয় আর্য (Old Indo-Aryan = OIA)
(2) মধ্য ভারতীয় আর্য (Middle Indo - Aryan = MIA)
(3) নব্য ভারতীয় আর্য (New Indo - Aryan = NIA)

বাংলা ভাষা উদ্ভবের মূলে রয়েছে ঐ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা। এই ভাষাতেই ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এই চারটি বেদ রচিত হয়েছিল। তাই এই যুগের ভাষা আবার বৈদিক ভাষা নামেও পরিচিত। আর্যরা এদেশে এসে আর্য ভাষার প্রচলন করে। খ্রিষ্টের জন্মের প্রায় দুহাজার বছর আগে ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিকের গিরিপথ দিয়ে আর্যরা ভারতে আসে। পরে আর্যরা উত্তর-পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বসবাস করে। তখন এদেশে যে অনার্যরা বসবাস করত তারা দ্রাবিড় ভাষায় কথা বলত। পরবর্তীকালে অনার্যরাও ক্রমে ক্রমে আর্যভাষা গ্রহণ করেছিল।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার মূলতঃ দুটি রূপ ছিল — একটি হল সাহিত্যিকরূপ যার অপর নাম 'দেবভাষা' বা বৈদিক ভাষা, আর একটি হল কথ্যরূপ। আর্যরা ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ায় প্রকৃতির অপরিহার্য নিয়মে কথ্য ভাষার মধ্যে নানারকম বিকৃতি দেখা গিয়েছিল। এই বিকৃতকে রোধ করার জন্য পাণিনি ও অন্যান্য বৈয়াকরণিকরা ভারতীয় আর্যভাষার শুদ্ধ মার্জিতরূপে যে আদর্শ রচনা করেন তাই সংস্কৃত ভাষা নামে পরিচিত। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিস্তৃতি কাল হল খ্রিঃ পূঃ ১৫০০ শতাব্দী থেকে খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল —

(1) বৈদিক ভাষায় ঋ, ৠ, ঌ, সহ সমস্ত স্বরধ্বনি এবং শ, ষ, স্ সহ সমস্ত ব্যাঞ্জনধ্বনি প্রচলিত ছিল।

(2) পাশাপাশি অবস্থিত সন্নিহিত স্বরধ্বনির সন্ধি অপরিহার্য ছিল।

(3) বিভিন্ন প্রকার যুক্ত ব্যঞ্জনের প্রচলন ছিল

(4) শতৃ, শানচ্ ইত্যাদি প্রত্যয় যোগে বহু বিচিত্র ক্রিয়াজাত বিশেষণ সৃষ্টি করা হত।

(5) প্র, পরা, অপ প্রভৃতি উপসর্গ ক্রিয়ার সঙ্গে শুধু যুক্ত হয়েই ব্যবহৃত হত না, ক্রিয়ার বিশেষণ হিসাবে স্বতন্ত্র পদরূপ ব্যবহৃত হত।

(6) ক্লাসিকাল সংস্কৃতে দীর্ঘসমাসের বহু ব্যবহার ছিল

(7) শব্দরূপের চেয়ে ধাতুরূপে বৈচিত্র্য বেশী ছিল।

(8) এই ভাষায় স্বরধ্বনি পরিবর্তনে গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ এই তিনটি রীতি প্রচলিত ছিল।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে খ্রিঃ পূঃ পঞ্চদশ - ষোড়শ - শতকে যে নতুন রূপ ধারণ করেছিল তাই মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা বা প্রাকৃতভাষা। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার ব্যপ্তিকাল খ্রিঃ পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টীয় দশম শতক পর্যন্ত। এই সময়কালে প্রাকৃত ভাষার যে পরিবর্তন ঘটেছিল তাকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায় - (ক) প্রথম স্তর-খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিঃ প্রথম শতক; নিদর্শন - সম্রাট অশোকের শিলালিপি, হীনযানপন্থী বৌদ্ধদের পালি ভাষায় লিখিত গ্রন্থ এবং অন্যান্য প্রত্নলিপি।

খ) দ্বিতীয় স্তর - খ্রিঃ প্রথম শতক থেকে ষষ্ঠ শতক; নিদর্শন সাহিত্যিক প্রাকৃত, বৌদ্ধদের ব্যবহৃত সংস্কৃত প্রাকৃত মিশ্রভাষা এবং অন্যান্য প্রত্নলিপি।

গ) তৃতীয় স্তর - খ্রিঃ ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত, নিদর্শন - অপভ্রংশ সাহিত্য। মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

(i) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার 'ঋ' ও 'ঌ' ধ্বনি মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় লুপ্ত হল। 'ঋ'-কার কখনো অ-কার, কখনো উ-কার হয়েছে। যেমন - মৃগ-মগ, বৃত্ত—বুত

(ii) যৌগিক স্বর 'ঐ' এবং ঔ যথাক্রমে 'এ' এবং 'ও' তে পরিণত হল

(iii) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার তিনটি শিসধ্বনি শ, স, ষ পরিবর্তিত হয়ে একটি শিসধ্বনি দন্ত স তে পরিণত হয়।

(iv) ক্ষ পরিবর্তিত হয়ে 'ক্ - খ'- তে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন — মোক্ষ > মোক্খ।

(v) 'ভূ' ধাতু পরিবর্তিত হয়ে 'হু - তে পরিণত হয়েছে। যেমন — ভবতি > হোতি।

(vi) আত্মনেপদে শানচ্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখা যায়।

(vii) শব্দরূপ ও ধাতুরূপে দ্বিবচন মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় লুপ্ত হল।

(viii) ত্ব ও ত্ম এই দুটি সংযুক্ত ব্যঞ্জণ পরিবর্তিত হয়ে 'ৎপ' রূপ লাভ করে। যেমন আত্ম > আৎপ।

(ix) কখনো কখনো সমীভবনের প্রয়োগ দেখা যায়।

(x) পালি ভাষায় 'ল' ও 'ণ' দুইই রক্ষিত ছিল।

(xi) পালি ভাষায় অল্প প্রাণধ্বণি কখনো কখনো মহাপ্রাণ বর্ণ হয়েছে।

বাংলা তথা নব্য ভারতীয় আর্য (NIA) ভাষাগুলির আধুনিক ইতিহাস, জানতে হলে তার ঐতিহাসিক বিবর্তন স্মরণ না করলে উপায় নেই। নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির জন্ম উৎস বা ঐতিহাসিক বর্গীকরণ করতে হবে তাদের জন্মের অব্যবহিত উৎসস্বরূপ মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার আঞ্চলিক রূপগুলির উপরে

ভিত্তি করেই। কারণ মধ্য ভারতীয় আর্যের এক-একটি আঞ্চলিক রূপ থেকেই পরবর্তীকালের নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলির এক-একটি গোষ্ঠী বা ঐতিহাসিক, শ্রেণী গড়ে উঠেছে। আমরা অনুমান করতে পারি ভারতীয় আর্য ভাষার বিবর্তনের প্রত্যেক পর্বেই তার দুটি রূপ — যথা সাহিত্যিক ও কথ্য প্রায় সমান্তরাল ধারায় বয়ে গেছে যদিও তাদের বিভিন্ন পর্বের নিদর্শন সর্বক্ষেত্রে পাওয়া যায় না।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষারও দুটি রূপ ছিল — একটি সাহিত্যিক, অন্যটি কথ্য। সাহিত্যিক রূপটির নিদর্শন পাই বেদের ভাষায় — বিশেষত ঋগ্বেদ - সংহিতায়। তার নাম 'ছান্দস' ভাষা। আর কথ্য রূপটির তিনটি আঞ্চলিক ভেদ বা উপভাষা ছিল — প্রাচ্য - উদীচ্য, মধ্যদেশীয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কথ্য রূপটির আর একটি উপভাষা অনুমান করেছেন — দাক্ষিণাত্য। অনুমান করতে পারি পরবর্তী যুগে প্রাচ্য শাখা থেকে 'প্রাচ্য' ও 'প্রাচ্য-মধ্যার', উদীচ্য থেকে 'উত্তর - পশ্চিমা' এবং 'মধ্যদেশীয়' ও 'দাক্ষিণাত্য' থেকে 'পশ্চিমা' বা 'দক্ষিণ - পশ্চিমার জন্ম হয়েছিল। কথ্য উপভাষার মতো সাহিত্যিক প্রাকৃতেরও দ্বিতীয় স্তরে এক বা একাধিক উপভাষার জন্ম হল দ্বিতীয় স্তরের সাহিত্যিক প্রাকৃতের পাঁচটি উপভাষা ছিল (i) পৈশাচী (ii) শৌরসেনী (iii) মহারাষ্ট্রী, (iv) অর্ধমাগধী এবং (v) মাগধী। অনুমান করা যায়, উত্তর-পশ্চিমা থেকে জন্ম নিয়েছিল পৈশাচী, পশ্চিমা বা দক্ষিণ-পশ্চিমা থেকে শৌরসেনী ও মহারাষ্ট্রী, প্রাচ্য-মধ্যা থেকে অর্ধমাগধী এবং প্রাচ্য থেকে মাগধী।

ভাষাতাত্ত্বিকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পরবর্তীকালে প্রত্যেকটি প্রাকৃতের কথ্যরূপ থেকে সেই শ্রেণীর অপভ্রংশের এবং আরও পরবর্তীকালে অবহট্ঠের জন্ম নিল। যেমন পৈশাচী প্রকৃত থেকে পৈশাচী অপভ্রংশ অবহট্ঠ, শৌরসেনী প্রাকৃত থেকে শৌরসেনী অপভ্রংশ অবহট্ঠ, মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত থেকে মহারাষ্ট্রী - অপভ্রংশ - অবহট্ঠ, অর্ধমাগধী প্রাকৃত থেকে - অর্ধমাগধী - অপভ্রংশ-অবহট্ঠ এবং মাগধী প্রাকৃত থেকে মাগধী অপভ্রংশ অবহট্ঠ। প্রত্যেকটি প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহট্ঠ থেকে কোনো না কোনো নব্য ভারতীয় আর্যভাষার জন্ম।

প্রাচ্যা থেকে জাত মাগধী প্রাকৃত থেকে মাগধী অপভ্রংশ অবহট্ঠের জন্ম অনুমান করা হয়। মাগধী অপভ্রংশ অবহট্ঠের কোনো লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায় নি। মাগধী গোষ্ঠীর ভাষাগুলি দুটি শাখায় বিভক্ত - পশ্চিমা শাখা ও পূর্বী শাখা পশ্চিমা শাখা থেকে জন্ম হয়েছে তিনটি আধুনিক ভাষার - মৈথিলী; মগহী ও ভোজপুরী। আর পূর্বী শাখা থেকে জন্ম হয়েছে ওড়িয়া ও বঙ্গ অসমিয়া। বঙ্গ অসমিয়া আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে দুটি ভাষা জন্ম দেয় - বাংলা ও অসমিয়া।

নব্য-ভারতীয় আর্যভাষার বৈশিষ্ট্য ঃ-

(1) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিষম ব্যঞ্জন মিলিত হলে নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় সম ব্যঞ্জনে পরিণত হয়। পক্ক > পক্ক, বর্গ > বগ্ন।

(2) মুক্তব্যঞ্জনের নাসিক্য ব্যঞ্জনটি লোপ পেয়েছে এবং তার পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি আনুনাসিক হয়ে গেছে কন্টক > কাঁটা।

(3) পদের অন্তে অবস্থিত স্বরধ্বনি প্রায়ই লুপ্ত বা বিকৃত হয়েছে - সংস্কৃত রাম > রাম্

(4) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিভক্তি নব্যভারতীয় অর্যে এসে লুপ্ত হল এবং সেই স্থানে উপসর্গ অনুসর্গের ব্যবহার দেখা গেল।

(5) অধিকাংশ নব্যভারতীয় আর্যভাষায় একবচন ও বহুবচনের রূপভেদ রইল না।

(6) নব্যভারতীয় আর্যভাষায় ক্রিয়ারূপেও সরলীকরণ হয়েছে খুব বেশী।

বাংলা ভাষার উদ্ভব কিভাবে হয়েছে একটি চিত্রে সাহায্যে দেখতে পারি :

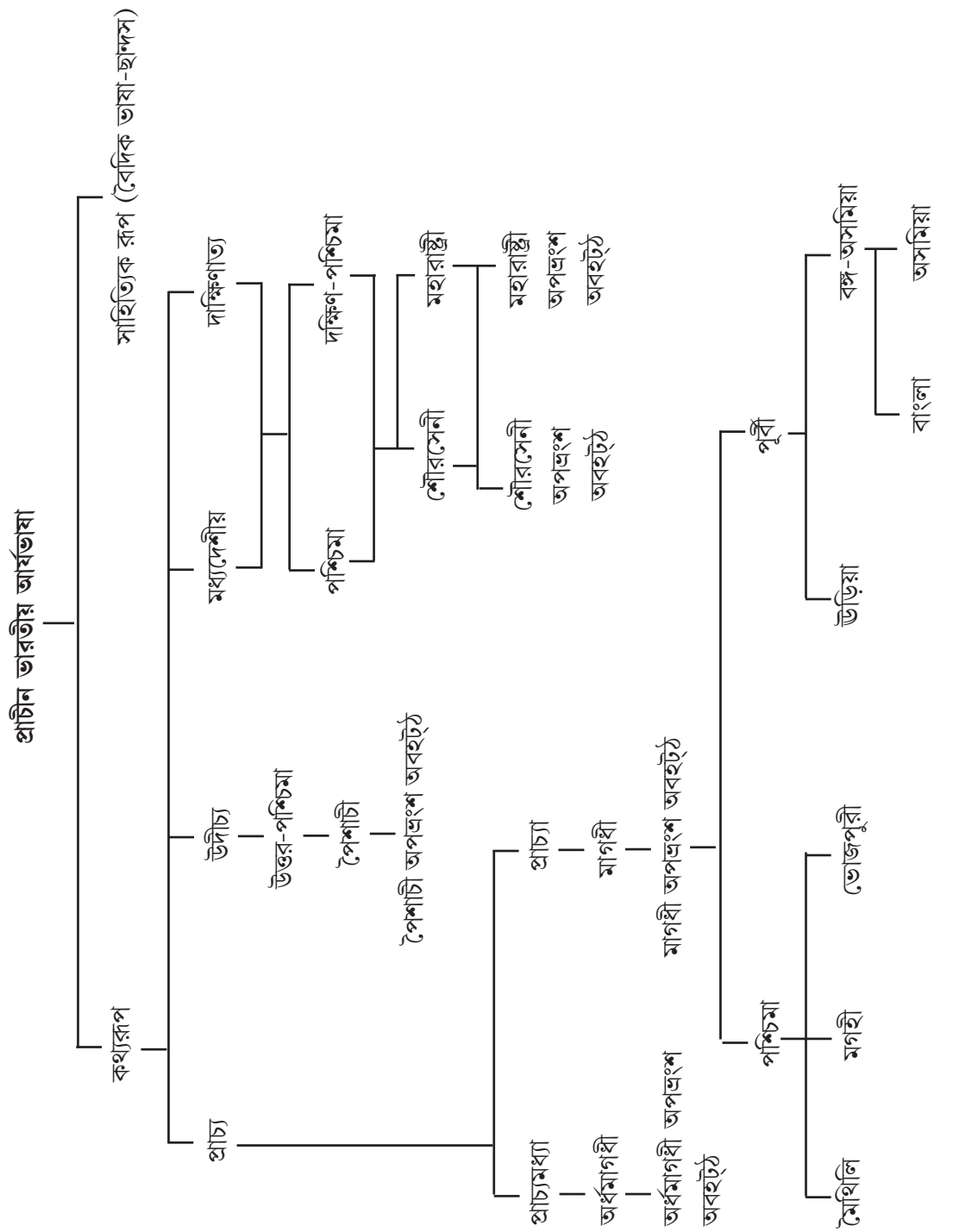

ভাষাতাত্ত্বিকরা অনুমান করেন খ্রীস্টিয় নবম-দশম শতাব্দীতে প্রাচীন বাংলা ভাষায় উদ্ভব হয়। তারপর বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে।

বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ

(i) প্রাচীন যুগ — আনুমানিক দশম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী মধ্যবর্তীকাল পর্যন্ত নিদর্শন চর্যাপদ।

(ii) মধ্যযুগ — চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকাল থেকে ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত। মধ্যযুগের বাংলা ভাষার দুটি স্তর। ক) আদি মধ্যস্তর খ) অন্তমধ্যস্তর।

ক) আদি মধ্যস্তর / সময়কাল — ১৪ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকাল থেকে ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত / বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এর নিদর্শন পাওয়া যায়।

খ) অন্তমধ্যযুগ / সময়কাল — ১৬শ শতাব্দী থেকে ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত / মঙ্গল কাব্য, অনুবাদ কাব্য, শাক্ত পদাবলীতে এর নিদর্শন পাওয়া যায়।

(iii) আধুনিক যুগ / সময়কাল ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত। এই যুগে বাংলা ভাষার বিশেষ সমৃদ্ধি ঘটেছে এবং বাংলা ভাষা অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই যুগের শুরু থেকে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রথম চৌধুরী প্রমুখ সাহিত্যিকদের অনন্যসাধারণ স্পর্শে বাংলা ভাষা বলিষ্ঠ রূপ পেল। আধুনিক বাংলা ভাষার দুটি রূপ সাধু এবং চলিত। সাধুভাষায় তৎসম শব্দের প্রাধান্য বেশি, তদ্ভবও দেশী-বিদেশী শব্দের আধিক্য বেশী থাকে না। আধুনিক বাংলা ভাষার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য হল—

১। অভিশ্রুতির প্রয়োগ বেশি।

২। দেশী-বিদেশী-তৎসম-তদ্ভব-মিশ্র ইত্যাদি শব্দ সম্ভার নিয়ে গঠিত।

৩। আধুনিক বাংলায় 'এবং' 'ও' এই দুটি সংযোজক ব্যাপক পরিমাণে ব্যবহৃত।

৪। লিখিত ভাষায় সাধু-চলিত ভাষার সমান দেখা যায়।

৫। ছন্দ রীতিতে নানা বৈচিত্র্য আধুনিক বাংলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৩.৫.১ মাতৃভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা :

বর্তমান যুগে মাতৃভাষাই যে সর্বস্তরের শিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট বাহন সে কথা আজ বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদেরা একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। আমাদের দেশেও বহুদিন হল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার বাহন হিসাবে মাতৃভাষার প্রচলন হয়েছে। উচ্চশিক্ষার স্তরে নীতিগতভাবে অনেকে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিলেও এখনও পর্যন্ত কিছু সনাতনপন্থী ও স্বার্থান্বেষী শিক্ষাবিদ প্রধানত মাতৃভাষায় উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাবের কথা তুলে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার ব্যাপারটিকে বিলম্বিত করতে চাইছেন। বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে মাতৃভাষা গুরুত্ব কি সে প্রসঙ্গে আলোচনা করার পূর্বে মাতৃভাষা শিক্ষার প্রয়োজন কেন সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাক—

(১) সঠিক বর্ণ উচ্চারণ :

মাতৃভাষা শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীরা বর্ণগুলি সঠিক উচ্চারণ শিখবে। যেমন 'জ'— 'বর্গীয়-জ', 'য'— 'অন্তঃস্থ-য' বা 'অন্তঃ-য'। তিনটি শিসধ্বনি— 'তালব্য-শ', 'মূধ্যার্ণ-ষ', 'দন্ত্য-স'। 'ক্ষ'— 'ক'-এ মূধ্যর্ণ-ষ ক্ষিয়', 'য়'— 'অন্তঃস্থ -অ 'ইত্যাদি।

(২) সঠিক শব্দ উচ্চারণ শিখবে :

মাতৃভাষা শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীরা শব্দগুলি সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারবে। যেমন— 'সম্মান'— এর 'সন্মান নয়', 'সম্মান' উচ্চারণ করতে শিখবে।

'অহ্বান'-এর 'আহোবান নয়' 'আওভান' উচ্চারণ করতে শিখবে। তেমনি আবার 'আত্মা' বা 'মহাত্মা' বলতে 'আত্মা বা মহাত্মা নয়' 'আত্তাঁ বা মহাত্তাঁ' উচ্চারণ শিখবে ইত্যাদি।

(৩) সঠিক বাক্য গঠন করতে শিখবে :

মাতৃভাষা শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীরা বাক্যগঠনের সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে অবহিত হবে। বাক্যের কোথায় কর্তা বসবে, কোথায় কর্ম বসবে, কোথায় ক্রিয়া বসবে, মাতৃভাষায় ব্যাকরণ পাঠের মধ্য দিয়ে তা শিক্ষার্থীরা সহজেই বুঝতে পারবে। তাছাড়া কোনটি নির্দেশসূচক, কোনটি প্রশ্নবোধক, কোনটি বিস্ময়বোধক বাক্য তা সহজে বুঝতে পারবে।

(৪) শব্দের অর্থ উপলব্ধির সহায়ক :

মাতৃভাষা শিক্ষার দ্বারা শব্দ বা বাক্যের বাহ্যিক রূপ যেমন শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবে তেমনি আবার প্রত্যেকটি শব্দ বা বাক্যের অর্থ অনুভব করা সহজ হয়ে উঠবে।

(৫) বিভিন্ন পত্র রচনার সহায়ক :

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বসবাস করতে গেলে তাকে সামাজিক বা ব্যক্তিগত বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য কোন কোন সময় পত্র রচনা করা প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন ধরনের পত্র রচনার আঙ্গিক জানার জন্য মাতৃভাষা শিক্ষার একান্তই প্রয়োজন।

(৬) পূর্বে রচিত কাব্য সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ :

মাতৃভাষা শিক্ষার দ্বারা সেই ভাষা গোষ্ঠীর মানুষ তার পূর্বে রচিত কাব্য সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ করতে পারবে। যুগে যুগে মানুষের জীবন যাত্রা সহিত্যে ফুটে ওঠে। বিভিন্ন যুগের মানুষদের জীবন সম্পর্কে সঠিকভাবে জ্ঞান লাভ করার জন্য মাতৃভাষা শিক্ষার প্রয়োজন।

(৭) অন্যান্য বিষয় শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয় :

মাতৃভাষা শিক্ষার দ্বারা ইতিহাস, ভূগোল, পরিবেশ বিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদি বিষয় শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়।

(৮) মাতৃভাষার ব্যাকরণের জ্ঞান অন্যান্য ভাষায় ব্যাকরণ শিখতে সাহায্য করে। মাতৃভাষায় ব্যকরণের জ্ঞান যার পুরোপুরি অধিগত তার পক্ষে অন্যান্য ভাষার ব্যাকরণ বোঝাও সহজ হবে।

(৯) সন্ধি, সমাস, প্রত্যয়, এককথায় প্রকাশ, বাগ্‌ধারা ইত্যাদি সঠিকভাবে জানার জন্য বাঙালী শিক্ষার্থীদের অবশ্যই মাতৃভাষা শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

(১০) মাতৃভাষা জ্ঞান যার দৃঢ় সে অন্যান্য ভাষাও অনেক সহজে নিতে পারে। আর মাতৃভাষা শিক্ষার ভিত নড়বড়ে হলেই শিক্ষার্থীরা অন্যান্য ভাষার সাথে তালগোল পাকিয়ে ফেলে।

(১১) সাধু-চলিত রীতি মিশ্রণ যাতে না ঘটে সে জন্য মাতৃভাষা শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

(১২) কোন কাহিনী, ঘটনা বা সাময়িক পত্র দ্রুত পড়তে গেলে মাতৃভাষা শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় হওয়া প্রয়োজন, মাতৃভাষা সম্পর্কে জ্ঞান বেশী না থাকলে যে কোন বিষয় পড়তে অনেকটা সময় লেগে যায়।

(১৩) নীরব পাঠের দ্বারা কোন বিষয় পড়তে গেলেও সেই ভাষা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার।

(১৪) সর্বপরি শিক্ষার্থীদের মনের ভাবকে প্রকাশ করার জন্য মাতৃভাষা শিক্ষার প্রয়োজন। যে ভাষায় আমাদের জন্ম, যে ভাষায় জীবন গড়ে তুলি, যে ভাষার দৃষ্টিতে দেখি, যে ভাষায় ভাবি, যে ভাষায় নিজের অনুভূতিকে ব্যক্ত করি সে ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন কেন তা মনে হয়ে বলে বোঝানো যায় না।

৩.৫.২ বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে মাতৃভাষার গুরুত্ব

বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিষয় সার্থকভাবে শিক্ষাদান করতে হলে সে বিষয়টি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য কি সে সম্পর্কে শিক্ষককে পরিপূর্ণ সজাগ থাকতে হবে। মাতৃভাষা শিক্ষাদানের গুরুত্ব কোথায় সে সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকলে শিক্ষকের পক্ষে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের কাজ চালানো কষ্টকর হয়ে উঠবে। তাই শিক্ষকের উচিত মাতৃভাষা শিক্ষাদানের প্রকৃত গুরুত্বগুলি সম্পর্কে অবহিত হওয়া। গুরুত্বগুলি হল—

(১) মাতৃভাষা হল শিক্ষার্থীদের আত্মপ্রকাশের উৎকৃষ্ট মাধ্যম। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে ভালোভাবে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। কোন শিক্ষিত ব্যক্তি দুরকমভাবে মনোভাব প্রকাশ করে— ক) মৌখিকভাবে খ) লিখিতভাবে। বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে মাতৃভাষা চালু করলে শিক্ষার্থীরা সহজ সরল করে তাদের মনের ভাবকে মৌখিক ও লিখিতভাবে প্রকাশ করতে পারবে।

(২) বর্তমান শিক্ষায় বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপরে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ বলতে চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, স্মৃতিশক্তি, বিচার শক্তি ইত্যাদিকে বোঝানো হয়। আবার সুখ-দুঃখ আনন্দ অনুভূতি, শ্রদ্ধা-ভালোবাসা, বিস্ময় ইত্যাদি হল প্রাক্ষোভিক দিক।

এছাড়া নৈতিক দিকগুলি হল— ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা। বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে মাতৃভাষা চালু করলে শিক্ষার্থীদের নৈতিক, প্রাক্ষোভিক, দৈহিক ইত্যাদি বিকাশের পথ সহজ হবে।

(৩) মাতৃভাষা শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীদের দ্রুত পঠন করার অভ্যাস গঠন করা যাবে।

(৪) শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে নানা ধরনের সৃজনশক্তি আছে মাতৃভাষার মাধ্যমে নানাভাবে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো যেতে পারে। মাতৃভাষার ক্লাসে যদি শিক্ষার্থীরা গল্প লেখা, রচনা লেখা, পদ্য লেখা বা ছড়া লেখা, ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখা, ডায়েরী লেখা প্রভৃতি বিষয়গুলি যথাযথ চর্চার বিকাশ পায় তাহলে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভার যথার্থ বিকাশ হবে। মাতৃভাষা শিক্ষার এটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

(৫) শিক্ষার্থীদের মনে সৌন্দর্য সৃষ্টি ও সৌন্দর্য সম্ভোগের যে চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, মাতৃভাষাই পারে তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলি চরিতার্থ করতে। শিক্ষার্থীরা কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প সৃষ্টির মাধ্যমে মানসিক চাহিদা পরিতৃপ্ত করে, আবার মাতৃভাষায় রচিত কাব্য, সাহিত্য চর্চা ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সৌন্দয সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি করতে পারে।

(৬) বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ও সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরমতসহিষ্ণুতা, সহযোগিতা, সহানুভূতি, বন্ধুপ্রীতি, মানবকল্যাণের ইচ্ছা প্রভৃতি সামাজিক, গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। সার্থক সমাজ জীবন-যাপনের জন্য এই গুণগুলির বিকাশ ঘটা খুবই প্রয়োজনীয়। কারণ এগুলির অভাবে শিক্ষার্থীরা অহংকারী, ইর্ষাপরায়ণ, অসামাজিক হয়ে ওঠে। সাহিত্য হল চরিত্রগণ শিক্ষার মাধ্যম। মাতৃভাষা ও সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তেজস্বিতা, মহত্ত্ব, মানবিকতা, পরহিতৈষণা ইত্যাদি আত্মীকগুণের বিকাশ ঘটে।

(৭) মাতৃভাষাকে বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত কেবল একটি বিচ্ছিন্ন পাঠ্যবিষয় হিসাবে বিবেচনা করলে চলবে না। মাতৃভাষা, পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত অন্যান্য সমস্ত বিষয় শিক্ষার ভিত্তি স্বরূপ। মাতৃভাষার ভিত্তি দৃঢ় হলে তবেই অন্যান্য বিষয় শিক্ষার পথ সুগম হবে।

(৮) মাতৃভাষা ও সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদরে মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটতে পারে। স্বাধীনতা দিবস, শিক্ষকদিবস, মহাপুরুষদের জন্মজয়ন্তী প্রভৃতি পালন করা এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন প্রণালী ও সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটানো যেতে পারে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দেশ তথা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক অগ্রগতি ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। মাতৃভাষায় রচিত কাব্য-সাহিত্যের মধ্যে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। এছাড়া বর্তমানে দেশে-বিদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান জগতে যে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে মাতৃভাষার মাধ্যমে নানাভাবে সমাজে তার প্রতিফলন ঘটে। এইভাবে বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা চর্চার মধ্য দিয়ে সমাজের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হয়ে ওঠে।

(৯) বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ও সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের স্বাধীন চিন্তা ও বিচারশক্তির বিকাশ ঘটতে পারে। একজন উৎকৃষ্ট নাগরিকের যে সমস্ত জ্ঞান থাকা দরকার তার মধ্যে এই দুটি গুণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া কোন শিক্ষার্থীই একজন উৎকৃষ্ট নাগরিক হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে না যদি না সে যথাযথভাবে তার মাতৃভাষা ব্যবহারের এবং মাতৃভাষার জ্ঞানের মাধ্যমে সবকিছুর মূল্য উপলব্ধি করার শিক্ষা লাভ করে। এই সব নানা দিক থেকে বিদ্যালয়ে মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম যা অস্বীকার করা যায় না।

৩.৬ মাতৃভাষা শিক্ষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অভিমতের মূল্যায়ন।

একজন বিশ্ববন্দিত বাঙালী সাহিত্যিক এবং অপরজন স্বনামধন্য বাঙালী বিজ্ঞানী-বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু। আলোচ্য বিষয় বাংলা ভাষা সংক্রান্ত এবং দুই ভিন্নমেরুর মনিষীর একই বিষয়ের উপর অভিমতের মূল্যায়ন—মাতৃভাষা শিক্ষা। আসলে এ বিষয়ে দুই মনিষীর সাধারণ ধর্ম হল তাঁরা বাঙালী। ক্ষেত্র ভিন্ন হলেও বাঙালির প্রাণের ভাষা, তার মাতৃভাষা সম্পর্কে অনেক স্থলে এই দুই মনিষীর মতামত আমাদের মাতৃভাষা চর্চাকে সমৃদ্ধ যেমন করেছে তেমনি দাঁড় করিয়েছে আয়নার সামনে।

তৎকালীন বাঙালীকে শিক্ষাজগতে যে প্রকার বিধি ব্যবস্থায় না চাইতেও পড়তে হয়েছিল তা হল মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে জীবন ধারণের তাগিদে ইংরাজি ভাষায় শিক্ষাগ্রহণ। রবীন্দ্রনাথ বলেন, ''যে ভাষায় আমাদের শিক্ষা সমাধা হয়, সে ভাষায় প্রবেশ করিতে আমাদের অনেক দিন লাগে। ততদিন পর্যন্ত কেবল দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া হাতুড়ি পেটা এবং কলুপ খোলার তত্ত্ব অভ্যাস করিতে প্রাণান্ত হইতে হয়।'' তিনি আরও বলেন, ''এইরূপ শিক্ষা প্রণালীতে আামাদের মন যে অপরিণত থাকিয়া যায়, বুদ্ধি যে সম্পূর্ণ স্ফূর্তি পায় না সেকথা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে।'' যথার্থই তিনি বুঝেছিলেন, নিজস্ব মননকে সার্বজনীন করতে এবং সার্বজনীনতাকে নিজ অন্তরে সাঙ্গীকরণ করতে মানুষ যে ভাষায় স্বতস্ফূর্তভাবে বেড়ে ওঠে অর্থাৎ মাতৃভাষা—তার কোন বিকল্প হয় না। স্যাডলার কমিশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিমত প্রকাশ করেন, ''স্কুলে ইংরাজি ও অঙ্কশাস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের পঠন-পাঠন মাতৃভাষায় হওয়া উচিত।'' তাঁর সারাজীবনের সাহিত্যচর্চার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেটুকু শিক্ষা বিষয়ক চিন্তাভাবনা আমরা পেয়েছি তাতে করে তাঁর অভিমতের মূল্যায়ন পরিস্কার হয় বা স্বচ্ছভাবে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় মাতৃভাষা প্রসঙ্গে তাঁরই অমর উক্তিতে, ''মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ''।

'বিজ্ঞানী বোস' নামে পরিচিত বাংলার স্বনাম ধন্য ব্যক্তিত্ব সত্যেন্দ্রনাথ বসু শিক্ষা সম্পর্কে যেটুকু, আলোকপাত করেছেন সেখানেও দেখা যায় মাতৃভাষার গুরুত্বই তিনি বারংবার উপলব্ধি করেছেন। তথাকথিত শিক্ষা ব্যবস্থায় যেখানে শিশুর ভূমিকা ছিল গৌণ, নিস্ক্রিয়—বিজ্ঞানী বোস গতানুগতিক এই পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন। বাস্তবিকই বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথের চিন্তাতে শিশুকেন্দ্রীক শিক্ষাপদ্ধতির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। 'শিশু ও বিজ্ঞান' শীর্ষক প্রবন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ শিশুর বিজ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি শিক্ষার্থীর মনে 'প্রথমে কৌতুহল জাগ্রত করে বা প্রেষণা সৃষ্টি করে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের কথা বলেছেন। বিজ্ঞান শিক্ষাদানে তিনি ছিলেন 'সহজ থেকে কঠিন' নীতির সমর্থক। শিক্ষার্থীর মনে বিভিন্ন ধারণা, মনোভাব, মানসিক সংগঠন, চিন্তার উপাদান-এ সবই মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। সে যখন নতুন কিছু দেখে, শোনে বা বোঝে তখন সে তার মনের এই উপকরণগুলোর সাহায্যেই তা করে। তাই শিক্ষার্থীর কাছে মাতৃভাষার মাধ্যমে নতুন কিছু শেখা সবচেয়ে সহজ। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর এমত চিন্তা অবশ্যই আমাদের বিশ্ব সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ভাবনার স্তরের সঙ্গে একই আসনে বসিয়ে দেয়।

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু তথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। বিভিন্ন অবসরে এজন্য তাঁরা আন্দোলন করেছেন, বক্তৃতা করেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন এবং যথাস্থানে আবেদন-নিবেদন ও করেছেন। বিজ্ঞানী বোস নিজে মাতৃভাষায় পড়িয়ে প্রমাণ করেছেন যে, এ ভাষায় পদার্থ বিজ্ঞানের জটিল বিষয়ও শিক্ষাদান সম্ভব। আমাদের এ ভাষাতেই সাধনা করে বিশ্বকবি খেতাবের অধিকারী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

৩.৭ শিক্ষার মাধ্যম রূপে মাতৃভাষা শিক্ষা ও মাতৃভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা

মাতৃভাষায় যে শিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম তা আজ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শিক্ষাবিদরা এককথায় মেনে নিয়েছেন আমাদের দেশেও বহু প্রচেষ্টার পর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা বাহন হিসাবে চালু হলে উচ্চশিক্ষা স্তরে আজও পুরোপুরি চালু করা সম্ভব হয়নি।

ইংরাজী শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর ভারতবর্ষের স্কুল-কলেজগুলিতে শিক্ষাদানের মাধ্যম কি ভাষা হবে সে প্রসঙ্গে বহুবিতর্কের সৃষ্টি হয়। একদিক প্রাচ্যপন্থীরা সংস্কৃত ও আরবী ফরাসীকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে পাশ্চাত্যপন্থীরা শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরাজী ভাষাকে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তবে উভয়পন্থীর একমত ছিলেন যে, তখনও দেশীয় ভাষাগুলি শিক্ষার বাহন হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। ১৯৩৭ সালের আগে এদেশের বেশিরভাগ রাজ্যে শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরাজী ভাষা বহুপ্রচেষ্টার পর রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নেতৃত্বে ইংরেজ শাসনকালে মাধ্যমিক পর্যন্ত মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়। তবে এখনও পর্যন্ত উচ্চশিক্ষার স্তরে পুরোপুরি মাতৃভাষা দখল নিতে পারেনি, বরং সেখানে ইংরাজীই অনেকটা স্থান জুড়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা কথা বলতে গিয়ে মাতৃভাষাকে মাতৃদুগ্ধের সাথে তুলনা করেছেন। শিক্ষার্থীরা মাতৃভাষা মাধ্যমে তাদের বক্তব্যকে সহজে প্রকাশ করতে পারে। তেমনি কোন বিষয় সম্পর্কে ভাবগ্রহণ করতে হলে মাতৃভাষা সবচেয়ে উপজীব্য। কিন্তু বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষণীয় বিষয়টিকে ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারে না, প্রকাশ করা তো দূরের কথা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— 'ইংরাজী আমাদের পক্ষে কাজের ভাষা, কিন্তু ভাবের ভাষা নহে। বাঙালী কখনই ইংরাজী ভাষার সহিত তেমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ভাবে পরিচিত হইতে পারে না যাহাতে সাহিত্যের স্বাধীন ভাবোচ্ছ্বাস তাহার মধ্যে সহজে প্রকাশ করিতে তথাপি বাঙালির ভাব ইংরেজদের ভাষায় তেমন জীবন্তরূপে প্রকাশিত হয় না।' তাই মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করলে আমরা কতকগুলি সুফল পাব—

(১) জীবনের ভাষা :

জন্ম থেকে মাতৃভাষার সাথে মানুষের নাড়ির যোগ থাকে, থাকে হৃদয়ের টান। শিশু যখন থেকে কথা বলতে শেখে তখন থেকেই সে সাধারণত মাতৃভাষার মাধ্যমে ভাবের আদান প্রদান করে। তাই মাতৃভাষা শিশুর হৃদয়ের ভাষা, অন্তরের ভাষা। তাই স্বাভাবিকভাবেই মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করলে শিক্ষার্থীদের জীবন তথা সার্বিক বিকাশ সম্ভব হয়ে ওঠে। অন্য দিকে বিদেশী ভাষায় শিক্ষা দিলে শিশু ঠিকঠাক ভাবগ্রহণই করতে পারে না। জীবন বিকাশ তো দূরের কথা। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তা অফিস কাছারিতে কাজে লাগলেও আমাদের অন্তরের ভাষা হতে পারে না।

(২) চিন্তাশক্তি ও কল্পনা শক্তির বিকাশে সহায়ক :

একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে চিন্তা ও কল্পনার সর্বোৎকৃষ্ট চর্চা করা যায়। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করলে শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও কল্পনার সঠিক বিকাশ ঘটে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ''চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে দুইটি অত্যাবশ্যক শক্তি, তাহাতে সন্দেহ নেই। অর্থাৎ, যদি মানুষের মতো মানুষ হইতে হয় তবে ঐ দুটি পদার্থ জীবন হইতে বাদ দিলে চলে না।''

(৩) বলা ও লেখার উৎকৃষ্ট মাধ্যম

মাতৃভাষার মাধ্যমে কোনো বিষয় পড়ে ও শুনে যেমন খুব তাড়াতাড়ি বোঝা যায় তেমনি মাতৃভাষার দ্বারা কোন বিষয়বস্তুকে বলা ও লেখার মাধ্যমে খুব সহজে প্রকাশ করা যায়।

(৪) সময় ও পরিশ্রম কম হয় :

বিদেশী ভাষায় পঠন-পাঠন করলে শিক্ষার্থীদের কোন বিষয় আয়ত্ত করতে অনেক সময় লাগে। অন্যদিকে মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম হলে খুব কম সময়েই শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে পারে। কেননা মাতৃভাষার সাথে তাদের ছোটবেলা থেকে নাড়ি টান। মাতৃভাষার তুলনায় বিদেশী ভাষায় শিক্ষা লাভ করতে হলে শিক্ষার্থীদের পরিশ্রম বেশী করতে হয়।

(৫) মানসিক পুষ্টি ও চিত্তের প্রসার ঘটে :

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি ভাবের আদান প্রদান করতে পারে। শিক্ষার্থীদের মানসিক পুষ্টি ও চিত্তের প্রসারের জন্য প্রয়োজন তাদের আত্মপ্রকাশের চাহিদার পরিতৃপ্তি এবং অপরের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ। মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম হলে শিক্ষার্থীদের চিন্তা, অনুভূতি ও কর্মের মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপিত হয় বলে শিক্ষার্থীদের চরিত্রের উন্নতি ঘটে।

(৬) সাহিত্য রসাস্বাদনে ক্ষমতা উন্নতি ঘটে :

মাতৃভাষার মাধ্যমে পাঠদান খুব সহজতর। তাই খুব কম সময় কোন বিষয় খুব সহজে অধিগত করা সম্ভব হয়। যেহেতু খুব কম সময় অনেক বিষয় পড়া যায় তাই নিত্য নতুন বিষয় জানার আগ্রহ দেখা যায়, তাড়াতাড়ি বিষয় বা সাহিত্যে রস অনুভব করা যায় এবং দিনে দিনে রসাস্বাদন ক্ষমতা ও বৃদ্ধি পায়।

(৭) জাতীয় সংস্কৃতির ও ঐতিহ্যের প্রতি আস্থা :

মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি পাঠ করে ছাত্রদের মধ্যে জীবন সম্পর্কে সঠিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে এবং সাহিত্যিকদের সঙ্গে পাঠকদের আত্মার যোগাযোগ ঘটে। মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে জীবন সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি জাগিয়ে তোলে এবং জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলে, অন্য ভাষায় তা সম্ভব হয় না।

(৮) আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করে

শিক্ষার্থীরা যখন কোন বিষয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে পাঠ করে তখন খুব সহজে বুঝতে পারে। ফলে তাদের মন তৃপ্ত হয়। তারা আনন্দ লাভ করে, স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে; অন্য ভাষা মাধ্যম হলে তারা ততটা আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে পারে না।

(৯) ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও আত্মপ্রকাশের উৎকৃষ্ট মাধ্যম :

মাতৃভাষায় পঠন-পাঠনের মাধ্যমে খুব দ্রুত শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। মাতৃভাষা আত্মপ্রকাশের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মাধ্যমও বটে।

(১০) মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিলে শিক্ষার্থীরা নানা রকম সৃজনশীল কর্মে আত্মনিয়োগ করতে পারে।

শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনই হচ্ছে আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য। উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় মাতৃভাষাকে যদি বিদ্যালয়ের সবস্তরে শিক্ষার মাধ্যম করা যায় তবেই তার লক্ষ্য পূরণের পথ সুগম হয়ে উঠবে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থায় মাতৃভাষাকে গ্রহণ করলেও উচ্চস্তরে মাতৃভাষাকে পুরোপুরি গ্রহণ করানো যায়নি। কয়েকটি বিশেষ ভাষা (হিন্দি, বাংলা, আরবী, ইংরাজী)-তেই কেবল নিজের নিজের মাধ্যমে চালু আছে। আর বাকি সমস্ত বিষয়ের মাধ্যম ইংরাজি। কেউ কেউ আবার যুক্তি দেখান, অন্যান্য বিষয়গুলিতে বাংলায় লেখা ভালো বই নেই। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতে ''তুমি বাংলা ভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিতে চাও কিন্তু বাংলা ভাষায় উচ্চদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই? নাই সে কথা মানি, কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কি উপায়ে?'' তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেছেন ''বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয় তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা।'' তাই মাতৃভাষাকে শিক্ষার সর্বোস্তরে মাধ্যম করার জন্য প্রথমেই সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে— উন্নতমানের গ্রন্থ রচনার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও অর্থ সাহায্য করতে হবে এবং উপযুক্ত ব্যক্তিদের বই লিখতে উৎসাহিত করতে হবে। বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও যদি উপযুক্ত উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে আসেন তবে তা সার্থক হয়ে উঠবে। তা না হলে কোনোদিনও তা সম্ভব হবে না। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভাষায়— ''আসল কথা হল ভবিষ্যতে যখন আমাদের মাতৃভাষার উন্নতি হবে তখন আমরা তার মাধ্যমে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করবো— এই মনোভাব নিয়ে যদি আমরা বসে থাকি তাহলে কোনদিনই আমাদের মাতৃভাষার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটবে না।'' সুতরাং মাতৃভাষাকে শিক্ষার সর্বোস্তরে মাধ্যম করলে যদি শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন উন্নতির পথ প্রশস্ত হয় তাহলে আমাদের সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে তা সার্থক করে তোলার জন্য।

৩.৮ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য আলোচনা করতে যাওয়ার আগে কবি শামসুর রহমানের কয়েকটি পঙক্তি স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে—

''তোমাকে উপড়ে নিলে, বলো তবে কি থাকে আমার?

উনিশ শো বাহান্নের দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি

বুকে নিয়ে আছো সগৌরবে মহীয়সী।''

যাই হোক, মাতৃভাষাই হল মাতৃদুগ্ধ। জন্মের পর থেকে এই ভাষা শুনতে শুনতে বলতে বলতে শিশু পা বাড়ায় পুর্ণতার পথে। যে ভাষা শিশুর অন্তঃকরণে ভাবের মূর্চ্ছনা জাগায়, যে ভাষা শুনতে শুনতে সে সুখ নিদ্রায় মায়ের কোলে আচ্ছন্ন হয়, সে ভাষা মানুষের চিরন্তন সম্পদ। তার নাম মাতৃভাষা। প্রাণের আশা পূরণের, আত্মতৃপ্তির মাধ্যমই হল মাতৃভাষা।

১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা শহরে বহু সংগ্রাম রক্তপাতের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার মুক্তি ঘটে। তাই দেশকালের সীমা অতিক্রম করে সমস্ত বাঙালির কাছে ২১ শে ফেব্রুয়ারী ''ভাষা মুক্তির'' দিন হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট হিসাবে বলা যায় ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ দু'টুকরো হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। মুসলিম অধ্যুষিত পশ্চিম ও উত্তর ভারতের কিছু স্থান ভারতবর্ষ থেকে কেটে নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে পাঞ্জাবকেও টুকরো করা হয় এবং পূর্ববঙ্গকে পূর্বপাকিস্তান নামে পাকিস্তানের অধীনস্থ প্রদেশ হিসেবে গণ্য করা হয়। পাকিস্তানের ভাষা উর্দু। তাই পূর্ব পাকিস্তানের উর্দু ভাষা জাতীয় সরকারি ভাষা হিসেবে গণ্য হতে থাকল। কিন্তু বাঙালি মুসলমানেরা মাতৃভাষা বাংলাকে পদদলিত করে উর্দুভাষাকে মেনে নিতে রাজি হল না। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী তা মেনে নিলেন না। তাঁরা বাঙালি মুসলমানের বাংলা ভাষার দাবীকে নস্যাৎ করে দিলেন। ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী সারা পূর্ব পাকিস্তানের ভাষানীতির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন নুরুল ইসলাম। ২১ ফেব্রুয়ারী ছাত্ররা প্রতিবাদ মিছিল বার করে। মন্ত্রীর হুকুমে সেই মিছিলে গুলি চালান হয়। বরকত, রফিক, সালাম, জব্বার, শাফিউর প্রভৃতি যুবকরা সেই গুলিতে প্রাণ হারান। তারপর শুরু হল তীব্র আন্দোলন। পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারীতেও ঢাকার রাজপথ শহিদের রক্তে রাঙা হয়ে গেল। জীবনের বিনিময়ে ভাষা মুক্তির এই ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণে রাখতে বাঙালিরা ২১ ফেব্রুয়ারীকে ভাষা শহিদ দিবস রূপে পালন করতে লাগল। রাষ্ট্রসংঘ ২০০০ সালে এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস রূপে ঘোষণা করেছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রাসঙ্গিকতা :

যেকোনো দেশে মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। রাজনৈতিক স্বাধীনতার মত ভাষা স্বাধীনতাও ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের একটি পথ। মানুষ তার মনের আবেগ, বাসনা প্রকাশ করে তার মাতৃভাষার মাধ্যমে। অন্য ভাষায় যা সম্ভব নয়। মাতৃভাষার মধ্যে দিয়েই প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটে, হৃদয়ের শত আবেগ প্রকাশিত হয় স্বাভাবিকভাবে, তাছাড়া মাতৃভাষা মানুষের একটি জন্মগত অধিকার। সেই অধিকারকে ছিনিয়ে নিতে বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা শহরে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল বর্তমান যুগেও তার প্রাসঙ্গিকতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বর্তমান বিশ্বে প্রাদেশিকতাবাদ গড়ে উঠেছে মূলত ভাষাকেই কেন্দ্র করে। ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়। যে ভাষা হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার খুলে দেয়, যে ভাষা উচ্চারিত হলে চরাচর রোদ ঝলমলে হয়ে ওঠে, সেই বাংলা ভাষা বাঙালির মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধেরই সমান। তার মুক্তি আসলে একটা জাতির প্রাণের মুক্তি।

বৈচিত্র্যময় বাংলা ভাষা : বাংলা ভাষার সৃষ্টি ও বিকাশের মূলে রয়েছে তার প্রাণপ্রাচুর্য ও তার প্রকৃতির অবারিত দাক্ষিণ্য। আর্যাবর্তের অন্যান্য ভাষার সঙ্গে তার নিবিড় যোগবন্ধন থাকা সত্ত্বেও তা তার স্বতন্ত্র প্রাণরসের সকল অভিব্যক্তিতে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ''আপনাতে আপনি বিকশিত''। সেই কারণে বাংলা ভাষা নিজেকে কখনও একই রূপের অন্ধ ঘেরাটোপে আবদ্ধ রাখেনি। এই বৃহত্তর বঙ্গ ভাষাভাষী অঞ্চলের এক এক খণ্ডে নিজেকে ভিন্নতর রূপে মেলে ধরেছে। এইসব পার্থক্যকে লক্ষ্য করে ভাষা তাত্ত্বিকগণ বাংলা ভাষাকে পাঁচটি উপভাষায় বিভক্ত করেছেন। যেমন— রাঢ়ী, ঝাড়খণ্ডী, বরেন্দ্রী, বঙ্গালি ও কামরূপী। এইসব এক একটি উপভাষার চেহারা এক এক রকম। শুধু তাই নয়, বাংলা ভাষার লিখিত ও কথ্য রূপও পৃথক। যদিও বর্তমানে কথ্য ভাষাতেই সাহিত্য রচনার প্রবণতা বেশি। তাই একই বাংলা ভাষার কত বিচিত্ররূপ। এই রূপভেদ বাংলা ভাষার প্রাণ সত্তার অন্যতম লক্ষণ।

বর্তমানে বাংলা ভাষার উপর আক্রমণ ও অবহেলা :

বর্তমানের এই উগ্র আধুনিক যুগে আমরা বাংলা ভাষার শুচিতা নিয়ে মোটেই ভাবিত নই। সেইজন্য ভাষার মধ্যে অবলীলা ক্রমে সাধুচলিত মিশিয়ে ফেলা হচ্ছে। 'নত্ব' 'ষত্ব' বিধি মেনে, 'ই'-কার, 'ঈ' কার, 'ন' 'ণ', শুদ্ধভাবে প্রয়োগ করে বানান লেখার বালাই নেই, সমাস-সন্ধি তো চুলোই যাক্ কোনো রকমে মানের ভাব বোঝাতে পারলেই হলো। এছাড়া ইদানীং বাংলা ভাষার মধ্যে ''কিচাইন'', ''হারগিস'', ''হেব্বি'' ইত্যাদি বহু দুষ্ট শব্দ ঢুকে পড়ে ভাষাটার মর্যাদা নিয়ে টানাটানি করছে। বাংলা ভাষার মধ্যে এইসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে সচেতন বাঙালি হিসেবে আমাদের সকলের সচেষ্ট থাকা উচিত।

তবে আমরা জানি, বাংলা ভাষার প্রাণশক্তি কত গভীর। যুগ যুগ ধরে বহু বিদেশী ভাষার আক্রমণ ও তথাকথিত ইঙ্গ-বঙ্গ ভাষানবীশদের হাত থেকে বাংলাভাষা নিজেকে রক্ষা করে এসেছে। যাই হোক, দীর্ঘ ৫০ বছর এই বাংলা ভাষা আন্দোলন অতিক্রম করে এসেও বাঙালির জীবন পঞ্জিকার একটি স্মরণীয় দিন করে নিয়েছে ২১ শে ফেব্রুয়ারী যা আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে। আসলে আমরা জানি, ভাষাবন্দি মানেই জীবন বন্দি। সেই জীবন মুক্তির আর এক নাম ২১শে ফেব্রুয়ারী। তাই বাঙালির জীবনে এই দিনটি নিয়ে আসে প্রাণের জোয়ার, উৎসবের আনন্দ।

৩.৯ মাতৃভাষা ও সাহিত্য অনুশীলনে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব :

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত জ্ঞান অর্জন তথা গণতান্ত্রিক শিক্ষা প্রক্রিয়াকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। আর সেই প্রক্রিয়ায় সর্বাঙ্গীণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গ্রন্থাগার। শিক্ষার সংস্থান হিসাবে গ্রন্থাগারের ভূমিকা নিম্নরূপ :—

১। ব্যক্তিগত জ্ঞান পিপাসাকে চরিতার্থ করে গ্রন্থাগার। বিদ্যালয়ের সীমাবদ্ধ পঠনপাঠন শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ জানার আগ্রহ পরিপূর্ণ হয় না তখন গ্রন্থাগার সমস্ত আকাঙ্ক্ষার নিরঞ্জন ঘটায়।

২। ব্যক্তিগত পাঠের মাধ্যমে গ্রন্থাগার ব্যবহার করে যেকোন ব্যক্তির মধ্যে আত্ম শিখনের প্রেরণা সঞ্চারিত হয়।

৩। ব্যক্তিজীবনে অবসর যাপনে শিক্ষা দান করে গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার আনন্দ দেয় ও সুঅভ্যাস গঠন করে।

৪। গ্রামাঞ্চলে ছোট আকারের গ্রন্থাগারগুলি অনেক সময় বক্তৃতা, আলোচনা ইত্যাদির আয়োজন করে শিক্ষার্থী তথা যে কোন ব্যক্তির বিকাশ সাধিত হয় করে।

৫। স্বল্প বা উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি যে কোন গ্রন্থাগার থেকে যেকোন রকম শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে।

৬। গ্রন্থাগার শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মশৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করে।

৭। যেকোন সমাজে বিদ্যালয়ে বহির্ভূত শিক্ষা সংস্থা হিসাবে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা :

ভাষা বহমান চলমান, ভাষা প্রতি মুহূর্তে তার গতি পরিবর্তন করে। এই পরিবর্তন ধারা থাকে ধারাবাহিক সাহিত্য চর্চায়। কোন বিশেষ ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে হলে গ্রন্থাগারে গিয়ে পঠন পাঠনের চর্চা অবশ্যই প্রয়োজন।

সাহিত্য পাঠ জ্ঞানের আদান প্রদানে সীমাবদ্ধ নয়। তথ্য কিংবা তত্ত্বে ভারাক্রান্ত করা সাহিত্যের কাজ নয়। সাহিত্যে ঘটে রসস্বাদন পাঠ এবং আবিস্কার। জানার থেকে নিজের ব্যক্তিত্ব কে সরিয়ে রাখার সাধনা বিজ্ঞানে,রবীন্দ্রনাথ অনুসরণে তাই বলা যায় এই আত্ম উপলব্ধি সম্ভব সাহিত্য সমুদ্রে অবগমন করে। সাহিত্য পাঠের অবগমন যত বাড়ে তত সাহিত্য শিক্ষার এই কাজে সঠিক অবলম্বন হতে পারে গ্রন্থগার।

গ্রন্থাগার কেবলমাত্র আদান প্রদান ক্ষেত্র হিসাবে সীমাবদ্ধ না থেকে আরো বিস্তৃত কাজ করে। বৌদ্ধিক সামাজিক কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে উল্লেখিত হয়। নিম্নলিখিত কাজগুলির মাধ্যমে গ্রন্থাগার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

১। পাঠচক্র গড়ে তোলার মাধ্যমে যে ভাব বিনিময় হয় তা সাহিত্য আগ্রহ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের বক্তৃতা, আলোচনা সভা, সাহিত্য বিভিন্ন কাজে শিক্ষার্থীরা সেখানে অংশগ্রহণ করে। প্রশ্ন উত্তর পর্বে যোগদান করলে ব্যক্ত করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

২। প্রদর্শনী, বইমেলা, কবিতা উৎসবের আয়োজন করা।

৩। সিনেমা, নাটক, পুতুল নাচ, গীতি আলেখ্য আয়োজন করা। এগুলিতে যোগদান করলে শিক্ষার্থীরা ভাষা সাহিত্যে শিক্ষায় উদ্দীপনা লাভ করে।

৪। নিচু শ্রেণীর জন্য গল্প খেলার আয়োজন করতে পারে যা নিঃসন্দেহে ভাষা শিক্ষার সহায়ক।

গ্রন্থাগার ব্যবহারের নীতি ও পদ্ধতি :

নিয়মিত গ্রন্থাগার ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের জীবনচর্চায় স্থায়ী পরিবর্তন আনা সম্ভব। ব্যবহারের নীতি—

১। গ্রন্থাগার ব্যবহারকালীন গ্রন্থাগার প্রবেশের পূর্বে নিজের নাম, তারিখ, ঠিকানা স্পষ্ট হস্তাক্ষরে সুন্দরভাবে সাক্ষরসহ লিপিবদ্ধ করা।

২। গ্রন্থাগারের নির্দিষ্ট নিয়মাবলী পালন করতে হবে যেমন নির্দেশ, অন্য কোন পাঠকের অধিকার যাতে ব্যাহত না হয় তার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।

৩। গ্রন্থাগারের সদস্য ব্যতীত অন্য কেউ গ্রন্থাগারের অনুমতি নিয়ে পত্রিকা, বই ও অন্য সম্পদ ব্যবহার করবে।

৪। কোন বিশেষ বই, পত্রিকা যেখান থেকে নেওয়া হবে সেখানে রাখতে হবে। অন্যত্র রাখা বাঞ্ছনীয় নয়।

৫। চলমান দূরাভাষ বন্ধ রাখতে হবে, খাওয়া, ঘুমানো, ধূমপান করা, জোরে কথা বলা নিষিদ্ধ।

৬। গ্রন্থাগারের অনুমতি ব্যতীত কোন জিনিস গ্রন্থাগারের বাইরে নিয়ে যাওয়া যাবে না। ছিঁড়ে দেওয়া, পেন, পেনসিলের দাগ দেওয়া যাবে না।

৭। গ্রন্থাগারের বই, পত্রিকা, জার্নাল সাবধানে ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে গ্রন্থাগারিকের অনুমতি নিয়ে ফটোকপি করা অথবা জেরক্স করে নেওয়া।

৮। গ্রন্থাগারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাহায্যে সঠিকভাবে ব্যবহার না করলে নির্দিষ্ট শাস্তি দেওয়া ও আইনের সাহায্য নেওয়া।

৯। দীর্ঘ ছুটি বা দীর্ঘদিন উপস্থিত না থাকলে গ্রন্থাগারের সম্পদ ফিরিয়ে দিতে হবে।

১০। সবশেষে গ্রন্থাগারিক প্রয়োজন বোধ করলে সদস্য পদ বাতিল করতে পারে।

৩.১০ বাংলা মাতৃভাষা শিক্ষায় গণমাধ্যমের ভূমিকা

গণমাধ্যম : গণমাধ্যম বা মিডিয়া লাতিন শব্দ থেকে উদ্ভব হয়েছে। কাজেই প্রথম থেকেই মিডিয়া শব্দটি বহুতবাচক। অর্থাৎ একাধিক মানুষের সঙ্গে সংযোগ সাধন এর উদ্দেশ্য। এককের সাথে বহু মানুষের বা বহু মানুষের সাথে আরো বহু মানুষের সংযোগ সৃষ্টিকারী মাধ্যম হল গণমাধ্যম।

বাংলা ভাষা শিক্ষায় গুরুত্ব :

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষায় গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সভ্যতার পথে ধাবমান সমাজ ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভাষা সদা পরিবর্তনশীল—গণমাধ্যমে প্রতিফলিত হয়; শ্রেণি কক্ষের ক্ষুদ্র পরিসরে যা অনুভব করা যায়। নিম্নলিখিত আলোচনার মাধ্যমে গণমাধ্যমগুলি কি ভূমিকা গ্রহণ করে তা আমরা জানব।

সংবাদপত্র : প্রত্যেক সংবাদ পত্রে সংবাদ পরিবেশনে নিজস্ব কৌশল আছে। তাতে এমনভাবে সংবাদ পরিবেশিত হয় যা বিশ্বাস যোগ্য হয়ে উঠে। সংবাদ পত্রের মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয়ে সচেতন হওয়া যায় এবং পরবর্তীকালে সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করতে পারে। সাহিত্য ও সংবাদপত্রের পাতা শূন্যস্থান পূরণের জন্য ছোট গল্পের সূচনা হয়েছিল। এতে প্রকাশিত পুস্তক সমালোচনা, বিশিষ্ট সাহিত্যের মধ্যে আলাপ চারিতায় সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা জন্মায়।

মাধ্যমিক শিক্ষায় সংবাদ পত্রের ভূমিকা :

১। ভাষা শিক্ষার জন্য নিয়মিত সংবাদ পাঠ করতে হবে।

২। ভাষা ও সাহিত্যে গৃহীত প্রকল্প গুলিতে সংবাদপত্রের পরিবেশিত খবর ব্যবহারে গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে।

৩। সংবাদ পত্রে কিশোর কিশোরীদের জন্য নির্দিষ্ট পাতায় শিক্ষার্থীদের লেখা পাঠানোয় উৎসাহিত করতে হবে।

৪। নতুন প্রাপ্ত শব্দ ও ঘটনা নোটবইয়ে লিখে রাখতে নির্দেশ দেওয়া হবে।

বেতার : বেতার মৌখিক শিখনে সহায়তা করে। শিক্ষার্থীদের ভাষাগত শ্রবণ ধর্মী দক্ষতা বৃদ্ধি পায় বেতারের মাধ্যমে। কোন বিষয় কতখানি সাবলীলভাবে হৃদয়গ্রাহী করে ভাষায় উপস্থাপিত করা যায় সেদিকে নজর দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের ভাষাগত উপস্থাপনে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে বেতারের মাধ্যমে। বেতারের মাধ্যমে কোন গুরু গম্ভীর বিষয়ে সহজ উপস্থাপন শেখাতে পারে। বেতারে অনুষ্ঠিত সাহিত্য অনুষ্ঠান শিক্ষার্থীদের বোধ বুদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে।

মাধ্যমিক স্তরে ভূমিকা :

আমাদের দেশে বেতার প্রচার ব্যবস্থা একটি মাত্র কেন্দ্রীয় সংস্থার দ্বারা প্রচারিত। বিদ্যালয়ে থাকাকালীন বেতারে প্রচারিত কর্মসূচী গ্রহণ করতে অসুবিধা তাই শিক্ষার্থীদের বাড়িতে অনুষ্ঠান শুনতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

১। শিক্ষার্থীরা যাতে সুচারুভাবে ও সাবলীল ভাষায় তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে সে জন্য প্রতিদিন প্রার্থনা সভায় বেতারের মতো দৈনিক সংবাদ পাঠ করে বলতে হবে।

২। খেলার মাঠে সমাজ সেবামূলক কাজে যে ধারা বিবরণী দেওয়া হয় তা শুনতে উৎসাহিত করতে হবে।

টেলিভিশন : সবথেকে আকর্ষণীয় ও শক্তিশালী মাধ্যম হল টেলিভিশন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষায় গুরুত্ব রয়েছে। টেলিভিশনে প্রচারিত সমাজের বিভিন্ন স্তরে মানুষের ভাষা। মান্য ভাষা ও তাদের সঙ্গে ঘাত প্রতিঘাত ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। শিক্ষার্থীরা টেলিভিশনে দর্শনে ও শ্রবণে পটু হয়ে ওঠে। বিতর্ক সভার মাধ্যমে আমরা চিন্তা করতে শিখি জগতকে অনুধাবন করতে পারি। তাকে অর্থময় ও অনুভূতিময় করে তুলি।

মাধ্যমিক স্তরে টেলিভিশনের ভূমিকা :

১। শিক্ষার্থী টেলিভিশনে পরিচালিত নতুন শব্দ প্রবাদ স্মরণে রেখে নোট বইয়ে লিখে রাখবে।

২। পরিবেশিত খবরগুলি তাদের মননে চিন্তনে সাহায্য করবে। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রকল্পে সাহায্য করবে।

৩। সঙ্গীত, চিত্র, নাটক ইত্যাদি সাহিত্য অনুশীলন মূলক কার্যাবলী টেলিভিশন থেকে শিখে করতে আগ্রহী হবে।

৪। কবি ও লেখকদের সাথে তারা পরিচিত হবে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে আলাপ আলোচনা ও তাদের বক্তব্য সাহিত্য সৃষ্টিতে অনুপ্রেণিত করবে।

ইন্টারনেট : ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে যেকোন তথ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছে যায়। ইন্টারনেটের সুবিধা হল সব কিছু একসাথে পাওয়া যায়। অনেক সময় অভিধানের কাজও করে এই মাধ্যম। সুতরাং ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষায় বর্তমান পৃথিবীতে ইন্টারনেট হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জোরালো মাধ্যম।

মাধ্যমিক স্তরে ভূমিকা :

১) শিক্ষার্থীদের শ্রেণীতে পাঠ্য বিষয় ও সাহিত্যিকদের সম্পর্কে জানার জন্য গ্রন্থগারের পাশাপাশি ইন্টারনেট ব্যবহার শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করে।

২) শিক্ষার্থীদের ভাষা গবেষণাগারে ইন্টারনেট ব্যবহারে আগ্রহী করতে হবে। ভাষা উন্নয়নে সাহায্য করে এবং উচ্চারণ শুদ্ধতায় সাহায্য করে।

৩) সহজ-সরল উপস্থাপনায় যেকোনো বিষয়ে শিক্ষার্থীরা মতামত পোষণ করতে পারছে কিনা তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

চলচ্চিত্র :

ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষায় চলচ্চিত্র হল সহযোগী শিল্প মাধ্যম। বিভূতিভূষণের পথে পাঁচালীর উপন্যাসে বর্ণিত অপুর পাঠশালার বর্ণনা অংশের চেয়ে সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী চলচ্চিত্রের বিষয় অনেক বেশি মূর্ত হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা বেশি মনোযোগী হয়।

মাধ্যমিক স্তরে ভূমিকা :

১) ভাষা গবেষণাগারে চলচ্চিত্র ব্যবহারে শ্রবণের অভ্যাস এবং উচ্চারণ শুদ্ধ করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে।

২) বিভিন্ন সাহিত্যিকদের জীবনী অবলম্বনে নির্মিত স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রগুলি দেখানো যায়।

৩) বিভিন্ন ভাষায় চলচ্চিত্র প্রদর্শন করে ভাষা ও সাহিত্যে তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে।

৩.১১ সংক্ষিপ্তকরণ (Summing Up)

- মায়ের মুখ নিঃসৃত ভাষা নয়, শিশু জন্ম গ্রহণের পরে কোন একটি ভাষা পরিবেশে বসবাস করে সামাজিক ও জৈবিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য যখন সেই ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে, সেটাই তার মাতৃভাষা।
- মাতৃভাষা ঐতিহ্য-কৃষ্টি, আত্মবিকাশ-আত্মচর্চা, চাহিদার পরিতৃপ্তি, ব্যক্তিত্ব-চরিত্রগঠন, সুনাগরিক শিক্ষা, জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা, শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ, অন্যান্য ভাষা জানার আগ্রহ বৃদ্ধি, সৃজনশীলতার বিকাশে সহায়ক-তথা সর্বাঙ্গীন বিকাশে সহায়ক।
- মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার প্রাচীন ভারতীয় পর্বের প্রাচ্য শাখা মধ্যভারতীয় পর্বের প্রাচ্য-মগধী-অপভ্রংশ অবহট্‌ঠ শাখার পূর্বী/(নব্য ভারতীয় আর্য) রূপটির বঙ্গ-অসমিয়া শাখা থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি।
- বর্ণ উচ্চারণ, শব্দ ও বাক্যগঠন, শব্দের অর্থপোলব্ধি, সাহিত্য চর্চা-সৃজনশীলতা বিকাশ, সন্ধি-সমাস-প্রত্যয় ইত্যাদি ব্যাকরণ জ্ঞান বৃদ্ধিতে মাতৃভাষা শিক্ষা সহায়তা করে।
- বিজ্ঞানী বোসের 'সহজ থেকে কঠিনের' নীতি ও রবীন্দ্রনাথ সর্বাভাগে সাহিত্য চর্চা শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করে।
- আপনাকে আপনি বিকশিত করতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম।
- ব্যক্তির জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করতে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।
- শিক্ষার সর্বাঙ্গীন বিকাশকে গণমাধ্যম অনেকটাই ত্বরান্বিত করে।

৩.১২ অনুশীলনী

(ক) মাতৃভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি লিখুন। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্বের কারণগুলো যুক্তিসহ ব্যক্ত করুন

(খ) মাতৃভাষা কাকে বলে? মাতৃভাষা উপযোগিতা নির্ণয় করুন। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার বাহন হিসাবে এবং পরীক্ষা বাহন হিসাবে মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

(গ) 'মাতৃভাষায় মাতৃদুগ্ধ'—উক্তিটির বক্তার নাম উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করুন

(ঘ) মাতৃভাষা কাকে বলে?

(ঙ) মাতৃভাষা শিক্ষার দুটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করুন।

৩.১৩ গ্রন্থপঞ্জি :

(১) গুপ্ত, অধ্যাপক অশোক, 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতির রূপরেখা' সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, কলকাতা, ২০১৩।

(২) চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক, 'মাতৃভাষা শিক্ষণ-বিষয় ও পদ্ধতি', রীতা পাবলিকেশন, আগস্ট ২০১৪-২০১৫।

(৩) মিশ্র, সুবিমল, 'বাংলা শিক্ষণ পদ্ধতি', রীতা পাবলিকেশন, সেপ্টেম্বর, ২০১০।

(৪) শ', ডঃ রামেশ্বর, 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' ২৪ নভেম্বর ১৯৯৬।

বিভাগ - খ

একক-৪ : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার পদ্ধতিসমূহ

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ উদ্দেশ্য

৪.৩ প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক পদ্ধতি ও নীতিসমূহ, পাঠদান সরস ও সজীব করে তোলার পদ্ধতি

৪.৪ কথন : বাকযন্ত্র ও ধ্বনিতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আদর্শ ধারণাসমূহ উপযোগিতা

৪.৫ পঠন : প্রকারভেদ, আদর্শ পঠনের বৈশিষ্ট্য

৪.৬ কবিতা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, পদ্ধতি

৪.৭ গদ্য শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, পদ্ধতি

৪.৮ ব্যাকরণ : পদ্ধতি, লক্ষ্য, গুরুত্ব, শিক্ষকের ভূমিকা

৪.৯ রচনা : উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, পদ্ধতি

৪.১০ অনুবাদ : উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, পদ্ধতি

৪.১১ দ্রুত পঠন : উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, পদ্ধতি

৪.১২ বানান : সমস্যা ও কারণসমূহ, প্রতিকারের উপায়

৪.১৩ সাহিত্যানুশীলনমূলক কার্যাবলী : প্রকারভেদ ও প্রয়োজনীয়তা

৪.১৪ শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ : ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা

৪.১৫ ভাষা-পরীক্ষাগার বা গবেষণাগারের ধারণা ও পরিকল্পনা

৪.১৬ সংক্ষিপ্তকরণ (Summing Up)

৪.১৭ অনুশীলনী

৪.১৮ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ প্রস্তাবনা

বাঙালীর অতি অহংকারের জায়গাটি হল তার ভাষা ও সাহিত্য। এই ভাষাতেই বিদ্যাসাগর-রামমোহন কথা বলতেন। গূঢ় তত্ত্বের আলোচনা করতেন। এই ভাষাতেই মাইকেল মুক্তি খুঁজে পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি খেতাবের অধিকারী হয়েছেন এই ভাষায় সাহিত্যচর্চার ফলে। বঙ্কিম, বিভূতি, শরৎ দ্বারা সমৃদ্ধ এই ভাষার সাহিত্য সম্ভার আজও বিশ্ববন্দিত। কিন্তু এই বর্তমান কাল পর্যন্তও আমরা গর্বের সেইসব সাহিত্য সম্ভারের অন্দর মহলে অবাধে বিচরণ করতে অপারগ। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার বিবিধ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে যাতে শিক্ষার্থীদের কাছে আমাদের ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে যথার্থ মুল্যায়ন করানো যায়। ফলত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার পদ্ধতি সমূহের আলোচনা আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

৪.২ উদ্দেশ্য :

আলোচ্য পাঠ করার পর —

- বিভিন্ন ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কিভাবে মটিভেট করা যায় বা শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে কিভাবে সহজ সরল করে উপস্থাপন করা যায় তা জানতে পারবেন।
- ভালো কথা বলার জন্য বাকযন্ত্রে বিভিন্ন যন্ত্রের অবদান সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- আদর্শ পঠনের বৈশিষ্ট্য কী কী? শিক্ষাক্ষেত্রে কোন ধরনের পঠন কোন স্তরে কতটা উপকারি তা জানতে পারবেন, অপকারিতা সম্পর্কেও অবগত হবেন।
- কবিতা পাঠদানের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কবিতা পাঠদানের গুরুত্বগুলি জানবেন।
- ব্যাকরণ শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা কেমন হবে তা জানবেন। ব্যাকরণ শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতি ও ব্যাকরণ শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে জানবেন।
- ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষায় অনুবাদ ও গদ্য শিক্ষাদানের গুরুত্ব ও পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বর্তমান শিক্ষায় দ্রুত পঠনের উদ্দেশ্য কী এবং তার উপযোগিতা কতটা তা জানবেন।
- বাংলা বানান সমস্যার কারণ কী কী এবং কীভাবে তার প্রতিকার করা যায় সে সম্পর্কে অবগত হবেন।
- শিক্ষার সর্বাঙ্গীন বিকাশে সাহিত্যানুশীলমূলক কার্যাবলীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- শিক্ষণ সহায়ক বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত হবেন।

৪.৩ প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক পদ্ধতি ও নীতিসমূহ। পাঠদান সরস ও সজীব করে তোলার পদ্ধতি :

আধুনিক শিক্ষার সমস্ত পদ্ধতিগুলি মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার পদ্ধতিগুলিও মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মাতৃভাষা শিক্ষার মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বিভিন্ন বয়সের ছাত্রদের বৌদ্ধিক ও মানসিক বিকাশ ও শিক্ষার অগ্রগতি অনুযায়ী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক ও মানসিক বিকাশের ক্রম পরিণতির বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী মাতৃভাষা শিক্ষার পদ্ধতিগুলি হবে ক্রমশ সহজ থেকে জটিল। প্রথমে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের নীতিগুলি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব —

ক. ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান :

মনোবিজ্ঞানীরা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদানের দানের উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়েই বাইরের জগতের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি মানুষের মনে প্রবেশ করে। জন্মাবার পরেই একটি শিশু ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই মা কে চিনতে পারে। তখনও তার অন্য ইন্দ্রিয়গুলির বিকাশ হয় না। আর কিছু দিন পরে সে ধীরে ধীরে দেখতে ও শুনতে শেখে। দর্শন এবং শ্রবণ ইন্দ্রিয় শিশুদের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইন্দ্রিয়। তাই কোন বিষয় পড়ানোর সময় বিষয়টি শিক্ষার্থীরদের সামনে এমনভাবে তুলে ধরতে হবে যাতে সেটি সরাসরি দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে পৌঁছায়। এক্ষেত্রে শিক্ষক চার্ট, মডেল, ফিল্ম প্রজেক্টার, টেলিভিশন, আবৃত্তি, গান প্রভৃতির সাহায্য নিতে পারে।

খ. খেলার মাধ্যমে শিক্ষাদান :

একেবারে ছোট্ট শিশুদের বা ৬ বছরের আগের বয়সী শিশুদের জোর করে পড়ানো যায় না। এই বয়সের শিশুদের মাতৃভাষা শেখানোর সময় বিভিন্ন খেলার সামগ্রী নিয়ে নাড়াচাড়া করার মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে তাদের খেলার সঙ্গী হয়ে, খেলনাগুলি কি, সেগুলি দিয়ে কি করতে হয়, সেগুলির বানান কি, ইত্যাদি প্রশ্নকরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

গ. কর্ম ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান :

৬-১২ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষা শেখানোর সময় অনুসন্ধান ও গঠনমূলক কাজে তাদের নিয়োজিত করতে হবে। মাতৃভাষার অন্তর্গত বিভিন্ন শব্দ ও ছোট ছোট বাক্য তারা ঠিকভাবে আয়ত্ত করতে পারছে কিনা তা দেখতে হবে। এই স্তরে শিশুদের মাতৃভাষা ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য, বিভিন্ন রকম খেলাধূলা, কবিতা ও ছড়া আবৃত্তি, কোন অভিজ্ঞতা নিয়ে দুচার লাইন লিখতে বলা, ছোট ছোট অভিনয় ইত্যাদি করিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

ঘ. সহজ থেকে জটিল, মূর্ত থেকে বিমূর্ত, জানা থেকে অজানা :

মাতৃভাষা শিক্ষাদানের সময় শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে সহজ ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য কতকগুলো মূলনীতি অনুসরণ করা যেতে পারে। মাতৃভাষা শিক্ষাদানের সময় শিক্ষক যদি ঐ নীতিগুলি ঠিক সময়মত ব্যবহার করেন তাহলে খুব ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে। সেগুলি হল সহজ থেকে জটিল, সাধারণ থেকে বিশেষ, মূর্ত থেকে বিমূর্ত, জানা থেকে অজানা, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে যুক্তি নির্ভর জ্ঞানে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

ঙ. শিখন সংক্রান্ত বিভিন্ন শিক্ষানীতির সাহায্যে শিক্ষাদান :

শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান সম্পর্কে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন নীতির কথা বলেছেন। যেমন থর্নডাইকের 'চেষ্টা ও ভ্রান্তির' তত্ত্ব। মনোবিদ থর্নডাইকের মতে— চেষ্টা ও ভুলের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা সবকিছু শেখে। তাঁর শিখনের প্রধান তিনটি সূত্র হল— প্রস্তুতি, অনুশীলন ও ফলভোগের সূত্র। এই তত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা কোন কিছু শিখতে গেলে অবশ্যই মানসিক প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। মানসিক প্রস্তুতি না থাকলে সে কাজে আগ্রহী হবে না। আবার অনুশীলনে সূত্রের মূল কথা হল কোন বিষয় বারবার অনুশীলন করলে মনে থাকে। আর অনুশীলন না করলে শিক্ষার্থীরা আস্তে আস্তে তা ভুলে যায়। তার ফলভোগের সূত্রের মূল কথা হল কোন কাজের দ্বারা শিক্ষার্থীর মনে সন্তোষ সৃষ্টি হলে সেই কাজের ফল স্থায়ী হয়। আর বিরক্তির সৃষ্টি হলে সেই ফল ক্ষণস্থায়ী হয়। এছাড়া থর্নডাইকের শিখনের অপ্রধান সূত্রগুলিও যেমন— বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার নীতি, আংশিক কর্মের নীতি, মনোভাবের নীতি, সাদৃশ্যের নীতি ইত্যাদিও মাতৃভাষা শিখনে বিশেষ কাজে লাগতে পারে।

গেস্টাল্টবাদীদের মতে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যেই শিক্ষার্থীরা শিক্ষাগ্রহণ করে। অবশ্য আধুনিক শিক্ষায় এই মতবাদ ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। গেস্টাল্টবাদীদের মতে কোন সমস্যার সমাধান করতে হলে ঐ সমস্যাটির সমগ্র অংশটি আগে অনুভব করতে হবে। সমগ্র অংশটির পরিপ্রেক্ষিত ক্ষুদ্র অংশের সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করতে হবে। অপরদিকে ক্ষুদ্র অংশের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহৎ সমস্যার করা যায় না। আবার আচরণবাদীরা বলেছেন,

অনুবর্তনই হচ্ছে শিশুর শিক্ষালাভের একমাত্র উপায়। অবশ্য মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কোন একটি শিশু কোন খেলনার রিমোটের বোতাম টিপে খেলনাটি চালু করে এবং বার বার সে ঐ বোতামটিই টিপতে থাকে ও খেলনাটি চালু করে। এইভাবে বার বার অনুবর্তনের মাধ্যমে সে বুঝে যায় রিমোটের ঐ বোতামটির সাথে খেলনাটির চালু হওয়ার কোনো সম্পর্ক আছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটিও বেশ কার্যকরী।

- **মাতৃভাষা শিক্ষাদানের কয়েকটি পদ্ধতি :**

মাতৃভাষা শিক্ষাদানের আধুনিক পদ্ধতিগুলি মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। নিম্নে কতকগুলি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হল। যেমন—

১. কথোপকথন পদ্ধতি :

ছোট বাচ্চারা একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় বিদ্যালয়ে যেতে চায় না। তারা গৃহ পরিবেশে দীর্ঘদিন থাকতে অভ্যস্থ এবং সেখানকার পরিবেশ ও মানুষদের সাথে তারা থাকতে ভালোবাসে। সে বিদ্যালয়ে যাওয়ার নাম করলে যেতে চায় না, সেখানে নিয়ে গেলে থাকতেও চায় না। তারপর বিদ্যালয়ে যেতে যেতে সেই জীবনে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের শিশুদের ভালোবাসতে হবে এবং তাদের সাথে মিশে যেতে হবে। তাদের সাথে বিভিন্ন খেলনা সামগ্রী ও তার পছন্দের জিনিসপত্র নিয়ে টুকিটাকি কথাবার্তা বলতে হবে। তার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং তাকে তার পছন্দের প্রশ্ন করতে হবে। এইভাবে ছোট্ট ছোট্ট কথাবার্তার মধ্য দিয়ে তাকে আপন করে নিয়ে আস্তে আস্তে শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যে তাকে প্রবেশ করানো যায়।

২. বর্ণ-ক্রম পদ্ধতি :

তারপর তাকে রঙিন রঙিন চার্ট কিংবা রঙিন বইয়ের অক্ষর বা বর্ণ চেনানোর মধ্য দিয়ে পাঠে প্রবেশ করানো যায়।

৩. শব্দ-ক্রম পদ্ধতি :

এরপর শিক্ষার্থীদের চেনা পরিচিত খেলনা বা সামগ্রী, পাখি, ফুল, ফল ইত্যাদি ছোট শব্দ ও তার প্রতীক চেনানোর মধ্য দিয়ে পাঠ শুরু করানো যেতে পারে।

৪. দেখা ও বলা পদ্ধতি :

দেখা ও বলা পদ্ধতির মধ্য দিয়েও শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়া যায়। এর মাধ্যমে কোন খেলনা, কোন বস্তু, জীব-জন্তু, গাছপালার ছবি দেখিয়ে তাদের নাম জিজ্ঞাসা করে উত্তর নিতে হবে। এইভাবে বারবার উচ্চারণ করার ফলে শব্দটি ও প্রতীক সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা জন্মাবে।

৫. বাক্যক্রম পদ্ধতি :

এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চেনা পরিচিত শব্দ দিয়ে তৈরী ছোট ছোট বাক্য শিক্ষার্থীদের দেখাতে হবে এবং পাঠ করে শোনাতে হবে। প্রয়োজনে বাক্যটির সমরূপ ছবি ব্ল্যাকবোর্ডে এঁকে দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের

দিয়ে বারবার ঐ বাক্যটি উচ্চারণ করাতে হবে এবং ছবি দেখাতে হবে। এইভাবে ছবি ও তার সমরূপ বাক্যটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা জন্মাবে।

৬. গল্প বলা পদ্ধতি :

শিশুরা গল্প শুনতে খুব ভালোবাসে। অনেক সময় শিশুদের মনোযোগী করতে বিভিন্ন শিক্ষামূলক সহজ সরল গল্প তাদের সামনে করা যেতে। অবশ্য মনে রাখতে হবে এই গল্প যেন কোনভাবেই শিক্ষার গণ্ডি পেরিয়ে না যায়। শুদ্ধ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে গল্প করতে হবে ও তার মধ্যে থাকবে প্রতীকধর্মীতা। মাতৃভাষা শিক্ষায় এই পদ্ধতি বেশ উপকারী।

৭. আবৃত্তি, ছড়া, নাটক :

কবিতা আবৃত্তি বা ছড়া পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের সঠিক উচ্চারণ, ছেদ-যতি চিহ্ন সঠিক ব্যবহার ইত্যাদি শেখানো যেতে পারে।

৮. আলোচনা পদ্ধতি :

শিক্ষার্থীদের আলোচনা পদ্ধতির দ্বারাও মাতৃভাষার পঠন-পাঠন করানো যেতে পারে। আলোচনা পদ্ধতি দু-ধরনের হতে পারে— ক) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং খ) শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে।

ক) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন : এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পরিচিত বিভিন্ন গল্প, মহাপুরুষদের জীবনের খণ্ড কাহিনী, ভ্রমণকাহিনী, সিনেমা ইত্যাদি পড়াশুনোর সূত্রে প্রসঙ্গক্রমে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ— 'তারে জমিন পর' সিনেমার শিশুটির শিক্ষক কিভাবে শিশুটির প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে।

খ) শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে : এক্ষেত্রে শিক্ষক কোন একটি টপিক তুলে শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা আলোচনা করাকালীন শিক্ষক কো-অর্ডিনেটর হিসাবে থাকবেন। শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে কোন ভাবেই আলোচনা যেন শিক্ষাক্ষেত্রের বাইরে না যায়। এছাড়া খুব বেশী তর্ক-বিতর্কের মধ্যে আলোচনা যেন না পৌঁছায়। তাছাড়া আলোচনা সূত্রে নতুন কোন তথ্য আসলে শিক্ষক উৎসাহ দেবেন। উদাহরণস্বরূপ টেলিভিশনের জনপ্রিয় কোনো বিতর্ক অনুষ্ঠানের কথা বলা যেতে পারে।

৯. অনুবন্ধ পদ্ধতি :

মাতৃভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অনুবন্ধ প্রণালী বৃহৎ শিক্ষাদান করে। এক্ষেত্রে কোন একটি বিষয় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন এবং অন্যান্য বিষয়ের সাথে তার সম্পর্ক নির্ণয় করবেন। যেমন— 'সাবান' একটি বাংলা শব্দ হলেও আগে পর্তুগীজ শব্দ ছিল, 'সাবান তৈরী' কর্মশিক্ষার একটি প্রকল্পও হতে পারে। আবার 'সাবান তৈরী' করতে গেলে যে উপকরণগুলি লাগে সেটা জীবনবিজ্ঞানের বিষয়ও হতে পারে, এই প্রকল্পে কত খরচ হয়, সেটি গণিতের প্রশ্ন। আবার সাবানের ইংরেজী শব্দ soap ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া যায়; মাতৃভাষাও তার মধ্যে একটি বিষয়।

১০. প্রকল্প পদ্ধতি :

প্রকল্প পদ্ধতিতে চারটি ধাপ থাকে। যথা প্রস্তুতি, পরিকল্পনা, কর্মসম্পাদন এবং মূল্যায়ন। কোন একটি বিশেষ প্রকল্প নির্বাচন করে এই চারটি ধাপের মধ্য দিয়ে শিক্ষককে অগ্রসর হতে হবে। কোন সমস্যামূলক প্রশ্ন যেমন— বাংলা মাধ্যমে শিক্ষার পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি প্রভৃতি প্রকল্প নির্বাচন করা যায়। প্রকল্প আবার কয়েক ধরণের হতে পারে — সৃজণাত্মক, কর্মমূলক, অনুশীলনমূলক এবং সমস্যা সমাধানমূলক ইত্যাদি। মাতৃভাষা শিক্ষাদানে এই পদ্ধতিরও গুরুত্ব কম নয়।

১১. অবরোহী পদ্ধতি :

মাতৃভাষা শিক্ষাদানে অবরোহী পদ্ধতির গুরুত্ব আছে। সূত্র বা নিয়ম থেকে উদাহরণে আসার নীতি অনুসরণ করে এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়।

১২. আরোহী পদ্ধতি :

মাতৃভাষা শিক্ষাদানে আরোহী পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতির শিক্ষক কোন বাস্তব এবং ঐতিহাসিক উদাহরণ আলোচনা করতে করতে আস্তে আস্তে সূত্রে বা সিদ্ধান্তে আসবেন।

৪.৪ কথন : বাকযন্ত্র ও ধ্বনিতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আদর্শ ধারণাসমূহ উপযোগিতা

ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে কথনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শিশু প্রধানত দেড় বছর বয়স থেকে দুই পদ বিশিষ্ট দু-একটি কথা বলে মাতৃভাষার সাহায্যে। দেড় বছর বয়সের আগে অবশ্য শিশু দু-অক্ষর বিশিষ্ট দু-একটি শব্দ উচ্চারণ করে। মোটামুটি আড়াই-তিন বছর বয়স থেকে শিশু তিন পদবিশিষ্ট ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করতে পারে। আনুমানিক সাড়ে তিন বছর বয়স থেকে শিশু সম্পূর্ণ বাক্যে কথা বলতে পারে এবং একসাথে কখনও কখনও ছয়-সাতটি বাক্য বলতে পারে। এখন অবশ্য শিক্ষার্থীরা আড়াই বছর বয়স থেকে স্কুলের গণ্ডিতে পৌঁছায়। অবশ্য শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে প্রবেশের বয়স ছয় থেকে ধরা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার স্তর বলতে শিক্ষার্থীদের ৬-১০ বছর বয়সকে ধরা হয়। যখন থেকে শিশু কথা বলতে শেখে তখন থেকে এই বয়স পর্যন্ত শিশুরা অনুকরণ করে। তাই এই বয়সের শিশুরা যেমন শোনে তেমনই অনুকরণ করতে চায়। শিশুরা বিদ্যালয়ে পৌঁছাবার আগে তাদের জীবনে মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে মায়ের এবং তার পরিবারের অন্যান্যদের ভূমিকা প্রবল। তারপর স্কুলে যাওয়ার পর আস্তে আস্তে তাদের মেলামেশার পরিধি বাড়তে থাকে এবং আরও পরে চিন্তা ও বিচারশক্তির উন্নতি ঘটতে থাকে, তখন তারা ধীরে ধীরে প্রকাশ করতে শেখে।

আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকরা মনে করেন, কথ্যভাষা ব্যবহারের অভ্যাস গঠন করার মধ্য দিয়েই শিশুর ভাষা শিক্ষার সূচনা হওয়া উচিত। মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে চারটি বিষয় অত্যন্ত জরুরি (১) পড়ে বুঝতে পারা (২) শুনে বুঝতে পারা (৩) বলে বোঝানো (৪) লেখার মাধ্যমে অপরকে বোঝানো। অর্থাৎ এক্ষেত্রে চারটি বিশেষ দক্ষতার কথা বলা হয়েছে। মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে কথন, চর্বন, শ্রবণ এবং লিখন এই চারটি দক্ষতাকে আমরা কাজে লাগাতে পারি এবং প্রত্যেকটিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কথন অর্থাৎ কথা। শিশুদের কথা বলার ক্ষমতার বিকাশ সবার একইভাবে ঘটে না। এক-একজনের এক-এক রকমের হয়। তবে সাধারণভাবে নয় মাস থেকে দাদা, মা, বাবা ইত্যাদি বলতে পারে এবং চার-পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে শিক্ষার্থীরা পুরোপুরি কথা বলতে পারে। কথা বলার জন্য এই বয়স পর্যন্ত শিশুদেরকে অনুকরণ করতে হয়। তাই শিশু যখন প্রথম কথা বলতে শেখে তখন থেকে শ্রবণের অত্যাধিক গুরুত্ব রয়েছে। তারা তখনও পর্যন্ত ভালো পড়তে শেখেনি, তারা যা বলে শুনে বলে। কথা বলার জন্য শিশুকে বাগযন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। শিশুর বাগযন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি হল ঠোঁট, জিভ, তালু, মুর্ধা প্রভৃতি।

ভাষার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে মানুষের বাক্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি সমষ্টিই হল ভাষা। অর্থাৎ মানুষ তার বাক্‌যন্ত্রের সাহায্যে যে শব্দ সৃষ্টি করে সেটাই হল ধ্বনি। আর বাক্‌যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত যে শব্দ সৃষ্টি হয় সেগুলি ধ্বনি নয়। ভাষা বিজ্ঞানীরা দন্ত, মুখ, নাসিকা, কণ্ঠ, জিহ্বা ও ফুসফুসের বিভিন্ন অংশকে বাক্‌যন্ত্র বলে স্বীকার করেছেন। বাক্‌যন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলি হল—

NC – Nasal cavity — নাসিকা-গহ্বর

OC – Oral cavity — মুখ গহ্বর

LL – Lips — ওষ্ঠ ও অধর

TT – Teeth — দন্ত

TR – Teeth – ridge – Alvedae — দন্তমূল — মাড়ি

HP – Hasol – Palate — শক্ত তালু — অগ্রতালু

D – Dome — মূধা বা সর্বোচ্চ তালু

SP – Soft palate – velum — নরম তালু — স্নিগ্ধ তালু — পশ্চাৎ তালু

RT = Root of the tongue — জিহ্বামূল

Lungs — ফুসফুস

Nostril — নাসারন্ধ্র বা নাসাপথ

Lary — স্বরযন্ত্র — স্বরকক্ষ

VC – Vocal chords — স্বরতন্ত্রী — কণ্ঠতন্ত্রী

E – Epiglottis — উপজিহ্বা — অধিজিহ্বা

G = Gullet = acsophegus — শ্বাসনালী

Ph – Pharyanx — কণ্ঠনালী — উর্ধ্বকণ্ঠ — গলমুখ

BT – Back of the tongue — জিহ্বার পশ্চাৎ ভাগ

FT – Front of the tongue — জিহ্বার সম্মুখ ভাগ

BI – Blade of the tongue — অগ্রজিহ্বা - জিহ্বার পাতলা অংশ

A – Apex – Tip of the tongue — জিহ্বাপ্রান্ত-জিহ্বাশিখর

U – Uvula — আলাজিভ-শুন্ডিকা

বাক্‌যন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলি নিম্নে একটি চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল —

ছবি

বাকযন্ত্র ও শ্বাসবায়ুর মিলনে উচ্চারিত বর্ণকে ধ্বনি বলে। ধ্বনিকে ব্যক্ত করার জন্য লিখিত চিহ্নকে বর্ণ বলে। অর্থাৎ ধ্বনি উচ্চারিত হয় আর বর্ণ দেখা যায় বা বর্ণ-লিখিত রূপ। বর্ণ দুই প্রকার—স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জন বর্ণ। যে বর্ণ ভাঙা যায় না, তাই স্বরবর্ণ। অর্থাৎ অন্য কোন স্বরধ্বনি সাহায্য ছাড়াই যে বর্ণ উচ্চারিত হয় তাই স্বরবর্ণ। আর যে বর্ণ স্বরধ্বনি সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না, তাই ব্যঞ্জন বর্ণ। বর্ণের মতো ধ্বনিও দুই প্রকার স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি।

উচ্চারণ প্রক্রিয়া, উচ্চারণ স্থান, উচ্চারকের কোন অংশ স্পর্শ করে এবং ব্যঞ্জন বর্ণের প্রকৃতি প্রভৃতি অনুযায়ী ধ্বনি বা বর্ণের বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে।

দন্ত্যধ্বনি :

জিহ্বার অগ্রভাগ উপরের দাঁতে শ্বাসবায়ুকে বাধা দিয়ে যে ধ্বনি সৃষ্টি করে তাকে দন্ত্য ধ্বনি বলে। যেমন— ত্, থ্, দ্, ধ্ ইত্যাদি এই ধ্বনির উদাহরণ।

ওষ্ঠধ্বনি :

নীচের ওষ্ঠ দ্বারা উপরের ওষ্ঠে বা দন্ত্যে শ্বাসবায়ু বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যে ধ্বনি সৃষ্টি হয় তাকে ওষ্ঠ্যধ্বনি বলে। যেমন— প্, ফ্, ব, ভ, ম।

তালব্যধ্বনি :

জিহ্বার অগ্রভাগ যখন শক্ততালুর শ্বাসবায়ুকে বাধা দিয়ে কোন ধ্বনি সৃষ্টি করে তাকে কণ্ঠধ্বনি বলে। যেমন — ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্ ইত্যাদি।

উষ্ণধ্বনি :

ঊর্ধ্ব ও নিম্ন স্বরতন্ত্রী দুটি পরস্পরের খুব কাছাকাছি আসার ফলে শ্বাসবায়ুর যাতায়াতে আংশিক বাধার সৃষ্টি হয়ে যখন শিস্ দেওয়ার মতো ধ্বনির সৃষ্টি হয় তখন তাকে উষ্ণধ্বনি বলে। যেমন— শ, ষ, স্, হ ইত্যাদি

ঘোষধ্বনি :

বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণগুলি উচ্চারণের সময় আমরা ঐ ধ্বনি বা বর্ণগুলির সাথে স্বরতন্ত্রীর কম্পনজাত সুর বা ঘোষ মিশিয়ে উচ্চারণ করি বলে ঐ ধ্বনি গুলিকে ঘোষধ্বনি বলা হয়। যেমন — গ্, ঘ্, ঙ্, ব্, ভ্, ম্, দ্, ধ্, ন্, জ্, ঝ্, ঞ, ড, ঢ, ণ।

অঘোষধ্বনি :

বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণগুলি উচ্চারণের সময় আমরা ঐ ধ্বনির সাথে স্বরতন্ত্রী কম্পনজাত সুর মিশিয়ে উচ্চারণ করি না বলে, ঐ ধ্বনিগুলিকে অঘোষধ্বনি বলে। যেমন— ক, খ, চ, ছ, ট, ঠ ইত্যাদি।

মহাপ্রাণ বর্ণ :

বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ উচ্চারণের সময় কণ্ঠনালী সঙ্কুচিত করে স্বরতন্ত্রীর মধ্যবর্তী স্বরপথে আংশিক অবরোধ সৃষ্টি করে ফলে শ্বাস বা প্রাণ জোরে বার হয়ে। তাই এদেরকে মহাপ্রাণ বর্ণ বলে। যেমন খ, ঘ, ঠ, ট, ফ, ও ইত্যাদি।

অল্পপ্রাণ বর্ণ :

বর্গের প্রথম ও চতুর্থ বর্ণ উচ্চারণের সময় প্রাণ বা শ্বাস বায়ু জোরে বের হয় না বলে এদেরকে অল্পপ্রাণ বর্ণ বলে। যেমন— ক, গ, ট, ঠ, ত, দ ইত্যাদি।

নাসিক্য বর্ণ :

প্রত্যেকটি বর্গের পঞ্চম বর্ণ ঙ অর্থাৎ ঞ, ণ, ন, ম প্রভৃতি উচ্চারণের সময় আনুনাসিক হয় বলে এগুলিকে নাসিক্য বর্ণ বলে।

এই ধ্বনিগুলি আবার নানা কারণে পরিবর্তন ঘটে। কখনও বাক্‌যন্ত্রের ত্রুটি, কখনও আঞ্চলিকতার প্রভাব, কখনও উচ্চারণেব ত্রুটি, কখনও অজ্ঞতা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে ধ্বনি পরিবর্তিত হয়। কোথাও বা ধ্বনি লোপ হয়, আবার কোথাও বা অন্য ধ্বনি এসে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধ্বনিগুলি নিজের জায়গা থেকে স্থানান্তরিত হয় ইত্যাদি। নীচে ধ্বনি পরিবর্তনের কয়েকটি রীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

স্বরভক্তি/বিপ্রকর্ষ

উচ্চারণের ত্রুটির জন্য কিংবা ছন্দের প্রয়োজনে যুক্ত ব্যঞ্জনকে ভেঙে তার মধ্যে একটি স্বরধ্বনি আনয়ন করার রীতিকে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ বলে — যত্ন > যতন — য্ + অ + ত্ + ন্ + অ > য্ + অ + ত্ + অ + ন্ + অ

স্বরসঙ্গতি

কোন শব্দ উচ্চারণকালে পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বরের কিংবা পরবর্তী স্বরের প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরের পরিবর্তন হয় — এই পরিবর্তনকে স্বরসঙ্গতি বলে।

(ক) পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বরের পরিবর্তন —

ভিক্ষা > ভিক্ষে, বিলাত > বিলেত, শিক্ষা > শিক্ষে ইত্যাদি।

পরবর্তী স্বরের প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরের পরিবর্তন —

পূজা > পূজো, দেশি > দিশি ইত্যাদি।

ব্যঞ্জন সঙ্গতি বা সমীভবন :

কোন শব্দ উচ্চারণকালে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের প্রভাবে পরবর্তী, পরবর্তী ব্যঞ্জনের প্রভাবে পূর্ববর্তী, পরস্পরের প্রভাবে পরস্পরের পরিবর্তন হলে তাকে ব্যঞ্জন সঙ্গতি বা সমীভবন বলে। সমীভবন তিন প্রকার —

১. পূর্ববর্তী ধ্বনি পরবর্তী ধ্বনিকে পরিবর্তন করলে প্রগত সমীভবন —

চন্দন > চন্নন, পদ্ম > পদ্দ

২. পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনিকে পরিবর্তন করলে হয় পরাগত সমীভবন —

কর্ম > কম্ম, কাঁদনা > কান্না

৩. পরস্পরের প্রভাবে পরস্পর পরিবর্তিত হলে অনন্য সমীভবন হয় —

উৎশৃঙ্খল > উচ্ছৃঙ্খল

বিষমীভবন :

শব্দ মধ্যস্থিত দুটি সমধ্বনির মধ্যে একটি পরিবর্তিত হলে তাকে বিষমীভবন বলে।

লাল > নাল

অপিনিহিতি :

উচ্চারণের ত্রুটির জন্য শব্দ মধ্যস্থ 'ই' কার বা 'উ' কার যখন উচ্চারিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে উচ্চারিত হয়ে যায় তখন তাকে অপিনিহিতি বলে। বর্তমানে পূর্ববঙ্গে প্রচলিত। যেমন—

করিয়া > কইর‍্যা।

মাদুয়া > মাউছা।

অভিশ্রুতি :

অপিনিহিতি জাত 'ই' কার বা 'উ' কার যখন পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায় তখন তাকে অভিশ্রুতি বলে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত।

করিয়া > কইর‍্যা > করে

স্বরাগম :

শব্দ উচ্চারণ কালে যখন শব্দে আদি, মধ্যে বা অন্তে কোন স্বরের আগমন ঘটে তখন তাকে স্বরাগম বলে। স্বরাগম তিন প্রকার :

আদিস্বরাগম— শব্দের আদিতে স্বরের আগমন ঘটলে তাকে আদিস্বরাগম বলে। যেমন, স্কুল > ইস্কুল।

মধ্যস্বরাগম — শব্দের মধ্যে যখন স্বরের আগমন ঘটে তখন তাকে মধ্যস্বরাগম বলে। যেমন, জন্ম > জনম।

অন্তস্বরাগম — শব্দের অন্তে যখন স্বরের আগমণ ঘটে তখন তাকে অন্ত স্বরাগম বলে। যেমন, বেঞ্চ > বেঞ্চি।

ব্যঞ্জনাগম :

উচ্চারনের ত্রুটির জন্য শব্দে আদি, মধ্যে এবং অন্তে কোন নতুন ব্যঞ্জনের আগমন ঘটলে তাকে ব্যঞ্জনাগম বলে। ব্যঞ্জনাগমও তিন প্রকার।

(১) শব্দের আদিতে ব্যঞ্জনের আগমন ঘটলে আদিব্যঞ্জনাগম বলে। যেমন, ওঝা > রোজা।

(২) শব্দের মধ্যে ব্যঞ্জনের আগমন ঘটলে মধ্যব্যঞ্জনাগম বলে। যেমন, বিউলা > বেহুলা, চা-এর > চায়ের।

(৩) শব্দের অন্তে ব্যঞ্জনের আগমন ঘটলে অন্তব্যঞ্জনাগম বলে। যেমন, খোকা > খোকন।

ঘোষীভবন :

বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ যখন বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণের মতো গম্ভীর ভাবে উচ্চারিত হয়। তখন তাকে ঘোষীভবন বলে। যেমন—

কাক > কাগ, বাক্‌যন্ত্র > বাগ্‌যন্ত্র।

অঘোষীভবন : ঘোষধ্বনি যখন অঘোষধ্বনির মতো উচ্চারিত হয় তখন তাকে অঘোষীভবন বলে। যেমন—

বড়ঠাকুর > বট্‌ঠাকুর

মহাপ্রাণীভবন বা পীনায়ণ : অল্পপ্রাণ বর্ণ যখন মহাপ্রাণতা লাভ করে তখন তাকে মহাপ্রাণীভবন বা পীনায়ণ বলে। যেমন —

পুস্তক > পুঁথি।

ক্ষীণায়ণ :

মহাপ্রাণ বর্ণ যখন অল্পপ্রাণতা লাভ করে তখন তাকে ক্ষীণায়ণ বলে। যেমন —

চোখ > চোক, মাছ > মাচ।

নাসিক্যিভবন :

শব্দ উচ্চারণ কালে কোন নাসিক্য ব্যঞ্জন যখন নিকটবর্তী স্বরধ্বনিকে সানুনাসিক করে তোলে, তখন তাকে নাসিক্যিভবন বলে। যেমন —

পঞ্চ > পাঁচ।

স্বতোনাসিক্যিভবন :

কোন নাসিক্যি ব্যঞ্জন সাহায্য ছাড়াই কোন স্বরধ্বনি যখন নিজে থেকেই আনুনাসিক হয়ে যায় তখন তাকে স্বতোনাসিক্যিভবন বলে। যেমন —

প্রাচীর > পাঁচিল।

বর্ণবিপর্যয়:

উচ্চারণের ত্রুটির জন্য কিংবা আঞ্চলিকতার প্রভাবে শব্দের মধ্যে অবস্থিত একাধিক ধ্বনির মধ্যে যখন পরস্পর স্থান বদল ঘটে তখন তাকে বর্ণবিপর্যয় বলে। যেমন—

পিশাচ > পিচাশ, বাতাসা > বাসাতা, রিক্সা > রিসকা, ট্যাক্সি > ট্যাস্‌কি ইত্যাদি।

শ্রুতিধ্বনি :

উচ্চারণের ত্রুটির জন্য অথবা দ্রুত উচ্চারণের ফলে কিংবা উচ্চারণের সুবিধার জন্য দুটি ধ্বনির মাঝখানে নতুন একটি ধ্বনির অবির্ভাব ঘটে। এই নতুন ধ্বণিটিকে শ্রুতিধ্বনি বলে। শ্রুতিধ্বনি তিন ধরণের। যথা—

(১) ব-শ্রুতি : যা + আ > যাওয়া (অন্তঃস্থ ব এর মতো উচ্চারণ হবে। আবার অনেক সময় যাবা ও বলি)।
খা + আ > খাওয়া (খাবা)।

(২) য়-শ্রুতি : মোদক > মোঅঅ > মোয়া > মোয়ো।

(৩) দ-শ্রুতি : বানর > বান্দর > বাঁদর।

স্বরলোপ :

দ্রুত উচ্চারণের ফলে অথবা উচ্চারণের শ্রুতির জন্য শব্দমধ্যস্থ কোন স্বরধ্বনি লোপ হলে তাকে স্বরলোপ বলে।

(১) আদি স্বরলোপ : আলাবু > লাউ প্রভৃতি।

(২) মধ্য স্বরলোপ : জনম > জন্ম, মারিল > মারল ইত্যাদি।

(৩) অন্ত স্বরলোপ : কালি > কাল, রাতি > রাত ইত্যাদি।

বর্ণ বিকৃতি :

শব্দের অন্তর্গত স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণকালে উচ্চারণের বিকৃতি ঘটলে তাকে বর্ণ বিকৃতি বলে। যেমন—

দুপুর > দুফুর, শেয়াল > শ্যাল ইত্যাদি।

৪.৫ পঠন : প্রকারভেদ, আদর্শ পঠনের বৈশিষ্ট্য

সামাজিক মানুষ ভাষার সাহায্যে একে অপরের কাছে মনোভাব প্রকাশ করে। আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, ভাবনা-চিন্তা, বিচার বিশ্লেষণও করি ভাষার মাধ্যমে। ভাষার দুটি রূপ - একটি হল লিখিত রূপ, আর একটি হল মৌখিক। একটি ভাষা পরিবেশে বাস করার ফলে কোন একজন ব্যক্তিকে ঐ ভাষার ২৫০-৩০০ বাক্যের ছাঁচ আয়ত্ত করতে হয় এবং ২৫০০ থেকে ৩০০০ শব্দের ছাঁচ আয়ত্ত করতে হয়। কিন্তু আমরা যখন লেখাপড়া শিখে জ্ঞান-বিজ্ঞান জগতে প্রবেশ করতে চাই, তখন ভাষার লিখিত রূপের সঙ্গে পরিচিত হই। এরজন্য প্রথমেই আমাদের বর্ণের লিখিত রূপের সাথে পরিচিত হতে হয়, তারপর ধীরে ধীরে শব্দের লিখিত রূপ ও বাক্যের লিখিত রূপের সাথে পরিচিত হতে হয়। এরজন্য প্রয়োজন হয় পঠনের। ভাষার চারটি লক্ষ্য হল — (i) কারো কথা শুনে বুঝতে পারা (ii) কথা বলে নিজের মনের ভাব অপরের কাছে প্রকাশ করা (iii) পঠনের সাহায্যে কোন বিষয়ের অর্থ বুঝতে পারা (iv) লেখার মাধ্যমে নিজের মনের ভাবকে অপরের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এগুলির মধ্যে প্রথম দুটি নিরক্ষর-শিক্ষিত সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু একজন শিক্ষিত ব্যক্তির ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা বিচারের মাপকাঠি হল সে ভাষার লিখিত রূপ পড়ে কতখানি বুঝতে পারে এবং লেখার মাধ্যমে নিজের মনের ভাবকে কতখানি প্রকাশ করতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে আগে পড়া ও পরে লেখা এবং পড়ার গুরুত্ব একটু বেশী। অবশ্য প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তির জীবনে সামাজিক ব্যক্তিগত বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর জন্য লিখনের প্রয়োজন আছে। তবে ভাষা শিক্ষার জন্য মানুষের জীবনে পঠনের গুরুত্ব কম নয়। পঠন-এর সাহায্যে মানুষের জ্ঞান দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়। আবার পঠনের সাহায্যে মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান, জাতীয়তা, ঐতিহ্য-সংস্কৃতি তথা বিশ্ব সংসারের সাথে পরিচিত হয়। তাছাড়া পঠনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে রুচি ও সৌন্দর্যবোধ গড়ে ওঠে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের তাই পঠনের অভ্যাস গড়ে তোলার উপর অত্যাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় যা শিক্ষার্থীদের সারা জীবনের কাজে লাগতে পারে।

পদ্ধতির দিক থেকে পঠন বা পাঠ প্রধানত দু প্রকার — (i) সরব পাঠ (ii) নীরব পাঠ।

- (1) **সরব পাঠ :-** স-রব বা ধ্বনি বা সশব্দে যে পাঠ করা হয় তাই সরব পাঠ। শিশুরা যখন প্রথম পড়তে শেখে তখন সে সরবে বানান করে শব্দকে ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করে পঠিত বস্তুর অর্থ বোঝার চেষ্টা করে। তারপর ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীদের পঠনের উন্নতি ঘটতে থাকে ও পাঠ্যবিষয়ের পরিমাণ ও বাড়তে থাকে এবং নানা কারণে শিক্ষার্থীরা নীরব পাঠকেই গ্রহণ করতে থাকে।

- **সরব পাঠের সুবিধা বা উপযোগিতা :**

(i) সরব পাঠ শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

(ii) ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সরব পাঠ যথেষ্ট উপযোগি।

(iii) সরব পাঠ শিশুদের উৎসাহ বৃদ্ধির সহায়ক।

(iv) সরব পাঠ শিশু প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে।

(v) সরব পাঠের মাধ্যমে শিশুরা সঠিক উচ্চারণ রীতি শিখতে পারে এবং উচ্চারণে কোন ত্রুটি থাকলে দ্রুত সংশোধিত হয়।

(vi) সরব পাঠ-শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণের মাধ্যমে ভাষাকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে।

(vii) সরব পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা ছেদ-যতি চিহ্ন অনুযায়ী ঠিক-ঠাক করে পড়তে শেখে।

(viii) এই পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন রকম ছন্দের লয়-তাল অনুযায়ী পড়তে পারে।

(ix) সরব পাঠ শিক্ষার্থীদের শিক্ষককে অনুসরণ করতে সাহায্য করে।

(x) এই পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের ব্যাড হ্যাবিটগুলি দুর হয়।

(xi) সরবপাঠ শিশুদের প্রাণবন্ত করে তোলে।

(xii) উচ্চারণে কোনো রকম আঞ্চলিকতা থাকলে সরব পাঠের মধ্য দিয়ে সেগুলি দুর করা যায়।

(xiii) কবিতা আবৃত্তি বা গান গাওয়ার সময় সরবপাঠ বেশ উপযোগী।

সরব পাঠের অসুবিধা :

সরব পাঠের যেমন সুবিধা আছে তেমনি আবার কতকগুলি অসুবিধাও আছে। যেমন —

(i) সরব পাঠ করার সময় শিক্ষার্থীরা অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে পারে।

(ii) সমবেত সঙ্গীত বা সমবেত পাঠ চলাকালীন কে ভুল উচ্চারণ করছে তা অনেক সময় ধরা যায় না।

(iii) সরব পাঠ অন্যর পড়াশুনোয় ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে।

(iv) পরীক্ষার সময় অনেক শিক্ষার্থী সশব্দে উচ্চারণ করে করে লেখে তা অন্য শিক্ষার্থীদের মনোযোগ তথা পরীক্ষার ব্যাঘাত ঘটায়।

(v) সরব পাঠ অনেক ক্ষেত্রে শব্দ দুষণ করে এবং অনেক সময় শিশু এবং রোগীদের ক্ষেত্রে সেটা ক্ষতিকর।

(vi) সরব পাঠ সময় সাপেক্ষ।

(vii) সরব পাঠের ফলে অতিরিক্ত পরিশ্রম হয় এবং শরীরে ক্লান্তি সৃষ্টি হয়।

(viii) উচ্চ শিক্ষা স্তরে সরব পাঠ খুব একটা উপযোগী নয়।

(ix) সরবপাঠ গ্রন্থাগারের নীরবতা ভঙ্গ করে।

(2) **নীরব পাঠ :**

যে পাঠের দ্বারা কোন রব বা ধ্বনি উৎপন্ন হয় না তাকে নীরব পাঠ বলে। ভাষা শিক্ষার প্রথম স্তরে শিক্ষার্থীদের সরব পাঠ শেখানো উচিত। সরব পাঠে কিছুটা দক্ষতা অর্জন করলে তাদের আস্তে আস্তে নীরব পাঠের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। অবশ্য সরবপাঠে দক্ষ হয়ে উঠলে নীরব পাঠ করতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। নীরব পাঠের ক্ষেত্রে আমাদের চোখ শব্দ পঙক্তি বরাবর একই রকম গতিতে অগ্রসর হয় না। মাঝে মাঝে বিরাম ঘটে। চোখ যখন চলতে থাকে তখন অর্থ- উপলব্ধি হয় না বিরামের সময় অর্থ উপলব্ধি হয়।

নীরব পাঠের সুবিধা বা উপযোগিতা :

ভাষা শিক্ষায় সরবপাঠের মতো নীরব পাঠেরও উপযোগিতা আছে। সেগুলি হল -

(i) উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নীরবপাঠ বেশী উপযোগী

(ii) নীরব পাঠের মাধ্যমে খুব কম সময়ে অনেক বেশি পড়া যায়।

(iii) নীরব পাঠে পরিশ্রম কম হয়।

(iv) নীরব পাঠের দ্বারা শিক্ষার্থীরা শব্দ দূষণের হাত থেকে সমাজকে বাঁচায়।

(v) নীরব পাঠ মননশীলতা উপযোগী পাঠও বটে।

(vi) লাইব্রেরী বা পরীক্ষার হলে নীরবপাঠ একান্ত উপযোগী।

(vii) পরীক্ষা আগে এবং ব্যস্ততার সময় নীরবপাঠ খুব ফলদায়ী

(viii) বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, গল্প-উপন্যাস পাঠে নীরব পাঠ বেশি উপযোগী।

নীরব পাঠের অসুবিধা :

নীরব পাঠের কতকগুলি অসুবিধা আছে —

(i) শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য নীরব পাঠ উপযোগী নয়।

(ii) নীরব পাঠের দ্বারা ভুল ধরা ও সংশোধন করা যায় না।

(iii) নীরব পাঠকালে শিক্ষার্থীরা অমনোযোগী হলে বোঝার উপায় থাকে না।

(iv) সমবেত পাঠে এবং সমবেত গানের নীরব পাঠ উপযোগী নয়।

(v) কবিতা আবৃত্তি করার সময় নীরব পাঠ কাম্য নয়।

(vi) নীরব পাঠের দ্বারা শিক্ষার্থীদের ছন্দ-তাল-লয়ের শিক্ষা দেওয়া যায় না।

(vii) নীরব পাঠের দ্বারা শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণ শেখানো যায় না।

(viii) নীরব পাঠে শিশু প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

(ix) শিক্ষার্থীরা পড়ছে না ফাঁকি দিচ্ছে নীরব পাঠে তা বোঝা যায় না।

নীরবপাঠও সরব পাঠের তুলনামূলক উপযোগীতা

(i) রব বা ধ্বনি যুক্ত পাঠই হল সরব পাঠ। অন্যদিকে রবহীন পাঠই হল নীরব পাঠ।

(ii) সরব পাঠের সময় শিক্ষার্থীদের দর্শন, শ্রবণ ও কথন সময়ের তালে তালে সমানভাবে কাজ করে। অন্য দিকে নীরব পাঠে শ্রবণের কাজ থাকে না। দর্শনের মাঝে মাঝে বিরাম ঘটে। কথন নাও থাকতে পারে।

(iii) সরব পাঠে প্রতিটি শব্দের উপর সমান মনোযোগ দিতে হয়। অন্যদিকে নীরব পাঠে প্রতিটি শব্দের উপর জোর না দিয়ে বরং পাঠ্য বিষয় বস্তুর উপর জোর দিতে হয়।

(iv) নিম্নশ্রেণীতে সরবপাঠ একান্ত জরুরি। অপরদিকে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের সূচনা থেকেই নীরব পাঠের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ বাড়তে থাকে।

(v) সরব পাঠের চেয়ে নীরবপাঠের গতিবেগ অনেক বেশী। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের কম সময়ে অনেক বেশী পড়াশুনা করতে হয়। তাই বর্তমানে নীরব পাঠের অনেক বেশী প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

(vi) সরব পাঠের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের সঠিক উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গীর ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি পরীক্ষা করে সেগুলি সংশোধন জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নেওয়া যায়। নীরব পাঠে এই ধরনের সুযোগ পাওয়া সম্ভব নয়।

(vii) সরব পাঠের দ্বারা গৃহ পরিবেশের শান্তি নষ্ট হয়। অনেকে একসঙ্গে সরব পাঠ করে গোলমাল সৃষ্টি হয়। নীরব পাঠে তা হয় না।

(viii) পাঠাগার কিংবা পঠন কক্ষে অনেক ছাত্রকে একসঙ্গে পড়াশুনা করতে হলে সেখানে নীরব পাঠই একমাত্র অবলম্বনীয় মাধ্যম। সেখানে সরবপাঠ চলে না।

(ix) সরব পাঠের মাধ্যমে লেখক ও তার সৃষ্ট সাহিত্যের অনুভূতি একসঙ্গে অনেক শ্রোতাদের মধ্যে বিচরণ করে দেওয়া যায়। কিন্তু নীরব পাঠের মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। সেখানে শুধু পাঠকই পঠিত বস্তুর অর্থ উপলব্ধি করে।

(x) শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনে সরব অপেক্ষা নীরব পাঠের প্রয়োজন অনেক বেশী।

(xi) কবিতা আবৃত্তি সময় সরব পাঠের গুরুত্ব বেশী নীরব পাঠের চেয়ে।

(xii) নীরব পাঠের চেয়ে সরব পাঠে সময় এবং শ্রমের বেশী অপচয় হয়।

(xiii) সরব পাঠের দ্বারা শিক্ষার্থীদের ছেদ-যতি চিহ্নের শিক্ষা দেখা যায়। অন্যদিকে নীরব পাঠে তা সম্ভব নয়।

(xiv) সরব পাঠে শিক্ষার্থীরা অন্যমনস্ক থাকছে কি না তা বোঝা যায়। কিন্তু নীরব পাঠে শিক্ষার্থীরা ফাঁকি দিচ্ছে কি না তা বোঝা সম্ভব নয়।

(xv) দ্রুত পঠনে সরবপাঠ অপেক্ষা নীরব পাঠ বেশী প্রয়োজনীয়।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিক থেকে পাঠ তিন প্রকার যথা - (ক) ধারণা পাঠ (খ) স্বাদনা পাঠ এবং (গ) চর্বণা পাঠ। নিম্নে সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হল —

(ক) ধারণা পাঠ

শুধুমাত্র অর্থ বোঝার জন্য বা একটা সাধারণ ধারণা পাওয়ার জন্য যে ধরনের পাঠের প্রয়োজন হয়। তাকে ধারণা পাঠ বলে। এই জাতীয় পাঠে নিখুত বিচার-বিশ্লেষণ কিংবা রসাস্বাদনের অবকাশ থাকে না। গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী, ডায়েরী, সাময়িক পত্র, সংবাদপত্র প্রভৃতি পাঠ করার সময় এই ধরনের পাঠকে গ্রহণ করা যেতে পারে। দ্রুত পঠনের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকগুলির বিষয়বস্তু সাধারণত শিক্ষার্থীরা ধারণা পাঠের মাধ্যমে আয়ত্ত করার চেষ্টা করে বলে এর নাম আয়ত্তীকরণ পাঠও বটে।

(খ) স্বাদনা পাঠ

যে পাঠের মাধ্যমে কোনো সাহিত্য-রস সমৃদ্ধ কাব্য বা গদ্য রচনার রস আস্বাদন করা যায় তাকে স্বাদনা পাঠ বলে। কাব্যের রস আস্বাদন বলতে বোঝায় ছন্দ, শব্দ প্রয়োগের চমৎকারিত্ব, প্রকাশভঙ্গীর সৌন্দর্য, বক্তব্য বিষয় কিংবা বর্ণনার মনোহারিত্ব প্রভৃতি। এছাড়া কবিতা রচনার সময় কবির যে গভীর অনুভূতি ও অনির্বচনীয় হৃদয়াবেগের সৃষ্টি হয়েছিল তার সঙ্গেও একাত্মতা অনুভব করা যায় কবিতা রসাস্বাদনের মাধ্যমে। আবার গদ্য রচনার রসাস্বাদনের জন্য স্বাদন পাঠের প্রয়োজন হয়। রসাস্বাদনের জন্য ছাত্রদের যেসব গদ্য রচনা পড়ানো হবে সেগুলির বিষয়বস্তু তাদের কাছে আকর্ষণীয় হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া গদ্য রচনায় এমন

কতকগুলো গুণ থাকে যার দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে আনন্দ ও সন্তোষের সৃষ্টি হবে এবং তাদের আত্মিক আকাঙ্ক্ষা সত্য-শিব ও সুন্দরের প্রতি ধাবিত হবে।

(গ) চর্বনা পাঠ :

যে পাঠের মাধ্যমে পাঠকের চিন্তাশক্তি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করে যুক্তিতর্কাশ্রয়ী ও বিচার বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধের বক্তব্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যায়, তাকে চর্বনা পাঠ বলে। শক্ত খাদ্যবস্তুকে চিবিয়ে রসাস্বাদনের মতোই জটিল প্রবন্ধকে বিচার বিশ্লেষণ করে অর্থ উপলব্ধি করতে হয় বলে একে চর্বনা পাঠ বলে।

সুতরাং কোন পাঠ্য বিষয়ের শুধুমাত্র মূল বক্তব্য বিষয় জানার জন্য ধারণা পাঠের প্রয়োজন। আবার সাহিত্য রসাস্বাদনের জন্য প্রয়োজন স্বাদনা পাঠ। আর কঠিন পাঠ্য বিষয়কে যুক্তি-তর্ক, বিচার বিশ্লেষণ করে বুঝতে হলে চর্বনা পাঠ প্রয়োজন। অর্থাৎ ধারণা পাঠ শুধুমাত্র অর্থ উপলব্ধি পর্যন্ত পৌঁছায়, স্বাদনা পাঠের আবেদন হৃদয়ের কাছাকাছি পৌছায়, আর চর্বনা পাঠের আবেদন মস্তিষ্কের কাছাকাছি পৌঁছায়। সুতরাং বলা যায় একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষার পরিপূর্ণতার জন্য তিনটি পাঠেরই প্রয়োজন।

পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ ও ব্যাপক পাঠ

প্রয়োজন অনুযায়ী সাহিত্যের কিছু অংশ পড়বার সময় আমরা প্রধানত দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করি। (1) পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ (2) ব্যাপক পাঠ।

যে পদ্ধতিতে কোন পাঠ্যবস্তুর প্রতিটি শব্দ, তার অর্থ, ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য, বাক্যের গঠন, রচনার প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হয় তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ বলে। পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠের মাধ্যমে ভাষাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুশীলন করা হয়। পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা বিকাশ ঘটে, শব্দভাণ্ডারের বিস্তৃতি ঘটে; — সেগুলি তারা পরবর্তীকালে বাস্তব জীবনে ব্যবহার করতে পারে। ব্যাকরণ পাঠ করতে গেলে শিক্ষার্থীদের এই পাঠের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। অন্যদিকে যখন কোন রচনার উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে তার মূল বক্তব্যগুলি আহরণ করা হয়। তাকে বলা হয় ব্যাপক বা বিস্তৃত পাঠ।

বিস্তৃত পাঠে শুধু বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিস্তৃত পাঠে শিক্ষার্থীদের পঠনে স্বাধীনতা থাকে। কোন গল্প, উপন্যাস, সাময়িকপত্র পাঠে ব্যাপক পাঠ ব্যবহৃত হয়।

পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ ও ব্যাপক পাঠের তুলনা

(1) পুঙ্খানুপুঙ্খপাঠে কোন রচনাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া হয়। অন্যদিকে ব্যাপক পাঠে খুঁটিয়ে পড়া হয় না।

(2) পুঙ্খানুপুঙ্খপাঠের দ্বারা শিক্ষার্থীরা শব্দ, বাক্যের গঠনশৈলী ও ব্যাকরণগত অন্যান্য বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করতে পারে এবং পরবর্তীকালে বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারে। অন্যদিকে ব্যাপক পাঠে তা সম্ভব নয়।

(3) পুঙ্খানুপুঙ্খপাঠে শিক্ষার্থীদের পাঠে স্বাধীনতা থাকে না। ব্যাপকপাঠে স্বাধীনতা থাকে।

(4) পুঙ্খানুপুঙ্খপাঠে ভাষাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। ব্যাপক পাঠে তা করা হয় না।

(5) পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠে সময়ের বেশী প্রয়োজন। ব্যাপক পাঠ খুব কম সময়ে সম্ভব।

(6) গভীর মনোযোগ না থাকলে পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ সম্ভব নয়। ব্যাপকপাঠে খুব বেশী মনোযোগ না হলেও চলবে এবং কোনো স্থানে টাইম পাস করার জন্যও ব্যাপক পাঠ অবলম্বন করা যায়। এছাড়া আরও কয়েক ধরনের পাঠ আছে। যেমন —

সমবেত পাঠ :

সরবপাঠ-নীরবপাঠ, স্বাদনা পাঠ, চর্বণাপাঠ এবং ধারণা পাঠ ইত্যাদি প্রায় সকল পাঠই একক পাঠ। তবে এককভাবে যেমন সরব পাঠ করা যায় তেমনি বহুজন একত্রিতভাবেও পাঠ করা যায়। বহুজন সরবে একসঙ্গে একভাবে, একতালে, একবিষয় পাঠ করাকে সমবেত পাঠ বলে। যেমন বিদ্যালয়ে জাতীয় সঙ্গীত, প্রার্থনা সঙ্গীত গাওয়ার সময় এই পাঠ অবলম্বন করা হয়। অবশ্য এই পাঠের কিছু অসুবিধা আছে। যেমন প্রথমত এই ধরনের পাঠ শব্দদূষণ ঘটায়। তাই সবসময় সবস্থানে এই পাঠ সম্ভব নয়। আবার এই পাঠে বহুজনের মধ্যে কে কোথায় শব্দের উচ্চারণ, তাল-লয় ও সুরের ভুল করছে তা বোঝা সম্ভব নয়।

অনুপুরক পাঠ ও সমান্তরাল পাঠ :

কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানভাণ্ডারকে বৃদ্ধি করার জন্য যখন অনুপুরক বা সমধর্মী বা একই সিলেবাসের অন্তর্গত অন্য কোন লেখকের বইয়ের সাহায্য নিয়ে পাঠ করা হয় তখন তাকে অনুপুরক পাঠ বলে। শিক্ষার্থীরা যে রেফারেন্স বইগুলি পড়ে সেটিই এই পাঠের উদাহরণ। আবার একটি বই পড়তে গিয়ে শিক্ষার্থীরা যখন সমধর্মী অন্যকোন বইয়ের সাথে তুলনা করে পাঠ্য বিষয় বোঝার চেষ্টা করে সেটাই সমান্তরাল পাঠ। যেমন— পাখি বিষয়ক কোন গল্প পড়তে গিয়ে পাখি বিষয়ক আর যে যে গল্প আছে সেগুলির পাঠ করে প্রত্যেকটির মধ্যে সাদৃশ্য ও তুলনা করা চেষ্টা করি ইত্যাদি। এক কথাই অনুপুরক পাঠের গণ্ডী সমান্তরাল পাঠের তুলনায় সংক্ষিপ্ত। অনুপুরক পাঠে অনুপুরক গ্রন্থ থেকে শুধু সাহায্য নেওয়া হয়। আর সমান্তরাল পাঠে সমধর্মী গ্রন্থের সাহায্যও নেওয়া হয় এবং উভয়ের তুলনাও করা হয়।

- **আদর্শপাঠের বৈশিষ্ট্য**

সাহিত্য তথা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে আদর্শপাঠ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষার্থীরা যদি আদর্শ পাঠে দক্ষ হয়ে না ওঠে তাহলে তারা শব্দের যথার্থ উচ্চারণ, অর্থ-উপলব্ধি, ছেদ-যতি-অলংকার, তাল-লয় ইত্যাদি অনুযায়ী ঠিকঠাক পাঠ করতে পারবে না। তাছাড়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আদর্শপাঠ না জানার ফলে শিক্ষার্থীদের পাঠের গতিও খুব মন্থর হয়, ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তারা কোন পাঠ্য বিষয় পড়ে উঠতে পারে না। তাই বিভিন্ন কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আদর্শ পাঠের অভ্যাস গঠন করা দরকার। যে যে গুণ থাকলে আমরা কোন পাঠকে আদর্শ পাঠ বলব সেগুলি হল —

(1) **নির্ভুলতা :-**

আদর্শপাঠের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল নির্ভুলতা। সরব পাঠ করার সময় প্রত্যেকটি শব্দ বা শব্দাংশ নির্ভুলভাবে উচ্চারণ করতে হবে। তাছাড়া পাঠ করার সময় ছেদ-যতি চিহ্ন অনুযায়ী ঠিক ঠিক স্থানে বিরাম গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং শ্বাসাঘাতের ব্যবহার ঠিকভাবেই করতে হবে। কবিতা আবৃত্তি করার সময় ছন্দ-তাল-লয় এবং

পর্ব বিভাগ অনুযায়ী বিরাম গ্রহণ করতে হবে। অবশ্য নীরব পাঠের ক্ষেত্রে প্রতিটি শব্দের অর্থ, ছন্দ-প্রকৃতি ইত্যাদি অনুযায়ী পঠনের প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র সংক্ষেপে একটু চোখ বুলিয়ে পাঠ্যবস্তুর অর্থ বা মূলভাব উপলব্ধি করতে পারলেই হল।

(2) **গতি :**

আদর্শপাঠের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল গতি। শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষার মান অনুযায়ী পাঠে গতি বজায় রাখতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মানসিক-দৈহিক বয়স এবং শ্রেণী অপেক্ষাকৃত কম তাই তখন তাদের পক্ষে দ্রুত পাঠ করা সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীদের মানসিক ও দৈহিক বয়স এবং শ্রেণী যত বাড়তে থাকে ধীরে ধীরে তাদের পাঠের গতিও বাড়তে থাকবে। সরব পাঠ করার সময় প্রতিটি শব্দ, শব্দাংশ ও উচ্চারণ প্রকৃতি অনুযায়ী পাঠ করতে হয় বলে সরব পাঠে গতি কম। অন্যদিকে নীরব পাঠে শব্দ নয়, শুধু পাঠ্যবস্তুর মূলভাব বুঝতে পারাই পঠনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে নীরবপাঠ খুব দ্রুত সম্ভব। অবশ্য একেবারে নিম্নস্তরে নীরব পাঠ প্রযোজ্য নয়।

(3) **উপলব্ধি :**

কোন বিষয় পাঠ করে তার অর্থ উপলব্ধি করতে পারাও আদর্শপাঠের বৈশিষ্ট্য। অবশ্য উপলব্ধি শব্দটি বৃহৎ অর্থে ব্যবহৃত। গদ্য রচনার ক্ষেত্রে কোন বিষয়বস্তু পড়ে তার সাহিত্যগুণ, শব্দ-ব্যবহারের কৌশল, বাক্যগঠন রীতি, বক্তব্য বিষয় উপস্থাপিত করার বিশেষত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলিকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারাকে উপলব্ধি বলা যায়। আর কবিতা পাঠের ক্ষেত্রে মূল বক্তব্য বোঝার সাথে ছন্দরূপ, ভাবার্থ, রস ও ভাষার মাধুর্য আস্বাদন করাকে উপলব্ধি বলা যায়। নিম্নশ্রেণীতে পঠিত বিষয়ের অর্থ উপলব্ধিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তারপর দৈহিক ও মানসিক বয়স বৃদ্ধি সাথে সাথে ব্যাপক অর্থে পঠিত বিষয়ের অর্থ উপলব্ধিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

(4) **অভিব্যক্তি :**

আদর্শ পাঠের আরও একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য হল অভিব্যক্তি। কোন সাহিত্যের মধ্যে লেখকের যে আবেগ অনুভূতি ইত্যাদি থাকে সরব পাঠের মধ্য দিয়ে পাঠক তা ব্যক্ত করবেন। সেক্ষেত্রে পাঠকের, কণ্ঠস্বর, মুখভঙ্গী-অঙ্গভঙ্গী, উচ্চারণ ভঙ্গিমা, ছন্দধ্বনি ইত্যাদি বিশেষ মাধুর্যের দ্বারা প্রকাশিত হয়ে উঠবে এবং সেক্ষেত্রে পাঠকের মুখমণ্ডলে রসাস্বাদনের এক অপূর্ব অভিব্যক্তি ফুটে উঠবে।

৪.৬ কবিতা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, পদ্ধতি

কবিতা কাকে বলে সে সম্পর্কে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বহু অলংকারিক ও সমালোচক বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন। আজ পর্যন্ত কবিতা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দিতে না পারলেও মানুষ কবিতা সৃষ্টির সেই প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত তার উত্তর সন্ধান করে চলেছে। কবিতার আত্মা কী, তার রহস্য কী, এসব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে সংস্কৃত অলংকারিকদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ ছিল, পাশ্চাত্য সমালোচকদের মধ্যে এ নিয়ে মতান্তরের অন্ত নেই। কাব্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ভারতীয় অলংকারিকরা বলেছেন 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং' অর্থাৎ রসাত্মক বাক্যই হল কাব্য। অর্থাৎ বাক্য হল কাব্যের দেহ, আর রস হল বাক্যের প্রাণ। মানুষ যেমন তার

জীবন ছাড়া বাচতে পারে না, তেমনি রস ছাড়া কাব্যও প্রাণহীন। এখন প্রশ্ন হল রস কি? কাব্য রচনাকালে কবির অন্তরে প্রবল ভাবাবেগ সৃষ্টি হলে তার চিত্ত দ্রবীভূত হয়, এই দ্রবীভূত চিত্তের স্থায়ী ভাবকে রস বলে। পাঠক যখন কাব্য-কবিতা পাঠ করে তখন কবির হৃদয়াবেগ পাঠকের চিত্তে সঞ্চারিত হয়। ফলে পাঠকের হৃদয় এক অপূর্ব আনন্দে ভরপুর হয়।

কবিতা সাধারণত দুই প্রকার

(1) আত্মনিষ্ঠ কবিতা বা মন্ময় কবিতা

(2) বস্তুনিষ্ঠ কবিতা বা তন্ময় কবিতা

(1) আত্মনিষ্ঠ কবিতা :

যে কবিতায় কবির ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি, আনন্দ-বেদনা, কামনা-বাসনা, হৃদয়াবেগ-আকুতি ইত্যাদি প্রকাশ পায়, তাকে আত্মনিষ্ঠ কবিতা বা গীতিকবিতা বলে। গীতি কবিতা বা আত্মনিষ্ঠ কবিতা আবার কয়েক রকমের হতে পারে। যেমন — (ক) প্রকৃতিবিষয়ক গীতি কবিতা (খ) প্রেমমূলক গীতিকবিতা (গ) ভক্তিমূলক গীতিকবিতা (ঘ) চিন্তামূলক গীতিকবিতা (ঙ) দেশাত্মবোধক গীতিকবিতা। এছাড়া সনেট, প্রশস্তিকাব্য, প্রার্থনা সংগীত , শোকগীতি, ইত্যাদিও গীতিকবিতার মধ্যে পড়ে। নিম্নে এগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল —

(ক) **প্রকৃতি বিষয়ক গীতি কবিতা :**

যে গীতি কবিতায় বিশ্ব প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ইত্যাদি কবির গভীর হৃদয়াবেগের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় তাকে প্রকৃতি বিষয়ক গীতিকবিতা বলে। 'চর্যাপদ', 'মৈমনসিংহ গীতিকা', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' আমরা প্রকৃতি চিত্রনের অজস্র উদাহরণ দেখি, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়ও তার কিছু আভাস পায়। আরও পরবর্তীকালে বিহারীলালের 'নিসর্গ সন্দর্শন' অক্ষয়কুমার বড়ালের 'মধ্যাহ্নে' মোহিতলালের 'কালবৈশাখী' এবং রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় তার নিদর্শন পায়।

(খ) **প্রেমমূলক গীতিকবিতা :**

নরনারীর প্রেম-বিরহ-মিলনকে প্রাধান্য দিয়ে যেসব গীতিকবিতা রচিত হয়েছে তাকে প্রেমমূলক গীতিকবিতা বলে। গোবিন্দদাসের 'আমি তোরে ভালোবাসি', জীবনানন্দ দাসের 'থাকে শুধু অন্ধকার', 'মুখোমুখি বসিবার বনোলতা সেন', রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষায় দিনে' এই জাতীয় গীতিকবিতার উদাহরণ।

(গ) **ভক্তিমূলক গীতিকবিতা :**

যে গীতি কবিতায় কবির ধর্মচেতনা এবং ঈশ্বরের প্রতি কবির গভীর অনুরাগ, আবেগ-অনুভূতি-আকুতি প্রকাশ পেয়েছে তাকে ভক্তিমূলক গীতিকবিতা বলে। রামপ্রসাদের পদাবলী, গোবিন্দদাসের বন্দনাগীতি, রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি', রজনীকান্ত সেনের 'নির্ভর' এই জাতীয় গীতিকবিতা।

(ঘ) **চিন্তামূলক গীতিকবিতা :**

যে কবিতায় কবির জীবনাদর্শ বা কোন ধ্যান-ধারণা তাঁর ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতির সাথে মিশে

একাকার হয়ে প্রকাশ পেয়েছে তাকে চিন্তামূলক গীতিকবিতা বলে। কুমুদরঞ্জনের 'ছোটোর দাবী', কালিদাস রায়ের 'ছাত্রধারা' এই ধরনের কবিতা।

(ঙ) দেশাত্মবোধক গীতিকবিতা :

যে গীতিকবিতায় কবির দেশপ্রেম এবং দেশের প্রতি কবির আবেগ-অনুভূতি ইত্যাদি ব্যক্ত হয়েছে তাকে দেশাত্মবোধক গীতিকবিতা বলে। কাজী নজরুলের 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার', রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' ইত্যাদি।

সনেট :

সনেট এক ধরনের গীতি কবিতা। এই কবিতাই মোট চোদ্দটি পংক্তি থাকে। প্রথম ভাগে থাকে আটটি পংক্তি, তাই একে বলে অষ্টক, আর শেষভাগে থাকে ছয়টি পংক্তি, তাই একে বলে ষটক। রবীন্দ্রনাথ-এর শ্রেষ্ঠ সনেটগুলি পাওয়া যায় 'চৈতালী' ও 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে। এছাড়া তার আরও বহু কবিতায় সনেটের প্রকাশ লক্ষ্যনীয়। প্রমথ চৌধুরীর 'সনেট পঞ্চশৎ', দেবেন্দ্রনাথের 'অশোকগুচ্ছ', মধুসূদনের 'চতুর্দ্দশপদীকবিতাবলী'ও সনেটের উদাহরণ।

প্রশস্তি কবিতা বা ওড বলে :

যে কবিতায় কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি কবির অন্তরের উচ্ছ্বাস গাম্ভীর্যপূর্ণভাবে প্রশস্তির আকারে প্রকাশিত হয় তাকে প্রশস্তি কবিতা বা ওড বলে। মধুসূদনের 'কপোতাক্ষ নদ', 'শ্যামা পক্ষী', বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী', রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা', 'সমুদ্রের প্রতি', 'ক্যামেলিয়া', সত্যেন্দ্রনাথের 'বুদ্ধ পূর্ণিমা', জীবনানন্দের 'সুচেতনা' প্রভৃতি এই জাতীয় কাব্যের উদাহরণ।

প্রার্থনা সংগীত :

যে কবিতায় পার্থিব জগৎ কিংবা আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি বন্দনা গাওয়া হয়েছে তাকে প্রার্থনা সঙ্গীত বলে। সুরদাসের ভজন, কবিরের ভজন, শাক্ত ও বৈষ্ণব কবিদের প্রার্থনা, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলী, গীতিমাল্য, গীতালি পর্বের গানগুলি এই ধরনের।

শোকগীতি :

যে কবিতায় কবির দুঃখ-শোক, বেদনা গভীর আবেগের সঙ্গে ব্যক্ত হয় তাকে শোকগীতি বলে। মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ', বিহারীলালের 'বন্ধুবিয়োগ', অক্ষয়কুমার বড়ালের 'এষা', রবীন্দ্রনাথের 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত', সত্যেন্দ্রনাথের 'কবর-ই-নুরজাহান' এই জাতীয় গীতিকবিতা।

(2) বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় কবিতা :

যে কবিতায় বস্তু জগতের বর্ণনা প্রাধান্য লাভ করে তাকে বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় কবিতা বলে। বস্তুনিষ্ঠ কবিতা আবার কয়েক ধরনের, সেগুলি হল —

(ক) মহাকাব্য (খ) গাথাকাব্য (গ) কাহিনীকাব্য (ঘ) রূপককাব্য (ঙ) কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্য (চ) ব্যঙ্গ কবিতা (ছ) পত্রকাব্য (জ) ছড়া ইত্যাদি।

(ক) **মহাকাব্য :**

মহাকাব্য মিতছন্দে ও বর্ণনাত্মক ভঙ্গীতে রচিত গুরু বিষয়বস্তু আশ্রিত ও সুনির্দিষ্ট আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত এমন এক স্বয়ংসম্পূর্ণ আখ্যান, যার ঐক্য সম্বন্ধ হয় জৈবিক প্রকৃতিতে এবং প্রচুর বৈচিত্র্য সত্ত্বেও যা উদ্দিষ্ট রসানুভূতি জাগাতে পারে। হোমারের 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' বাল্মীকির 'রামায়ণ', বেদব্যাসের 'মহাভারত' ইত্যাদি।

(খ) **গাথাকাব্য :** ময়মনসিংহ গীতিকা বা গোপীচন্দ্রের গান।

(গ) **কাহিনী কাব্য :** 'ধর্মমঙ্গল কাব্য', 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য', মনসামঙ্গল ইত্যাদি।

(ঘ) **রূপক কাব্য :** দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন প্রয়াণ', ঈশ্বরগুপ্তের 'সংসার সমুদ্র'।

(ঙ) **কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্য :** 'রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন', 'বিদায় অভিশাপ', 'মালিনী' ইত্যাদি।

(চ) **ব্যঙ্গ কবিতা :** ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত উদ্ধার' কাব্য, ঈশ্বরগুপ্তের 'অনাচার' ইত্যাদি।

কবিতা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য

কবিতা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। কবিতা শিক্ষাদানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল—

(1) কবিতা রচনার সময় কবির যে অনুভূতি, ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলির প্রতিফলন ঘটে কবিতায়। কবিতাপাঠ কালে শিক্ষার্থীরা তা অনুভব করতে পারে।

(2) কবিতাপাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের সৌন্দর্যনুভূতির বিকাশ ঘটে এবং আত্মিক উন্নতি ঘটে।

(3) কবিতা পাঠের দ্বারা শিক্ষার্থীদের নানারকম অমার্জিত প্রবৃত্তি ও আবেগের উন্নতি ঘটে।

(4) কবিতা পাঠ করলে আমাদের মন এক অলৌকিক আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে।

(5) কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে নান্দনিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে।

(6) ছেদ-যতি, ছন্দ-তাল, গতি অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা পাঠে দক্ষতা অর্জন করে।

(7) কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের ভাব ও কল্পনা শক্তির বিকাশ ঘটে।

(8) কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

(9) কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা কাব্য শৈলী, শব্দচয়ণ রীতি ইত্যাদি অনুভব করতে পারে।

(10) কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের অন্তর্দৃষ্টির জাগরণ ঘটে।

(11) উপমার তাৎপর্য বুঝতে পারে।

(12) কবিতায় বর্ণিত ভক্তিভাব, নিসর্গপ্রেম, দেশপ্রেম, ব্যঙ্গ, শোক ইত্যাদি শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে।

(13) কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে কোনটি সনেট, কোনটি মহাকাব্য, কোনটি রূপক কাব্য-কোনটি কাহিনীকাব্য, কোনটি গীতিকাব্য ইত্যাদি কিছুটা বোঝা যায়।

(14) মানব জীবনের মহৎভাব ও আদর্শগুলি কাব্যপাঠের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

(15) কবিতা পাঠ করে কবিতার বিভিন্ন ভাব সম্পর্কে যে বোধ জন্মায় তা শিক্ষার্থীরা পরবর্তীকালে সৃজনশীলতা বিকাশে কাজে লাগাতে পারে।

- **কবিতা পাঠদানের গুরুত্ব ঃ**

ভাষা বা সাহিত্য পাঠদানের পাশাপাশি কবিতা পাঠদানও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন। বিদ্যালয়ে কবিতা পাঠদানও একটি শিক্ষনীয় বিষয়। কবিতা পাঠের মধ্য দিয়েও শিক্ষার্থীদের নানারকম গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। কবিতা পাঠের গুরুত্ব কোথায় তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

(ক) চাহিদা ও আকাঙ্খার পরিতৃপ্তি ঃ

মানুষের মনে বিভিন্ন কবিদের লেখা কাব্য কবিতা সম্পর্কে জানার আকাঙ্খা জাগে এবং কখনও কখনও সৌন্দর্য পিপাসার আকাঙ্ক্ষাও সৃষ্টি হয়। তখন ঐ কবিদের কাব্য-কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে মানুষ তার চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি করতে পারে।

(খ) সুনাগরিক শিক্ষা ঃ

অনেক কবিতায় দেশের প্রতি ভালোবাসা, জাতীর প্রতি ভালোবাসা, কর্মের প্রতি সততা, দুর্বল শ্রেণীর প্রতি ভালেবাসা, দুষ্ট লোকের প্রতি তিরস্কার ইত্যাদি ধ্বনি হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এগুলি পাঠ করে ভালো শিক্ষা নিতে পারে। উদাহরণ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 'দুইবিঘা জমি', নজরুল ইসলামের 'কুলিমজুর', মধুসূদনের 'জন্মভূমির প্রতি' ইত্যাদির কথা বলা যায়।

(গ) কল্পনা শক্তি বিকাশে সহায়ক ঃ

কবিতা পাঠ করে শিক্ষার্থীদের মনে কল্পনা শক্তির জাগরণ ঘটে। কখনও কখনও বিমূর্ত বিষয় পাঠ করে তাদের মনে মূর্ত কল্পনার জাগরণও ঘটতে পারে। বিশেষ করে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কবিতাগুলি একত্রে বেশী কাজে লাগাতে পারে।

(ঘ) মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে ঃ

কবিতা পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, প্রীতি-ভালোবাসা ইত্যাদি অনুভূতির সাথে পরিচিত হয় যা তাদের মানসিক বৃত্তিগুলির স্ফুরণ ঘটায়। ফলে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে।

(ঙ) ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনে সহায়ক ঃ

কাব্য-কবিতায় বর্ণিত মহাপুরুষদের জীবনী ও বাণী এবং মহৎ আদর্শ-দ্বারা শিক্ষার্থীরা অনুপ্রাণিত হতে পারে। যা তাদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনে সহায়ক হবে।

(চ) সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ ঃ

কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দয়া, মায়া, মমতা, সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা, প্রীতি-ভালোবাসা ইত্যাদি সদ্‌গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। যা পরবর্তীকালে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারে। আবার অসামাজিক প্রবৃত্তিগুলি কমে যেতে পারে।

(ছ) জ্ঞানবৃদ্ধি ঘটে ঃ

কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা ভৌগলিক, ঐতিহাসিক, প্রাকৃতিক ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে পারে।

(8) জাতীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ঃ

অনেক কবিতায় জাতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় ঐতিহ্য, জাতীয় কৃষ্টি, জাতীয় চিন্তাধারা ইত্যাদি বর্ণিত থাকে। সেইসব কবিগুলি পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জন করতে পারে। ফলে জাতীর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা বাড়ে।

(9) টাইম পাস ঃ

দূরপাল্লার গাড়িতে ভ্রমণকালে কিংবা কোন বিশ্রামগারে বসে টাইম পাস করার উপায় হিসাবেও আমরা কবিতা পাঠকে বেছে নিতে পারি।

(10) ছন্দ-তাল-লয় সম্পর্কে ধারণা ঃ

কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে ছন্দ-তাল লয় অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা পড়া শিখতে পারে। ফলে কোন ছন্দ কেমন তাল-লয় অনুযায়ী পড়তে হয় তা তারা আস্তে আস্তে কবিতার সাথে তাল মিলিয়ে পড়তে পারে।

(11) সৃজনশীল সম্ভাবনার বিকাশ ঃ

বিভিন্ন ধরনের কবিতা পাঠ করে শিক্ষার্থীরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তা তাদের সৃজনশক্তির বিকাশে সহায়ক হতে পারে।

- **কবিতা পড়ানোর বিভিন্ন পদ্ধতি :**

কবিতা পাঠদানের নানাবিধ পদ্ধতি আছে। কতকগুলো মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হল।—

(1) গীত ও অভিনয় পদ্ধতি ঃ

শিশু শিক্ষার্থীরা ছন্দ, সঙ্গীত, আবৃত্তি ইত্যাদি খুব পছন্দ করে। এইসব শিক্ষার্থীদের মনোরঞ্জনের জন্য এই পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। কতকগুলো কবিতা আছে যেগুলির গান গেয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। যেমন 'ধনধান্যে পুষ্পেভরা' 'জনগণ মনঅধিনায়ক জয়হে' ইত্যাদি। আবার কিছু কিছু কবিতা আছে যেগুলি অভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে খুব সহজে পৌঁছে দেওয়া যায় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'কচিভাব', রবীন্দ্রনাথের 'দুইবিঘা জমি' ইত্যাদি। বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর কাছে কবিতা পড়া কঠিন বিষয়। তাই কঠিন বিষয় গীত বা অভিনয়ের মাধ্যমে সহজ করে দেওয়া যায়।

(2) অর্থবোধ পদ্ধতি ঃ

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এক্ষেত্রে শিক্ষক কবিতার উৎস ও অর্থ বুঝিয়ে দেবেন। কবিতার মধ্যে যে শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলির অর্থ, ব্যঞ্জনার্থ যদি থাকে সেটি, অলংকার, ছন্দ-মাধুর্য, উপমা, অমূর্ত কল্পনা, উল্লিখিত ঘটনা, চিত্রকল্প ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন।

(3) ব্যাখ্যা পদ্ধতি ঃ

এই পদ্ধতি অনুযায়ী কবিতার অন্তর্গত কঠিন শব্দ, শব্দগুচ্ছ, উল্লেখিত ঘটনা, অলংকারের অর্থ শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে। শিক্ষককে সবসময় মনে রাখতে হবে শিক্ষাথীরা যেন শব্দের অর্থ নয়, কবিতাটি রস ঠিকঠাকভাবে গ্রহণ করতে পারে। কবিতাটি পড়ানোর সময় কঠিন শব্দ বা শব্দগুচ্ছের ব্যাখ্যা অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু এটাই কবিতা পড়ানোর একমাত্র লক্ষ্য নয়। কবিতা পড়ানোর মুখ্য লক্ষ্য হল শ্রেণীর প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে কবিতাপাঠের মধ্যদিয়ে যেন এক অলৌকিক আনন্দের জাগরণ ঘটে যার মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থীদের কল্পনা শক্তি বিকাশ ঘটানো যায়।

(4) ব্যাখ্যা পদ্ধতি বা আলোচনা পদ্ধতি ঃ

আলোচনা পদ্ধতি হল ব্যাখ্যা পদ্ধতি বৃহৎরূপ। ব্যাসকে কেন্দ্র করে যেমন বৃত্তের পরিধি প্রসারিত। তেমন কবিতাকে ব্যাস করে বা কেন্দ্রে রেখে বৃহৎ শিক্ষাদানই হল ব্যাস পদধিতি। কোন কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ, অলংকার, চিত্রকল্পকে বৃহৎ ও বাস্তব জগতে বা অন্যান্য লেখা থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে আনন্দময় পরিবেশের মধ্য দিয়ে কাজ করতে হবে, শিক্ষার্থীদের ধৈর্য্যচুত্যি যেন না ঘটে।

(5) তুলনা পদ্ধতি ঃ

এক্ষেত্রে শিক্ষক একটি কবিতার পাশাপাশি অন্য একটি বা তার বেশী কবিতাকে রাখবেন। এবার পাঠ্য কবিতাটির সঙ্গে ঐ কবিতাগুলির ভাব, সৌন্দর্য, ব্যঞ্জনা, রস, বক্তব্যকে তুলনা করে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন। শিক্ষার্থীরা দুটি কবিতা সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য, ঘটনার যথার্থ ইত্যাদি অনুভব করতে পারবে। যেমন নজরুল ইসলামের 'কুলিমজুর পড়াতে গিয়ে আমরা 'মেথর' কবিতার সাদৃশ্য টানতে পারি।

(6) বিশ্লেষণ পদ্ধতি ঃ

বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে কবির সৃষ্টি কাব্য মাধ্যর্য ও সৌন্দর্য অনুধাবন করা হয়। কবির অনুভূতি ও কবিতার ভাব শিক্ষার্থীদের সাহায্য বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনে ছবি এঁকেও বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের সাথে ধাপে ধাপে প্রশ্ন উত্তর বিনিময়ের মধ্য দিয়ে কবিতায় বিষয়, ভাব, অর্থ, রস বিশ্লেষণ করে দেওয়া যায়।

(7) সংশ্লেষণ পদ্ধতি ঃ

বিভিন্ন সমস্যামূলক প্রশ্ন উৎথাপন ও তার সমাধানের মধ্য দিয়ে কবিতা পাঠদান করা হয়। এই পদ্ধতিতে সম্যাসমূলক প্রশ্নাবলীর মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে কবিতার মূলভাবটি উপলব্ধ হয়।

(8) স্বাদনা পদ্ধতি ঃ

কবিতায় বর্ণিত বিভিন্ন রস-উপলব্ধির মধ্য দিয়ে কবিতার মূলভাব বোঝাই হল এই পদ্ধতির মূল উপজীব্য বিষয়। তাছাড়া কবিতায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ, বাক্য, ঘটনা যুক্তিযুক্ততা ও বাস্তব প্রেক্ষিত ইত্যাদিও এই পদ্ধতিতে অনুধাবন করা যায়।

(9) সংযুক্ত পদ্ধতি ঃ

সংযুক্ত পদ্ধতি হল কবিতা পাঠদানকে সার্থকর করে তোলার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন স্থানে প্রয়োগ করা অর্থাৎ অনেক পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে কবিতার সামগ্রীক পাঠদানকে সার্থক করে তোলা এবং তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে সমস্ত বিষয় বোধগম্য করে তোলা।

কিভাবে কবিতা পাঠদান করতে হবে ঃ

(1) বিদ্যালয়ে পাঠ্যগ্রন্থে নির্বাচিত কবিতাগুলি যেন বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়।

(2) শিক্ষার্থীদের রুচি, সামর্থ চাহিদা অনুযায়ী কবিতা নির্বাচন করতে হবে।

(3) শিক্ষকের কবিতা আবৃত্তি করার অভ্যাস থাকতে হবে।

(4) শিক্ষক কবিতার শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণ করে আদর্শ সরব পাঠ করবেন। ছন্দ-লয় বজায় রেখে পাঠ করতে হবে।

(5) কবিতা পাঠের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। তারপর কবি পরিচিতি ও কবিতাটির উৎস সম্পর্কে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

(6) ছোট ও সহজ কবিতাগুলি আগে পড়াতে হবে। খুব বড় কবিতা হলে ভাগ ভাগ করে পড়াতে হবে।

(7) কবিতা পড়ানো পর্বে শিক্ষককে উপযুক্ত পাঠ টীকা তৈরী করতে হবে। পড়ানোর সময় প্রয়োজনীয় শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করতে হবে

(8) কবিতা আলোচনার সময় অতিরিক্ত ব্যাখ্যা দিলে চলবে না।

(9) ছাত্রদের দিয়ে কবিতা মুখস্থ করা চলবে না।

(10) শিক্ষার্থীদের সামর্থ অনুযায়ী ও বোঝার ক্ষমতা অনুযায়ী ব্যাখ্যা করতে হবে। গভীর রসোপলব্ধি শিশু শিক্ষার্থীদের দ্বারা সম্ভব নয়।

(11) শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য প্রয়োজন ছবি আঁকা, সমভাবাপন্ন কবিতার উদাহরণ প্রভৃতি দেওয়া যেতে পারে।

৪.৭ গদ্য শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য, গুরুত্ব পদ্ধতি :

গদ্যসাহিত্য বিভিন্ন শ্রেণীর হয়। যেমন—

(1) উপন্যাস (2) ছোটো গল্প (3) নাটক (4) প্রবন্ধ (5) জীবনচরিত
(6) ভ্রমণ কাহিনী (7) পত্রসাহিত্য

উপন্যাস আবার কয়েক ধরণের। নিম্নে তা সংক্ষেপে দেখানো হল —

(ক) ঐতিহাসিক উপন্যাস — বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ', রবীন্দ্রনাথের 'বৌধুকুরানীর হাট' ইত্যাদি।

(খ) সামাজিক উপন্যাস — শরৎচন্দ্রের — 'দেনাপাওনা' তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা'প্রভৃতি।

(গ) কাব্যধর্মী উপন্যাস— রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা' প্রভৃতি।

(ঘ) মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস— রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি', বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ'।

(ঙ) আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস — শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'।

এছাড়া পত্রোপন্যাস, দেশাত্মবোধক উপন্যাস, বীরত্ব-ব্যঞ্জক উপন্যাস প্রভৃতি নামে আর কয়েকটি উপন্যাসের শাখা আছে।

ছোটোগল্পের আবার কয়েকটি ভাগ আছে—

(ক) মনস্তাত্ত্বিক ছোটগল্প— রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' 'সমাপ্তি' ইত্যাদি।

(খ) সমাজসম্যাসমূলক ছোটগল্প— রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা', শরৎচন্দ্রের একাদশী প্রভৃতি ।

(গ) প্রেমবিষয়ক ছোট গল্প— রবীন্দ্রনাথের একরাত্রি, প্রভাত মুখোপাধ্যায়-এর 'লেডি ডাক্তার' ইত্যাদি।

(ঘ) হাস্যরসাত্মক ছোটগল্প— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ে 'বউচুরি' বনফুলের 'ক্যানভাসার' ইত্যাদি।

(ঙ) রূপক সাঙ্কেতিক গল্প— রবীন্দ্রনাথের 'তোতাকাহিনী'।

(চ) অতিপ্রাকৃত গল্প— রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ'।

এছাড়া ঐতিহাসিক, ভৌতিক, বিজ্ঞানবিষয়ক ছোটগল্প রয়েছে।

(3) নাটক আবার কয়েক ধরনের হয়

(ক) সামাজিক নাটক— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শোধবোধ', 'গৃহপ্রবেশ', তারাশঙ্করের 'কালিন্দি' ইত্যাদি।

(খ) পৌরাণিক নাটক— ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নরনারায়ণ'

(গ) ঐতিহাসিক নাটক— দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত'

(ঘ) রূপক সাঙ্কেতিক নাটক— রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' 'অচলায়তন', 'ডাকঘর' প্রভৃতি।

এছাড়া গীতিনাট্য,রঙ্গনাট, নৃত্যনাটক, ঋতুবিষয়ক নাটক একাঙ্ক নাটক প্রভৃতি নাটকও আছে।

(4) প্রবন্ধ — কয়েকটি প্রবন্ধ হল— বঙ্কিমের 'বিবিধ প্রবন্ধ', রবীন্দ্রনাথের সভ্যতার সংকট, কালান্তর, প্রমথ চৌধুরির 'তেলনুন লকড়ি' 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দুমুসলমান' প্রভৃতি।

(5) জীবনচরিত— রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, বুদ্ধদেব বসুর 'আমার ছেলেবেলা' প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী' প্রভৃতি।

(6) ভ্রমণ কাহিনী— রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি', 'ঘুরোপযাত্রীর ডায়েরী', সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ প্রভৃতি।

(7) পত্র সাহিত্য— রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রাবলী' প্রভৃতি।

- **গদ্য শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য ঃ**

(1) গদ্য পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সরব পাঠে অভ্যস্ত হবে।

(2) নীরব পাঠের মাধ্যমে গদ্য রচনার মর্মার্থও গ্রহণ করতে সমর্থ হবে।

(3) শিক্ষার্থীরা শব্দ, পদান্বয়, ক্রিয়াপদ ও বাক্যগঠন রীতি সম্পর্কে অবহিত হবে।

(4) গদ্য পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।

(5) তারা ব্যবহারিক জীবনে মৌখিক ও লিখিতভাবে ভাষা ব্যবহারে দক্ষ হয়ে উঠবে।

(6) গদ্যপাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আদর্শ পাঠের বৈশিষ্ট্য (নির্ভুলতা, গতি, উপলব্ধি, অভিব্যক্তি) গুলি আয়ত্ত করতে শিখবে।

(7) গদ্য অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাহিত্য প্রীতি গড়ে উঠবে।

(8) সাহিত্য রসের আস্বাদন করতে সমর্থ হবে।

(9) বিভিন্ন ধরনের গদ্যের গঠনশৈলী সম্পর্কে পরিচিত হবে।

(10) উপযুক্ত গদ্যপাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তাশীলতা, মননশীলতা, সমাজসচেতনতা, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটে।

(11) মহৎ সাহিত্য পাঠের মধ্য দিয়ে মানবজীবনের চিরন্তন সত্য উপলব্ধি করতে পারবে।

গদ্যশিক্ষাদানের গুরুত্ব

প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষাদানের পেছনে কোন না কোন গুরুত্ব কাজ করে। গদ্য শিক্ষাদানও তার ব্যতিক্রম নয়। শিক্ষার্থীদের সামাজিক, ব্যক্তিগত ও সামগ্রীক উন্নয়ণে গদ্য পাঠদান বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। —শিক্ষার্থীদের জীবনে গদ্য পাঠের মাধ্যমে কী কী উন্নতি ঘটতে পারে বা গদ্য শিক্ষাদানের গুরুত্ব কোথায় তা আলোচনা করা হল—

(1) সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ :

গদ্যপাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহিষ্ণুতা, সহানুভূতি, মায়া-মমতা— বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব, মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। সাথে সাথে হিংসা, অসহিষ্ণুতা অসামাজিকতা, আত্মঅহংকার ইত্যাদি অসামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি দূর হতে পারে।

(2) ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনে সহায়ক :

উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প প্রভৃতিতে বর্ণিত মহৎ আদর্শ এবং জীবনকাহিনী ও বিভিন্ন সামাজিক ঘটনা, আদর্শ ইত্যাদি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা ভালোদিকগুলি নিজেদের জীবনে কাজে লাগাতে পারে। ফলে তারা ভালো ব্যক্তিত্ব ও ভালো চরিত্রের অধিকারী হয়ে উঠতে পারে।

(3) মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে :

গদ্যপাঠ করলে শিক্ষার্থীরা আনন্দ-অনুভূতি বেদনা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-ভালোভাষা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তির সঙ্গে পরিচয় লাভ করে। ফলে তাদের মনে সাহিত্য রসাস্বাদনের এক অপূর্ব আনন্দ অনুভূত হয় এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে।

(4) চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি :

গদ্য পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জানবার আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্য পিপাসার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটে। বিভিন্ন নাটক পড়ে অভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আত্মপ্রতিষ্ঠিত হবার আকাঙ্ক্ষা, সৃজনশীলতার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি হয়।

(5) সুনাগরিকশিক্ষা :

বিভিন্ন ধরনের উপন্যাস, ছোটগল্প, পত্রসাহিত্য, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি পাঠ করে শিক্ষার্থীদের সুস্থ ধ্যানধারণা, কর্মের প্রতি সততা, বলিষ্ঠ চিন্তাশক্তি, যুক্তিবোধ, নীতিবোধ, সাবলীল প্রকাশভঙ্গী দেশের প্রতি জাতীর প্রতি ভালোবাসা প্রভৃতি গুণের বিকাশ ঘটতে পারে। ফলে তারা সুনাগরিক হয়ে উঠতে পারে।

(6) জাতীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ :

মাতৃভাষায় রচিত বিভিন্ন উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, ছোটগল্প, পত্রসাহিত্যে বর্ণিত জাতিয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানলাভ করতে পারবে, যদি তারা ঐ শ্রেণীর গদ্যগুলি পাঠ করে।

(7) সময়ের অপচয় রোধ করে :

জীবনের মূল্যবান সময় অযথা অন্যকাজে ব্যয় না করে গল্প-উপন্যাস পাঠ করলে নানা ধরনের শিক্ষালাভ করা যায়। সময়ের অপব্যবহার হয় না, সময়ের অপচয় রোধ করে।

(8) সৌন্দর্যচেতনার বিকাশ ঘটে :

গদ্য সাহিত্যপাঠের ফলে শিক্ষার্থীদের সৌন্দর্য চেতনার বিকাশ ঘটে, রুচিবোধ জন্মায়।

(9) সৃজনশক্তির বিকাশ ঘটে :

নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ থেকে অর্জিত জ্ঞান শিক্ষার্থীরা নিজের জীবনে সৃজনশক্তির বিকাশে কাজে লাগাতে পারে। গল্প লেখা, ডায়েরি লেখা, ভ্রমণকাহিনী লেখা, কবিতা বা ছড়া লেখার মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজের সৃজন শক্তির বিকাশ ঘটাতে পারে।

(10) সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়গুলির সাথে তুলনা ও পার্থক্য করতে পারবে এবং সৃজনশক্তি বিকাশের কাজে লাগাতে পারবে।

(11) শিশুর ক্রমবিকাশে সহায়ক :

গদ্যপাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি, বিচারশক্তি, যুক্তিশক্তি ইত্যাদির উন্নতি ঘটে। ফলে গদ্যপাঠ শিশুর ক্রমবিকাশে সহায়ক হয়ে উঠতে পারে।

(12) প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার সাথে পরিচয় :

নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ তথা সমস্ত সাহিত্যে বিভিন্ন যুগের জীবনযাত্রা, সমাজচিত্র, হাঁসি-কান্না, সুখ-দুঃখ বর্ণিত থাকে।

আবার নতুন আবিষ্কার, নতুন নতুন চিন্তাধারাও সংযোজিত হয় গদ্য মধ্যে এবং সেগুলি পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার সঙ্গে পরিচয় ঘটে।

(13) জীবনকেন্দ্রীক শিক্ষা :

গদ্য পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জীবনকেন্দ্রীক নানা ধরণের শিক্ষা লাভ করতে পারে। জীবনকেন্দ্রীক শিক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থীরা নানা অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে নিজের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এদিক থেকে গদ্য পাঠদানের গুরুত্ব অপরিসীম।

- **গদ্য শিক্ষাদানের পদ্ধতি :**

বাংলা ভাষা পড়ার অভ্যাস যাতে তৈরী হয়, ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা যাতে বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান সংক্রান্ত বই পড়ে যাতে বাংলা লেখার অভ্যাস ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় সেই লক্ষ্য নিয়েই শিক্ষার্থীদের গদ্য শিক্ষাদান করা হয়। মাতৃভাষা তথা যেকোন ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্য পড়া ও লেখা দুইয়ের অভ্যাস গঠনই জরুরি। পড়ার অভ্যাস দুরকমের, যথা— সরব পাঠের অভ্যাস এবং নীরব পাঠের অভ্যাস, একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে সরব পাঠের উপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও সাধারণতঃ শিক্ষার্থীরা যত উঁচু ক্লাসে ওঠে ততই নীরব পাঠের অভ্যাস গঠনের উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাংলা ভাষায় লেখা কোন গদ্যরচনা পড়ে শিক্ষার্থীরা যাতে তার অর্থ বুঝতে পারে এবং সাহিত্য রসাস্বাদন করতে পারে সেদিকে নজর দিতে হবে। শ্রেণী অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের লিখনের ক্ষমতা যাতে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে সেজন্য বিভিন্ন ব্যাকরণের নিয়মাবলী, শব্দ ভাণ্ডার, শব্দ ও বাক্য গঠন পদ্ধতি, সমার্থক শব্দ, বিপরীত শব্দ, বাগ্‌ধারা ইত্যাদির সাথে পরিচয় ঘটাতে হবে এবং তাদের আত্ম রচনায় উৎসাহিত করতে হবে।

ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা গদ্য পড়াবার সময় শিক্ষক কিছু কিছু অসুবিধা সম্মুখীন হয়। যেমন

(i) গদ্যপাঠকালে যখন বিভিন্ন তৎসম শব্দ পড়তে হয় তখন শিক্ষার্থীরা সেগুলির বেশীর ভাগই অর্থ জানে না।

(ii) দৈনন্দিন ব্যবহৃত বাগ্‌ভঙ্গীর সাথে গদ্য রচনার বাক্‌ভঙ্গীর সাথে গদ্য রচনার বাক্‌ভঙ্গীর প্রায়শই পার্থক্য দেখা যায়।

(iii) বার্ণক্রম পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থীদের পঠন শুরু করা হয়। ফলে বানান করে পড়ার অভ্যাস শিক্ষার্থীরা সহজে ত্যাগ করতে পারে না।

(iv) পাঠ্যবইয়ে গৃহীত গদ্য রচনাগুলির কিছুটা থাকে প্রাচীন লেখকদের লেখা, আর কিছুটা থাকে আধুনিক লেখকদের লেখা। কিন্তু প্রাচীন ও আধুনিক রীতি লেখার মধ্যে পার্থক্য থাকে প্রবল। ফলে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রাচীন রীতি অনেক বেশী কঠিন বলে মনে হয়।

(v) অনেক শিক্ষার্থী ঠিকমতো নীরব পাঠ করতে পারে না, কখনও ফিসফিস করে পাঠ করে, কখনও গুণগুণ করে ঠোঁট নাড়িয়ে পড়তে থাকে। ফলে নীরব পাঠের গতি ঠিকমতো বজায় আছে কিনা, বা পড়ায় মনোযোগ আছে কিনা তা বোঝা যায় না।

(vi) বাংলা ভাষা অবহেলিত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেক সময় ভাষা জ্ঞানের অভাব দেখা দেয়।

(vii) বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষার চাপের ফলে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনের বেশী শিখতে আগ্রহ বোধ করে না।

(viii) বাংলা পাঠ্য পুস্তকে এমন প্রবন্ধ থাকে যার অর্থ উপলব্ধি করা শিক্ষার্থীদের পক্ষে কষ্টসাধ্য।

(ix) বিদ্যালয়ে সাহিত্য রসস্বাদন করা যায় এমন গদ্যাংশ পড়ানোর জন্য উপযুক্ত উপকরণ বেশীরভাগ সময় থাকে না।

এইসব অসুবিধা দূর করা জন্য শিক্ষক কতকগুলি পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন — যথা

(ক) শিক্ষক যে গদ্যাংশটি পড়াবেন সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তুলবেন।

(খ) বাংলা গদ্য পড়াবার জন্য শিক্ষক মনোবিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি ব্যবহার করবেন। মনোবিজ্ঞান সম্মতপদ্ধতি ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীরা গদ্যপাঠ করতেও আগ্রহী হবে। শিক্ষককে উপযুক্ত শিক্ষাসহায়ক উপকরণও ব্যবহার করতে হবে।

(গ) শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, রুচি, চাহিদা অনুযায়ী গদ্যরচনা নির্বাচন করে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(ঘ) পাঠ্যপুস্তকে নির্বাচিত গদ্য যাতে সহজ সরল বহুল প্রচলিত শব্দ ব্যবহৃত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(ঙ) বর্তমান শিক্ষায় পরীক্ষা ব্যবস্থার যে ভিত্তি শিক্ষার্থীদের মনে কাজ করে তা যত দূর সম্ভব কমাতে হবে।

(চ) শিক্ষার্থীরা যাতে সাহিত্যগুণ সম্পন্ন গদ্য রচনার প্রকৃত রসাস্বাদন করতে সক্ষম হয় সেজন্য বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী যেমন বিতর্ক, আলোচনা, পাঠচক্র, স্বরচিত গল্প পাঠ প্রচলন করতে হবে এবং বিতর্ক, আলোচনা, সৃষ্টি করতে হবে।

শিক্ষার্থীরা যাতে পাঠাগারে পড়ার অভ্যাস তৈরী করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(জ) শিক্ষার্থীরা যাতে সঠিক সরব ও নীরব পাঠের নিয়ম মেনে পড়াশুনো করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(ঝ) গদ্যশিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের কাছে অত্যন্ত সহজ ও হৃদয়গ্রাহী করার জন্য শিক্ষককে অত্যন্ত সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও ধৈর্য্য সহকারে পাঠদান করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের সঠিক পথের অনুসন্ধান দিতে হবে।

৪.৮ ব্যাকরণ : পদ্ধতি, লক্ষ্য, গুরুত্ব: শিক্ষকের ভূমিকা :

ব্যাকরণ হল ভাষার বিজ্ঞান। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ''যে বিদ্যার দ্বারা কোন ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার স্বরূপটি আলোচিত হয় এবং সেই ভাষার পঠনে, লিখনে এবং কথোপকথনে শুদ্ধরূপে তাহার প্রয়োগ করা যায়, সেই বিদ্যাকে সেই ভাষার ব্যাকরণ বলে।'' ব্যাকরণ হল ভাষার অস্থিমর্জা। ভাষা মনের ভাবকে প্রকাশ করে।

ব্যাকরণ শিক্ষাদানের পদ্ধতি :

ব্যাকরণ শিক্ষাদানের জন্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি রয়েছে। সেগুলি হল (১) সিদ্ধান্ত বা সূত্র পদ্ধতি (২) ভাষা পদ্ধতি (৩) ব্যাকরণ পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি (৪) প্রাসঙ্গিক পদ্ধতি (৫) বিশ্লেষণ পদ্ধতি (৬) অবরোহী পদ্ধতি (৭) আরোহী পদ্ধতি। এই পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল।

(১) সিদ্ধান্ত বা সূত্র পদ্ধতি :

প্রাচীনকাল থেকে বহুদিন পর্যন্ত এই পদ্ধতিটি চলে আসছে। ব্যাকরণ রচয়িতারা সূত্রের মাধ্যমে ভাষার ব্যবহার করেন এবং সিদ্ধান্তে এসে উদাহরণ দেন। তাই একে সিদ্ধান্ত বা সূত্র পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নিয়ম বা সূত্রগুলি মুখস্থ করে। এই পদ্ধতিটি মনোবিজ্ঞান সম্মত নয়। এই পদ্ধতি বহুপ্রচলিত পদ্ধতি হলেও এর কতকগুলি দোষও আছে। ব্যাকরণের নিয়মগুলি বেশীর ভাগই শিক্ষার্থীরা না বুঝে মুখস্থ করে। তাই বেশী দিন মনে থাকে না। ফলে শিক্ষার্থীরা বাস্তব প্রয়োগ করতে পারে না।

(২) ভাষা পদ্ধতি :

এই পদ্ধতিতে কাব্য-সাহিত্য পাঠকালে ভাষাকে বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীদের নানা রকম নিয়মকানুন শেখানো হয়। এই পদ্ধতিতে আলাপ-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, কথাবার্তা লেখা প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামনে ব্যাকরণের নানা প্রসঙ্গ ও সূত্রগুলি তুলে ধরা হয় এবং অনুশীলন করানো হয়। ভাষা শিক্ষার প্রথম দিকে এই পদ্ধতি খুবই কার্যকরী। এই পদ্ধতিতে পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন হয় না। এই পদ্ধতিতে ব্যাকরণের সার্বিক শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়।

(৩) ব্যাকরণ পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি :

এই পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি শ্রেণীর জন্য যে পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত থাকে শিক্ষক তার উপর ভিত্তি করে ধারাবাহিকভাবে পড়াতে থাকেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দ্বারা নিয়মগুলিকে মুখস্থ করিয়ে কাজ চালিয়ে নেন। এক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব কম হলেও শিক্ষার্থীদের পরিশ্রম বেশী করতে হয়। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষার্থী না বুঝে মুখস্থ করে বলে নিয়মগুলি দীর্ঘদিন মনে থাকে না।

(৪) প্রাসঙ্গিক পদ্ধতি :

শ্রেণীকক্ষে ভাষা শিক্ষণ চলাকালীন প্রসঙ্গক্রমে ব্যাকরণের নিয়ম আসলে সেগুলি শিক্ষার্থীদের শিখিয়ে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিকে প্রাসঙ্গিক পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতির উপযোগিতা খুব বেশী। আবার অসুবিধাও আছে। এই পদ্ধতিতে ধারাবাহিকভাবে ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া যায় না। অর্থাৎ কোনটি আগে শেখা দরকার আর কোনটি পরে শেখা দরকার তা এখানে ঠিক থাকে না। প্রসঙ্গক্রমে যে বিষয়গুলি পঠন চলাকালীন আসে না সেগুলি শেখাবার সুযোগ পাওয়া যায় না।

(৫) বিশ্লেষণ পদ্ধতি :

এই পদ্ধতিতে ব্যাকরণের সূত্রগুলি শিক্ষার্থীদের সামনে বারবার বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়। শিক্ষার্থীরা বার বার সূত্রগুলি বিশ্লেষণ করে এবং অর্থ বোঝার চেষ্টা করে। এইভাবে শিক্ষার্থীদের ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া হয়। অবশ্য উচ্চবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা এই পদ্ধতি দ্রুত আয়ত্ত করতে পারলেও নিম্নবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের কাছে এটি খুব কঠিন পদ্ধতি তারা সহজে আয়ত্ত করতে পারে না।

(৬) অবরোহী পদ্ধতি :

বিদ্যালয়ে বহুল প্রচলিত ব্যাকরণ শেখাবার পদ্ধতি হল অবরোহী পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মূল কথা হল সাধারণ থেকে বিশেষের দিকে, বিমূর্ততা থেকে মূর্ততার দিকে উত্তরণ। এই পদ্ধতি যুক্তিবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ সূত্র থেকে বিশেষ সত্যে উপনীত হতে হয় এই পদ্ধতির সাহায্যে। যেমন —

মানুষ মাত্রই মরণশীল
যদু হয় মানুষ।
সুতরাং যদু হয় মরণশীল।

ব্যাকরণেও তেমনি এইভাবে সাধারণ সূত্র থেকে বিশেষসূত্রে উপনীত হওয়া যায় এই পদ্ধতির সাহায্যে। যেমন—

যে সমাসে, পূর্বপদ ও পরপদ কোন পদের অর্থ প্রাধান্য থাকে না, অন্য একটি পদের অর্থপ্রধান হয় তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। দশ (দশটি) আনল (মুখ) যার = দশানন।

এখানে 'দশের (পূর্বপদ) অর্থও প্রধান নয়, আনল (পরপদ)-এর অর্থও প্রধান নয়। বরং 'দশানন' বলতে অন্য একটি পদ 'রাবণ' কে বোঝাছে।

অবরোহী পদ্ধতি বহুকাল থেকে খুব বেশী প্রচলিত হলেও এটি মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নয়। সাধারণত মুখস্থ বিদ্যার উপর নির্ভর করে এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা হয় বলে শিক্ষার্থীরা অমনোযোগী হয়ে পড়ে এবং শ্রেণীকক্ষে নীরব শ্রোতার ভূমিকা পালন করে।

আরোহী পদ্ধতি :

ব্যাকরণ শিক্ষাদানের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হল আরোহী পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ব্যাকরণ শিক্ষাদান করতে হলে প্রথমে পাঠ্যবই থেকে ব্যাকরণের কোনো নিয়ম রূপায়িত হয়েছে এমন কিছু উদাহরণ সংগ্রহ করতে হবে যাতে ঐ নিয়ম সম্পর্কে কিছু তথ্য বের করা যায়। তারপর আস্তে আস্তে সূত্রে উপনীত হতে হবে। এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে কিছু বিশেষ সূত্র থেকে সাধারণ সূত্রে উপনীত হতে হয়। যেমন

রাম মরণশীল
শ্যাম মরণশীল
যদু মরণশীল
সুতরাং মানুষ মাত্রই মরণশীল

ব্যাকরণের সূত্র অনুযায়ী তেমনি

বীনা পাণিতে **যার** (বীনাপাণি)
পূর্বপদ পরপদ

ত্রি (তিনটি) **ভুজ** যার (ত্রিভুজ)
পূর্বপদ পরপদ

পঞ্চ মুখ যার (পঞ্চমুখী)
পূর্বপদ পরপদ

দশ আনন **যার** (দশানন)
পূর্বপদ পরপদ

} অন্যপদ

এখানে দেখা যাচ্ছে বার বার না পূর্বপদের অর্থপ্রধান হচ্ছে, না পরপদের অর্থপ্রধান হচ্ছে, সবসময়ে অন্যপদের অর্থপ্রধান হচ্ছে। আমরা জানি যে সমাসে পূর্বপদ এবং পরপদের অর্থপ্রধান না হয়ে অন্য একটি পদের অর্থ প্রধান হয় তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।

এইভাবে আরোহী পদ্ধতিতে অনেকগুলি উদাহরণ ব্যবহার করে শিক্ষক ধীরে ধীরে সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। এই পদ্ধতিতে মূর্ত থেকে বিমূর্ততায়, বিশেষ থেকে সাধারণে, সরল থেকে জটিল বিষয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে শিক্ষার্থীদের মনে ব্যাকরণের নিয়মগুলি চিরস্থায়ী আসন করে নিতে পারে।

ব্যাকরণ শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

ভাষা হল ভাবের বাহন। আর ব্যাকরণ হল সেই বাহনের বিজ্ঞান। আধুনিক শিক্ষাবিদরা ভাষা শিক্ষা আর ব্যাকরণ শিক্ষাকে আলাদা করে দেখার পক্ষপাতি নন। তাদের মতে শিক্ষার্থীদের এমনভাবে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে হবে যাতে তাদের মনে ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা জন্মায়, অনুরাগ সৃষ্টি হয়। ভাষা শিক্ষার চারটি উদ্দেশ্য। যথা—শুনে বুঝতে পারা, পড়ে বুঝতে পারা, নিজের মনের ভাব অপরকে বলে বোঝানো, লেখার মাধ্যমে নিজের মনেরভাব অপরকে বোঝানো। অর্থাৎ ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে দুধরনের ভূমিকা কাজ করে—একটি হল গ্রহণের ভূমিকা, তার একটি হল প্রকাশের ভূমিকা। গ্রহণের দুটি রূপ শুনে বোঝা আর ভাষার লিখিত রূপ পড়ে বোঝা। প্রকাশের আবার দুটি রূপ শুনে বোঝা, আর ভাষার লিখিত রূপ পড়ে বোঝা। প্রকাশের আবার দুটি রূপ—একটি হল তার কথ্যরূপ আর অপরটি হল তার লিখিত রূপ। কথ্য ও লিখিত রূপকে কেন্দ্র করে ব্যাকরণ শিক্ষাদান খুব বেশী পরিমাণে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কারণ কথ্যভাবে ব্যবহৃত শব্দও বাক্যের গঠনভঙ্গী ও লিখিতভাবে ব্যবহৃত শব্দও বাক্যের গঠনভঙ্গী সম্পূর্ণ আলাদা হতে পারে। ব্যাকরণের লক্ষ্য হল শিক্ষাদানে সঠিক ভাষা ব্যবহারে দক্ষ করে তোলা। স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে ভাষা ব্যবহার করতে শিখলে ভাষার ভুল বা সমস্যা কোথায় তা শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে এবং সমস্যার সমাধানের উপায়ও খুব সহজে খুঁজে পাবে। তাছাড়া শুদ্ধভাবে ভাষা ব্যবহার করতে পারলে শিক্ষার্থীদের মনে ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে সহজে অনুরাগ জন্মাবে। ব্যাকরণ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের যুক্তি ও বিচারশক্তির বিকাশ ঘটানো। তাছাড়া ভাষাও সাহিত্যের সঠিক ব্যবহার শিখলে শিক্ষার্থীদের সৃজনশক্তির বিকাশ সহজে হতে পারে।

- **ব্যাকরণ শিক্ষার গুরুত্ব :**

ভাষার শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাকরণ শিক্ষার গুরুত্ব কতটা সে সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষাবিদগণ বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী মত দিয়েছেন। অনেকে মনে করে আগে মানুষ ভাষার মাধ্যমে কথা বলে এবং পরে ব্যাকরণ শেখে। তবে মাতৃভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষায় কথা বলতে পারদর্শী হতে গেলে ব্যাকরণ শিক্ষার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। আবার ভাষা এবং সাহিত্যকে শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে ব্যবহার করার জন্য ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজন। তাছাড়া নানা দিক থেকে ব্যাকরণ শিক্ষার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। বাংলা ব্যাকরণ শিক্ষাদানের গুরুত্বগুলি হল—

(১) ভাষাকে শুদ্ধভাবে প্রয়োগ করতে হলে ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজন আছে। ব্যকরণের যথাযথ জ্ঞান থাকলে ভাষাকে শুদ্ধ ও সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায়।

(২) ব্যাকরণের জ্ঞান থাকলে কোনো শব্দকে সঠিক স্থানে সঠিক অর্থে ব্যবহার করা যায়।

(৩) ব্যাকরণের জ্ঞান থাকলে আমরা শুদ্ধভাবে বর্ণ বিন্ন্যাস করতে পারি।

(৪) ছেদ যতি চিহ্ন ঠিকঠাকভাবে ব্যবহার করার জন্য ব্যাকরণ শিক্ষার গুরত্ব আছে।

(৫) ব্যাকরণের মাধ্যমে আমাদের সন্ধি শিক্ষাও হয়। সন্ধির মাধ্যমে কোন শব্দ ভাঙতে বা নতুন শব্দ গঠন করতে ব্যাকরণের অবদান কম নয়।

(৬) বিভক্তি ও কারক সম্পর্ক ধারণা পাওয়া যায় ব্যাকরণ শিক্ষার ফলে। বিভক্তি ও কারক দিয়ে পদ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

(৭) ভাষাকে সুসংহত ও ব্যাঞ্জণাময় করতে ব্যাকরণ থেকে আমরা সমাসের জ্ঞান নিতে পারি।

(৮) ছন্দ ও অলংকারের ধারণা পাওয়া জন্য ব্যাকরণের দান কম নয়।

(৯) বাগধারা, পদপরিবর্তন ও অব্যয় নিপাতনের জ্ঞান আমরা ব্যাকরণ শিক্ষার দ্বারা পায়। যার দ্বারা আমরা শব্দকে শুদ্ধভাবে প্রয়োগ করতে পারি।

(১০)বাক্যসংশ্লেষ ও বাক্যবিশ্লেষণ করে অর্থসংকোচন বা প্রসারণ করার জন্য ব্যাকরণের দান কম নয়।

(১১)বাংলা শব্দভাণ্ডার সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে জ্ঞান লাভ করা যায় ব্যাকরণ শিক্ষার মাধ্যমে।

(১২)ভাষাকে দ্রুত অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করা যায় ব্যাকরণ শিক্ষার দ্বারা। তার ফলে কোন ভাষা স্থায়ী হতে পারে।

(১৩)ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে এবং ভাষাকে সুমিষ্ট করতে ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

(১৪)উচ্চারণ দক্ষতা বৃদ্ধি করতে ব্যাকরণ শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

(১৫)বুদ্ধি ও বিচারশক্তিকে শাণিত করার জন্য ব্যাকরণ শিক্ষার গুরুত্ব কম নয়।

(১৬)নিজের ভাষায় ব্যাকরণ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকলে অন্য ভাষায় ব্যাকরণ শেখার আগ্রহ জন্মায় এবং খুব সহজে অন্যভাষার ব্যাকরণ আয়ত্তে আনা যায়।

(১৭)সৃজনাত্মক শক্তির বিকাশে ব্যাকরণ শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

- **ব্যাকরণ শিক্ষাদানে শিক্ষকের ভূমিকা :**

বিদ্যালয়ে ব্যাকরণ পড়াবার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিযুক্ত করতে হবে। ব্যাকরণকে বেশির ভাগ শিক্ষার্থী একটু কঠিনভাবে নেয়। সেই জন্য ব্যাকরণের ক্লাস সাধারণত টিফিনের আগে রাখা জরুরি। ব্যাকরণ যেহেতু ভাষার অস্থিমজ্জা তাই শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা সঠিকভাবে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে হবে। একেবারে প্রথমদিকে শিক্ষার্থীদের ব্যাকরণ শিক্ষার ভিত তৈরী করে নিতে হবে বেশী অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দিয়ে। একজন ব্যাকরণ শিক্ষকের ব্যাকরণের উপর যথেষ্ট দখল ও ব্যাকরণ বোঝানোর ক্ষমতা না থাকলে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। আধুনিককালে তত্ত্বমূলক ব্যাকরণ অপেক্ষা ব্যবহারিক ব্যাকরণের প্রয়োজন বেশী। এ প্রসঙ্গে ব্যাকরণ শিক্ষকের কোন কোন অভিজ্ঞতা থাকা জরুরি তা আলোচনা করা হল।

(১) ব্যাকরণ শিক্ষক ভাষা শিক্ষার স্বার্থে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই শিক্ষার্থীদের শেখাবেন। তার বেশী শেখাবার দরকার নেই।

(২) ব্যাকরণ শিক্ষাকে আকর্ষণীয়, সহজ, সরল করে তোলার জন্য ব্যাকরণ শিক্ষককে আরোহী পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।

(৩) ব্যাকরণ শিক্ষকের ব্যাকরণ সম্পর্কে সামগ্রীক জ্ঞান থাকা আবশ্যক দরকার।

(৪) ব্যাকরণ শিক্ষকের ব্যাকরণ সম্পর্কে বাক্যের ছাঁচ ও তার উচ্চারণ প্রকৃতি নখদর্পণে থাকবে।

(৫) বাংলা ব্যাকরণ যে সংস্কৃত তথা অন্যান্য ভাষার ব্যাকরণ থেকে আলাদা সে সম্পর্কে শিক্ষকের সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

(৬) ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞান থাকা দরকার।

(৭) ব্যাকরণ শিক্ষকের বিভক্তি অনুসর্গ, তৎসম-তদ্ভব, কৃৎ প্রত্যয় তদ্ধিৎ প্রত্যয়, সন্ধি-সমাসের পার্থক্য সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার।

(৮) ব্যাকরণ শিক্ষককে হাতের লেখা স্পষ্ট ও সুন্দর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৯) ব্যাকরণ শিক্ষকের অফুরন্ত ধৈর্য্যের অধিকারী হতে হবে। শ্রেণী শিক্ষণকালে ধৈর্য্যচ্যুত ঘটলে হবে না।

(১০)ব্যাকরণ শিক্ষককে ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারে পারদর্শী হতে হবে এবং শিক্ষা সহায়ক উপকরণগুলি উপযুক্ত সময়ে ব্যবহার করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(১১)বানান ভুল সমস্যা ও তার প্রতিকার কিভাবে করা যায় সে সম্পর্কে ধারণা থাকবে।

(১২)শব্দভাণ্ডার, শব্দের অর্থ পরিবর্তন, ধ্বনি পরিবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষকের জ্ঞান থাকা আবশ্যিক।

(১৩)লিঙ্গ-বচন-সমার্থক শব্দ, সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ ইত্যাদি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকবে।

(১৪)ছেদ-যতি, ছন্দ-অলংকার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকবে ব্যাকরণ শিক্ষকের।

(১৫)ব্যাকরণ শিক্ষক বাক্যগঠন ও বাক্য পরিবর্তনের রীতি-নীতি সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞ হবেন ইত্যাদি।

৪.৯ রচনা শিক্ষাদান ; উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, পদ্ধতি

রচ্ ধাতু থেকে রচনা শব্দটি এসেছে। রচ্ ধাতুর অর্থ হল সৃষ্টি। অর্থাৎ সৃষ্টিশীল লেখা হল রচনা। বাস্তবের কিছু অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নানান উপাদান সমন্বিত কিছু ভাব ও বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানধর্মী, বিষয়ধর্মী, ভাবধর্মী ও গঠনমূলক লেখাই হল রচনা।

- **রচনা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য :**

রচনা শিক্ষাদানের কতকগুলো বিশেষ উদ্দেশ্য আছে যথা—

(১) শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তি ও মননশীলতার বিকাশ ঘটে।

(২) উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করার দক্ষতা জন্মায়।

(৩) সঠিকভাবে বাক্যগঠন করতে শেখে।

(৪) যুক্তি ও বুদ্ধির বিকাশ ঘটে।

(৫) বানান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায়।

(৬) ভাষার বাধুঁনি দিয়ে ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা জন্মায়।

(৭) কোন বিশেষ বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পায়।

(৮) নির্দিষ্ট একটি ভাবকে সংযতভাবে প্রকাশ করতে পারে।

(৯) জগৎ-প্রকৃতি সমাজ মানুষ, ঘটনা সম্পর্কে জানা সুযোগ থাকে।

(১০)শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিমিতিবোধ জন্মায়।

(১১)সহজ, সরল সাবলীলভাবে ভাব প্রকাশের ক্ষমতা জন্মায়।

(১২)শিক্ষার্থীদের সৃজনশক্তির বিকাশ ঘটার সুযোগ থাকে।

(১৩)শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে লেখার ক্ষমতা জন্মায়।

- **রচনা-শিক্ষাদানের নীতি :**

শিক্ষার্থীদের বাংলা রচনা শিক্ষাদান করার সময় কতকগুলি রীতি বা নীতি অনুসরণ করতে হয়।

(১) প্রথমত, শিক্ষার্থীদের মৌখিক রচনা শেখাতে হবে। যখন নির্ভুল ও মৌখিকভাবে রচনা আয়ত্ত করতে শিখবে তারপরে ধীরে ধীরে লেখার প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়াতে হবে।

(২) মৌখিক রচনার সঙ্গে লিখিত রচনার ভাষাগতভাবে এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকে ঘনিষ্ঠ সংযোগ সৃষ্টি করতে হবে। পরে যখন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের রচনা লেখা শেখাবেন তখন আগেকার মৌখিক রচনা থেকে কিছু বিষয়বস্তু লিখতে বলবেন যাতে মৌখিকভাবে ব্যবহৃত ভাষাকে লিখিত রচনায় কাজে লাগাতে পারে।

(৩) শিক্ষার্থীরা যেহেতু সহজাতভাবে ছবি দেখতে এবং গল্প শুনতে খুব ভালোবাসে তাই রচনা লেখা শেখাবার সময় শিক্ষক ছবি ও গল্পের প্রতি তাদের ও আকর্ষণকে কাজে লাগাতে পারে। অর্থাৎ কোন গল্পকাহিনীর উপর ভিত্তি করে রচনা লেখা শেখানো এবং কোন ছবির উপর ভিত্তি করে রচনা লেখা শেখানো যেতে পারে।

(৪) সরল থেকে জটিল নিয়ে যাওয়া, মূর্ত থেকে বিমূর্ততাই নিয়ে যাওয়া, জানা থেকে অজানায় নিয়ে যাওয়া, বিশেষ বিষয় থেকে সাধারণ বিষয়ে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি নীতির উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের রচনা শিক্ষাদান করা হবে এবং বিষয় নির্বাচনও করতে হবে এই নীতিগুলির উপর লক্ষ্য রেখে।

(৫) রচনা লেখার নিয়ম শেখানো অপেক্ষা শিক্ষার্থীরা যাতে নিজে থেকেই রচনা লেখার অভ্যাস গঠন করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৬) শিক্ষার্থীদের মধ্যে নকল করার প্রবণতা দেখা দিলে তা দূর করার চেষ্টা করতে হবে। এজন্য শিক্ষার্থীদের ভাষাগত দক্ষতার উন্নতির জন্য বাংলাভাষার কতকগুলি স্টাইল বা বৈশিষ্ট রীতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

(৭) শিক্ষার্থীদের রচনা রীতির উৎকর্ষ সাধনের জন্য কতকগুলো বিশিষ্ট লেখকের উৎকৃষ্ট রচনা পাঠ করতে বলতে হবে।

(৮) শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করার যে তাগিদ রয়েছে তা প্রকাশ করার সুযোগ দিতে হবে এবং প্রয়োজনে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

- **রচনা শিক্ষাদানের পদ্ধতি :**

রচনা শিক্ষাদানের নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে আধুনিক রচনা শিক্ষাদান পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। বিশেষত বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নিয়ে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে রচনা শিক্ষাদান পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করা হয়। যথা—(১) প্রথম পর্যায় অর্থাৎ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণী, (২) দ্বিতীয় পর্যায় বা মধ্যবর্তী পর্যায় সপ্তম ও অষ্টমশ্রেণী এবং (৩) উচ্চ পর্যায় বা নবম ও দশম শ্রেণী।

(১) প্রথম পর্যায় :

রচনা শিক্ষাদানের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে মূলত শিক্ষার্থীদের মৌখিক রচনার উপর বেশি গুরুত্ব দিতে হয়। মৌখিক রচনা আবার দু-ধরনের হতে পারে একটি হল শিক্ষকের দ্বারা অর্থাৎ শিক্ষকের ভাষা বা পাঠ্যবইয়ের ভাষার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আর অন্যটি হল শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে মৌখিক রচনা নিয়ন্ত্রিত। রচনার ক্ষেত্রে শিক্ষক বাংলা ভাষা ব্যবহারের উপযুক্ত পরিবেশ করে শিক্ষার্থীদের নির্বাচিত বাক্য ব্যবহারে অভ্যস্ত করে তুলবেন। আবার শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে মৌখিক রচনা করার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে অভ্যাস গড়ে তুলবেন। মৌখিক রচনার একটা বিশেষ সুবিধা আছে তা হল শিক্ষার্থীদের ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে ভুল থাকলে সহজে ধরা যায় এবং তা সংশোধন করে দেওয়া যায়।

একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষক কোন একটি ছবি দেখিয়ে সে সম্পর্কে দু-চার কথা বলতে বলবেন। তারপর মৌখিক রচনা ভালোভাবে শিখতে পারলে ঐ মৌখিক রচনার বিষয়বস্তুটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কিছু লিখতে বলবেন এবং তারা যাতে মৌখিক রচনায় ব্যবহৃত ভাষাকে লিখিত রচনায় কাজে লাগাতে পারে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন। লিখিত রচনায় যে সব কঠিন শব্দ ব্যবহৃত হবে প্রয়োজনে শিক্ষক সেগুলি বানান করে দেবেন। লিখিত রচনায় ব্যবহৃত বাক্যের পদবিন্যাস সংক্রান্ত যে সব ব্যাকরণগত জ্ঞানের প্রয়োজন হতে পারে প্রয়োজনে শিক্ষক সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করাবেন।

(২) মধ্যবর্তী পর্যায়ে রচনা শিক্ষাদান পদ্ধতি :

মধ্যবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মৌখিক অপেক্ষা লিখিত রচনার উপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। এ স্তরে শিক্ষার্থীরা যাতে রচনার বিষয়বস্তু ও ভাষা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করে এবং অবিচ্ছিন্ন ভাষা ব্যবহারে কিছুটা দক্ষ হয়ে ওঠে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পরিবর্তনের তিনটি স্তর থাকে। প্রথম স্তরে শিক্ষার্থীরা শিক্ষক বা পাঠ্যপুস্তকের ভাষার কোনরূপ পরিবর্তন না করে সরাসরি ব্যবহার করে। দ্বিতীয়স্তরে বাক্যের পুরুষ, বচন, কাল ইত্যাদির কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়ে শিক্ষকের বা পাঠ্যপুস্তকের নকল করার চেষ্টা করে। আর একেবারে শেষের দিকে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে নিজের ভাষায় কোন গল্প বা অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে শেখে।

এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাধীন রচনা শক্তির বিকাশ ঘটানোর জন্য শিক্ষক কতকগুলো ব্যবস্থা নিতে পারেন।

(১) শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে একটি শিরোনাম বা সংঙ্কেত শব্দ লিখে সেগুলি অবলম্বনে শিক্ষার্থীদের দু-চার লাইন লিখতে বলবেন।

(২) শিক্ষার্থীর রচনা শক্তির বিকাশ ঘটাবার জন্য শিক্ষক তাদের চিন্তা করবার উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেবেন এবং শিক্ষার্থীরা যাতে নিজের চিন্তাভাবনাকে উপযুক্ত শব্দ বা বাক্যের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারে তার জন্য সহযোগিতা করবেন।

(৩) লিখিত রচনায় পদবিন্যাস, অনুচ্ছেদ, বাক্যের গঠন, বক্তব্যের ধারাবাহিকতা প্রভৃতির গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তুলতে হবে এবং এগুলি অনুশীলনের অভ্যাস তৈরী করানোর চেষ্টা করতে হবে।

(৪) শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে ব্যবহৃত শব্দের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

(৫) শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই রচনা লেখার অভ্যাস গঠন করতে পারে সেজন্য শিক্ষক উৎসাহ দেবেন।

(৩) উচ্চপর্যায়ে রচনা শিক্ষাদান পদ্ধতি :

উচ্চপর্যায়ে অর্থাৎ নবম-দশম শ্রেণীতে শিক্ষার্থীরা যাতে মৌখিক রচনা একেবারে বর্জন করে লিখিতভাবে রচনা প্রকাশ করতে পারে সেবিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি ও ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতার যাতে বিকাশ ঘটে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই স্তরে শিক্ষার্থীরা চিত্তকর্ষক কোন ঘটনার বর্ণনা, পরিচিত কোন দৃশ্যের বর্ণনা, শিক্ষার্থীদের কোন সমস্যা, সৃজনমূলক কল্পনাকে উদ্দীপিত করার ৪কোন বিষয় (যেমন তোমার জন্য একটি নদীর আত্মকথা, একটি ভরা পূর্ণিমার রাত, বর্ষমুখর কোন দিন) ইত্যাদি সম্পর্কে যেন সুস্পষ্ট চিন্তাভাবনা করতে পারে এবং উপযুক্ত শব্দ ও বাক্যের সাহায্যে সেগুলি ব্যক্ত করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার্থীরা যাতে স্বাধীনভাবে শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই লিখতে পারে সে বিষয়ে নজর দিতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের রচনা শিক্ষাদানের জন্য যে পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করা যেতে পারে সেগুলি হল—

(১) প্রথমত : এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা কিভাবে রচনার লেখার পরিকল্পনা করবে সে বিষয়ে শিক্ষক প্রয়োজনে তাদের সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীরা যাতে রচনা লেখার সময় উপযুক্ত শব্দ ও বাক্যের প্রয়োগ করতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষক নজর দেবেন। এছাড়া অন্যকোন সমস্যার সম্মুখীন হলে শিক্ষক সর্বান্তকরণে সাহায্য করবেন।

(২) বিষয়বস্তু নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা দিতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে বিষয়বস্তু যেন তাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়।

(৩) শিক্ষার্থীরা রচনা লেখার সময় সূচনা-মধ্যভাগ-সমাপ্তির প্রায় পুরো অংশ নিজস্ব প্রকাশভঙ্গীর মাধ্যমে লিখতে পারে সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে।

(৪) চিন্তামূলক, বর্ণনামূলক, বিবরণমূলক, নটকীয় প্রভৃতি সমস্ত রকমভাবেই যাতে রচনা লিখতে পারে সেজন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

(৫) এই পর্যায়ে রচনা লেখার সময় শিক্ষার্থীরা যাতে অনুচ্ছেদ করে রচনা লিখতে পারে এবং প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদের মধ্যে যেন যোগসূত্র থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৬) শিক্ষার্থীরা যাতে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রচনা লিখতে সক্ষম হয় সেজন্য শিক্ষার্থীদের লিখনের অগ্রগতির সাথে সাথে ধীরে ধীরে শিক্ষক নিজের সাহায্যের পরিমাণ কমিয়ে দেবেন। কারণ শিক্ষার্থীরা যদি নিজে থেকে লিখতে সমর্থ না হয় তাহলে বিশেষ কোন ফল লাভ হবে না।

- **রচনা শিক্ষাদানের গুরুত্ব :**

বিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন রকমভাবে অর্থাৎ কখনও মৌখিকভাবে, কখনও সংক্ষিপ্তভাবে লেখার আকারে আবার কখনও একাধিক অনুচ্ছেদে বৃহৎ আকারে রচনা শিক্ষাদান করা হয়। শিক্ষার্থীদের জীবনে এই রচনা শিক্ষাদানের গুরুত্ব কম নয়। শিক্ষাদানের গুরুত্বগুলি হল—

(১) শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি বিকাশ ঘটে :

বিদ্যালয়ে রচনা শিক্ষাদানের প্রাথমিক, মধ্যবর্তী, উচ্চ-এই তিনটি পর্যায়েই রচনা শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও কল্পনা শক্তির বিকাশ ঘটে। একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে কোন চিত্র দেখিয়ে পাঠ্যবইয়ে পঠিত কোন বিষয় সম্পর্কে দু-চার লাইন বলতে বলা হয়, পরে মধ্যবর্তী ও উচ্চ পর্যায়েও কোন বিষয়, ঘটনা বা সমস্যা সম্পর্কে লিখতে বলা হয়। ফলে শিক্ষার্থীদের চিন্তা বা কল্পনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং সেগুলি বিকাশ ঘটতে পারে। এদিক থেকে রচনা শিক্ষার গুরুত্ব কম নয়।

(২) উপযুক্ত শব্দ ও বাক্য সহযোগ বলা ও লেখার ক্ষমতা জন্মে :

রচনা শিক্ষার মৌখিক বা লিখিত উভয় স্তরেই শিক্ষার্থীরা উপযুক্ত শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করতে শেখে। প্রথমে সমস্যা হতে হতে মৌখিকভাবে কোন বিষয় সম্পর্কে বলতে শেখে। পরে মৌখিক ভাষাকে ধীরে ধীরে সাবলীলভাবে লিখতে শেখে ফলে শব্দ ও বাক্যের গঠন এবং শব্দ ও বাক্যের বিন্যাস সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে অবহিত হয়।

(৩) স্বাধীনভাবে লেখার ক্ষমতা জন্মায় :

রচনা লিখতে লিখতে ধীরে ধীরে শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে লিখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। লিখিত রচনায় শব্দও বাক্যের গঠন, পদবিন্যাস, অনুচ্ছেদ প্রভৃতি মাধ্যমে রচনা লিখতে সক্ষম হবে এবং ভাষার প্রয়োগ সম্পর্কে সামগ্রীক একটা ধারণা জন্মাবে।

(৪) সৃজনশক্তির বিকাশের সহায়ক :

রচনা লেখার মুখ্য উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীরা যেন তাদের মনোভাব, চিন্তাধারা, মতামত স্বচ্ছন্দ, সাবলীল এবং স্বাধীনভাবে ভাষার মাধ্যমে ব্যক্ত করতে পারে তার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া। রচনা লেখার দক্ষতার বিকাশ ঘটলে ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীরা লেখার মাধ্যমে তাদের সৃজনশক্তির বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হবে।

(৫) রচনা লিখনের ফলে শিক্ষার্থীরা ছেদ-যতি-কমা ইত্যাদির ব্যবহার সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে উঠবে। এদিক থেকে রচনা শিক্ষাদানের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

(৬) শিক্ষার্থীদের বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতা, যুক্তি-বুদ্ধির বিকাশে রচনা শিক্ষাদানের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

(৭) রচনা প্রশিক্ষণের ফলে শিক্ষার্থীরা নিজের মনের ভাষাকে সহজ, সরল, প্রাঞ্জলভাবে লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে।

(৮) রচনা শিক্ষাদান শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক হতে পারে।

এইসব কারণে মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে রচনা শিক্ষাদানের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

৪.১০ অনুবাদ শিক্ষার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, পদ্ধতি :

রাষ্ট্র পরিচালনার সুবিধার জন্য ইংরেজরা এদেশে এসে বাংলা ভাষাকে ইংরেজিতে অনুবাদ করার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ার পর ইংরেজী ভাষার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ার পর ইংরেজী ভাষার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবেই বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি ও পরিপুষ্ঠি ঘটেছিল। কাজেই আমাদের দেশে ইংরেজী এবং বাংলা উভয় ভাষা শিক্ষায় একে অপরের সাথে পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। এই ঐতিহাসিক সত্যকে মেনে নিলে আমরা বুঝতে পারব বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ কেন একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''আমার বিশ্বাস, যদি যথোচিত অধ্যাবসায়ের সঙ্গে দুই বৎসর কাল এই অনুবাদ ও প্রত্যনুবাদের পন্থা ধরে ভাষা ব্যবহারের অভ্যাস ঘটানো যায় তাহলে ইংরেজী ও বাংলা দুই ভাষাতেই দখল জন্মানো সহজ হবে''। অর্থাৎ বলা যায় রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষা শিক্ষায় অনুবাদ চর্চার স্থান থাকা উচিত শুধু একথাই যে স্বীকার করেছেন তা নয়, সাথে সাথে তিনি এটিকে অপরিহার্য বলে মনে করেছিলেন। আমাদের দেশে বর্তমানে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হয়। তাছাড়া মাধ্যমিক স্তরেও ইংরেজী শিক্ষার মান অনেকটাই কমে গেছে। যার ফলে ইংরেজী ভাষার উপর শিক্ষার্থীদের এমন কোন দখল জমানো সম্ভব নয় যার সাহায্যে তারা কোন অনুচ্ছেদ ইংরেজী থেকে বাংলায় ভালোভাবে অনুবাদ করতে পারে। সুতরাং বলা যায় যে সঠিক অনুবাদ করতে হলে ইংরেজী ও বাংলা এই দুটি ভাষাতেই বেশ ভাল রকম দখল থাকা দরকার। তাই শিক্ষার্থীদের সহজ-সরল ইংরেজী ভাষায় লিখিত বাক্যগুলি আক্ষরিক অনুবাদ দিয়ে অনুবাদ চর্চা শুরু করা শেখাতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের ভাষা শিক্ষার মান উন্নতি হওয়ার সাথে সাথে তাদের ভাবানুবাদ শেখাতে হবে।

- **অনুবাদ শেখানোর উদ্দেশ্য :**

(১) অনুবাদের অর্থ হল কোন বক্তব্য বিষয়কে একটি ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করা।

(২) অনুবাদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অন্য ভাষায় শব্দার্থ ও ভাবার্থ অনায়াসেই উপলব্ধি করতে পারে।

(৩) অনুবাদ সম্পর্কযুক্ত দুটি ভাষাতেই শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

(৪) অনুবাদ শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন নতুন ভাষা সৃষ্টি প্রবণতা দেখা দেয়।

(৫) শিক্ষার্থীরা অনুবাদ সম্পর্কিত দুটি ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য অনুমান করতে পারে।

(৬) বিদেশি ভাষার শব্দের গঠনভঙ্গী, বাক্য গঠন রীতি প্রভৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাবে।

(৭) শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয় সংহতিবোধ বিকশিত হওয়ার সুযোগ থাকবে।

(৮) অনুবাদ দুটি ভাষার আক্ষরিক বক্তব্যের পাশাপাশি মূলভাব ও রসকে পরিবেশিত করে মননকে সমৃদ্ধ ও প্রসারিত করে।

(৯) ইংরেজী ভাষায় ভাব প্রকাশের ভঙ্গীকে উপলব্ধি করে বাংলা ভাষায় ভাব প্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করা।

- **অনুবাদ শিক্ষার গুরুত্ব :**

মাতৃভাষা তথা বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ করার গুরুত্ব কতটা আছে, আদৌ গুরুত্ব আছে কিনা সে প্রসঙ্গে নানা বির্তকের সৃষ্টি হয়েছে। অনেক শিক্ষাবিদদের মতে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষা শেখানোর জন্য ইংরেজী থেকে বাংলা অনুবাদ অভ্যাস করানোর কোন প্রয়োজন নেই। আবার অনেকের মতে বাংলা ভাষা শিক্ষার পরিধি বাড়ানোর জন্য অনুবাদ শিক্ষার প্রয়োজন। তবে বিতর্ক যতই থাকুক না কেন, মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুবাদ শিক্ষার কতকগুলি গুরুত্ব অবশ্যই আছে। সেগুলি হল—

(১) পাশ্চাত্য প্রযুক্তিকে সহজেই বাঙ্গালীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় :

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির দিকে থেকে পাশ্চাত্যের তুলনায় আমাদের দেশ অনেকটাই পিছিয়ে আছে। পাশ্চাত্য-সাহিত্য, জ্ঞানবিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি প্রায় সমস্ত বিষয় ইংরেজীতে লেখা থাকে। বাঙালীর উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য অগ্রগতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা দরকার। মূলত যে কোন জাতির অগ্রগতি তাদের লিখিত সাহিত্য, জ্ঞানবিজ্ঞানের বইগুলিতে ফুটে ওঠে। তাই পাশ্চাত্য অগ্রগতিকে সহজেই বাঙালীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদের মধ্য দিয়ে।

(২) ভাষার সমন্বয় :

অনুবাদের মধ্য দিয়ে অন্যভাষার শব্দ ও বাক্যগঠন বৈশিষ্ট্য, শব্দভাণ্ডার, প্রবাদ-প্রবচন প্রভৃতি জানা যায়। তাছাড়া ইংরেজী থেকে অনুবাদের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় সৌন্দর্য, প্রয়োগ রীতি, কাঠামো প্রভৃতির উন্নতি ঘটিয়ে সহজেই দুটি ভাষার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায়।

(৩) বিশ্বসাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের সাথে বাঙালীর পরিচয় ঘটানো :

ইংরেজী তথা বিশ্বসাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালীদের পরিচয় ঘটাতে হলে অনুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। সেই কারণে বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ সাহিত্য একটা বিশেষ স্থান দখল করেছে। এছাড়া অনুবাদ সাহিত্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে যথেষ্ট সমৃদ্ধিও করেছে।

(৪) সংস্কৃতির সমন্বয় :

অনুবাদের মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য ভাষার সাথে সাথে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সাথেও আমাদের পরিচয় ঘটে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসা যায় অনুবাদের মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন বিখ্যাত মনীষীদের ভাবনাচিন্তা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় অনুবাদের মধ্য দিয়ে এবং যার মধ্য দিয়ে নিজেদের ভাবনা চিন্তার পরিপুষ্টি ঘটানো ও সমন্বয় সাধন করা যায়।

(৫) বাংলা ভাষায় ভাব প্রকাশের সীমাবদ্ধতা জানা যায় :

বাংলা ভাষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বহু বিদেশী ভাষার শব্দ, বাক্যবিন্যাস কৌশল, বাগধারা, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি ব্যবহার করে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে। ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ করতে গেলে অনেক সময় দেখা যায় ইংরেজী ভাষার অনেক ভাব সরাসরি বাংলায় অনুবাদ করা যায় না। অনুবাদের প্রচেষ্টাকে কাজে লাগিয়ে বাংলা ভাষায় ভাব প্রকাশের সীমাবদ্ধতাগুলি সহজে জানা যায় এবং তার সমাধান করার জন্য এগিয়ে আসা যায়, তাই ভাব প্রকাশের সীমাবদ্ধতাগুলি জানার জন্য অনুবাদের একটা বিশেষ স্থান আছে।

(৬) ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও অনুবাদের বিশেষ গুরুত্ব আছে :

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের খবর সংগ্রহ করে বাঙালীদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য অনুবাদ শিক্ষার প্রয়োজন। পাশ্চাত্য চিন্তাভাবনা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি, আবিষ্কার ইত্যাদি প্রসঙ্গে জানার জন্যও অনুবাদ শিক্ষার প্রয়োজন। এছাড়া সরকারী, বেসরকারী অফিসের অনেক কাজকর্মের ক্ষেত্রে ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এইসব নানা কারণে অনুবাদ শিক্ষার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

- **অনুবাদ শিক্ষাদানের পদ্ধতি :**

শিক্ষার্থীদের অনুবাদ শিক্ষা দিতে গেলে শিক্ষক কতগুলি পদ্ধতি বা রীতি মেনে চলবেন। যেগুলি হল—

(১) শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষায় মোটামুটি দখল জন্মালে এবং ইংরেজী সম্পর্কে কিছুটা ধারণা জন্মালে তবেই অনুবাদ শেখানো আরম্ভ করা উচিত। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়গুলিতে অবশ্য নবম শ্রেণী থেকে অনুবাদ শেখানো হয়।

(২) অনুবাদ শিক্ষণের জন্য প্রথমেই শিক্ষাবিজ্ঞানের নিয়ম মেনে পাঠপরিকল্পনা তৈরী করা উচিত।

(৩) প্রথমেই পাঠ্যক্রমে নির্বাচিত ইংরেজী বই থেকে শিক্ষার্থীদের অনুবাদ করতে দিতে হবে এবং পরে দ্রুতপঠন বই বা অন্যকোন বই থেকে অনুবাদের অংশ নির্বাচন করা যেতে পারে।

(৪) অনুবাদের জন্য নির্বাচিত অংশটি পড়ে তার অর্থ ও ভাব শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

(৫) নির্বাচিত অংশে কোন কঠিন শব্দ বা বাক্যংশ থাকলে তার অর্থ বোর্ডে লিখে দিতে হবে।

(৬) অনুবাদ শেখানোর সময় ইংরেজী ও বাংলা ভাষার বাক্যরীতি পাশাপাশি রেখে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে উভয়রীতি পার্থক্য শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে হবে।

(৭) নীচু শ্রেণীগুলিতে অনুবাদ শিক্ষণকালে শব্দ, বাক্যংশ এবং তারপরে পূর্ণাঙ্গ বাক্যের অনুবাদ শেখাতে হবে।

(৮) অনুবাদ করার সময় শিক্ষার্থীরা যাতে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গী লঙ্ঘন না করে সেদিকে নজর রাখতে হবে।

(৯) প্রয়োজনে অভিধানের সাহায্য নিতে বলতে হবে।

(১০)শিক্ষক অনুকর্মে শিক্ষার্থীদের উন্নত ভাষা ব্যবহার উৎসাহ দেবেন।

(১১)প্রথমে আক্ষরিক অনুবাদ এবং পরে ভাবানুবাদ ও রসানুবাদ শেখাতে হবে। আক্ষরিক অনুবাদ অনুসারে সরাসরি ইংরেজী বাক্যের প্রকাশভঙ্গী অনুসরণ করা হয়। ভাবানুবাদ অনুযায়ী মূল বক্তব্য অনুভব করে নিজস্ব প্রকাশভঙ্গীর মাধ্যমে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়। আর রসানুবাদের ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদকে সাহিত্যরসোত্তীর্ণ হতে হবে। অবশ্য বিদ্যালয় স্তরে রসানুবাদ শেখানো হয় না। কারণ উভয় ভাষায় সম্পূর্ণ দক্ষতা না জন্মালে রসানুবাদ করা সম্ভব নয়।

৪.১১ দ্রুত পঠন : উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, পদ্ধতি

পদ্ধতিগত দিক থেকে পঠন সাধারণত দু প্রকার — (১) সরব পাঠ এবং (২) নীরব পাঠ। বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা শেখার একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা প্রতি শব্দ সরবে বানান করে করে পাঠ করে। কিন্তু শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে ক্রমশ সরব পাঠের চেয়ে নীরব পাঠে প্রয়োজনীয়তা বেশী পরিমাণে দেখা দেয়। কারণ উচ্চ শ্রেণীতে কবিতা, নাটক, গল্প, ব্যাকরণ, প্রবন্ধের পাশাপাশি ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, ইংরাজি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনার মাত্রা বাড়তে থাকে। পড়াশুনার মাত্রা বৃদ্ধি সাথে সাথে তাই পড়বার গতিরও বৃদ্ধি ঘটাবার প্রয়োজন। আর কোন বিষয় দ্রুত গতিতে পড়তে হলে একমাত্র নীরব পাঠের দ্বারাই তা সম্ভব। অর্থাৎ যখন কোন পাঠ্যবিষয় নীরবে এবং দ্রুতগতিতে পড়া হয় তখন তাকে দ্রুতপঠন বলে।

- **দ্রুত পঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :**

বিদ্যালয়ের মাতৃভাষা শিক্ষাদানের জন্য সাধারণত দু ধরণের পাঠ্যগ্রন্থ থাকে — একটি পাঠ্যপুস্তক আর অন্যটি হল সহায়ক পাঠ। পাঠ্যপুস্তক পড়ার ক্ষেত্রে সাধারণত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে হয়, তাই পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠকে অবলম্বন করা হয়। অন্যদিকে সহায়ক পাঠ ও রেফারেন্স বইগুলি পড়ার সময় ব্যাপক বা বিস্তৃত পাঠকেই গ্রহণ করা হয়। ব্যাপক পাঠ করার জন্য শিক্ষার্থীরা দ্রুত পঠনকেই বেছে নেয়। দ্রুত পঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্যগুলি হল—

(১) দ্রুতপাঠে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা থাকে : দ্রুতপাঠের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে অনেক কিছু পড়তে পারে এবং যথাসম্ভব জ্ঞান অর্জন করার সুযোগও এখানে থাকে।

(২) শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি করে : দ্রুত পাঠের দ্বারা শিক্ষার্থীরা নীরবে স্বাধীনভাবে অনেক পড়াশুনা ও জ্ঞান অর্জন করতে পারে। এই পাঠের দ্বারা হাল্কা মেজাজে কম পরিশ্রমে শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি পড়াশুনা করতে পারে। তাই জানার ইচ্ছা থেকে পাঠে আগ্রহও বৃদ্ধি ঘটে।

(৩) সাহিত্য অনুরাগ সৃষ্টি করে : সাধারণত পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পেতে শিক্ষার্থীরা দ্রুত পঠনের সাহায্যে ব্যাপক পাঠের আনন্দ লাভকে পছন্দ করে। দ্রুত পঠনে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে পাঠ করতে পারে। ফলে সাহিত্য অনুরাগ সৃষ্টি হয়।

(৪) আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করে : দ্রুত পঠনের সাহায্যে শিক্ষকের নির্দেশনার গণ্ডি পেরিয়ে শিক্ষার্থীরা আত্মনির্ভরশীলভাবে পড়াশুনা করতে পারে।

(৫) শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকের অতিরিক্ত গল্প, কবিতা বা প্রবন্ধ পাঠে উৎসাহিত হতে পারে।

(৬) কোন গল্পের একাংশ পাঠ করে খুব ভালো লাগলে পুরো অংশ পড়ার ও জানার আগ্রহবোধ করে।

(৭) দ্রুত পঠনের সাহায্যে সাহিত্য ছাড়াও অন্য বিষয় সম্পর্কে জানার আগ্রহবোধ করে।

(৮) নানা বিষয় পাঠ করার ফলে শিক্ষার্থীদের নান্দনিক চেতনা ও রুচিবোধের বিকাশ ঘটে।

(৯) বিভিন্ন প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যুক্তিবোধ ও বিচারশক্তি গড়ে ওঠে।

(১০) পাঠাভ্যাস ও পঠন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় দ্রুত পঠনের সাহায্যে।

(১১) নীরব পাঠে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

(১২) সাহিত্যরস উপলব্ধির সহায়ক ও প্রকাশভঙ্গীর মাধুর্য প্রকাশে সহায়ক।

- **দ্রুত পঠনের গুরুত্ব :**

ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্রুত পাঠের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের পড়ার চাপ এত বেশি হয়ে পড়েছে যে দ্রুত পঠনের খুব প্রয়োজন। তাছাড়া জ্ঞানবিজ্ঞান জগৎ সম্পর্কে দ্রুত জানতে হলে বা শিক্ষা ও সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে দ্রুত পঠনের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি পরিমাণে দেখা দিয়েছে। নানা দিক থেকে দ্রুত পঠনের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। যথা—

(১) অতৃপ্ত রসপিপাসাকে তৃপ্তি করে : শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত যেসব গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, কবিতা, নাটকের অংশ পাঠ করে অনেক সময় তার সম্পূর্ণ অংশ জানার আগ্রহ জন্মায় তাদের মধ্যে। দ্রুত পাঠে খুঁটিনাটি তথ্য পড়ার ঝামেলা থাকে না, জটিল বিষয় পড়ার বাধ্যবাধকতাও থাকে না, ব্যাকরণের ঝামেলা থেকে মুক্ত, শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে পড়াশোনা করতে পারে, কোন শাসন, নিয়মের জাতাজাল বিধি নিষেধ ইত্যাদি থাকে না তাই শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবে পাঠে আনন্দ লাভ করে। আবার দ্রুত পঠনের সাহায্যে খুব দ্রুত পড়াশোনার কাজ চালানো যায়। তাই দ্রুত পঠনের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা তাদের অজানা জগৎকে জানতে আগ্রহবোধ করে এবং অতৃপ্ত রসপিপাসে তৃপ্ত করতে পারে।

(২) রসপিপাসাকে জাগিয়ে তোলা যায় : অনেক সময় সহায়ক পাঠ গ্রন্থে কিছু কিছু আকর্ষণীয় গল্প বা কবিতা সংকলিত থাকে। সেই গল্প বা কবিতাগুলি পড়ার পর শিক্ষার্থীদের মনে নানা রকম জিজ্ঞাসা, কৌতুহল

জন্মায়, নানা আকাঙ্খা ও পিপাসা জাগে। দ্রুত পঠনের দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে রসপিপাসা জেগে ওঠে এবং রসপূর্ণতার জন্য শিক্ষার্থীরা সচেষ্ট হয়।

(৩) উদ্বুদ্ধ রসচেতনাকে পূর্ণতা দান করে : পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়ে যে সাহিত্য রসচেতনার উৎদ্রেক ঘটে দ্রুতপঠন গ্রন্থ পাঠের দ্বারা শিক্ষার্থীরা সেই রসচেতনার পূর্ণতা ঘটাতে পারে। যেমন- পাঠসংকলন গ্রন্থের 'অগ্নিদেবের শয্যা' (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত) গল্পটি পড়ার পর রোমাঞ্চকর কাহিনী পুরোটা জানার জন্য শিক্ষার্থীরা আগ্রহী হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত, চাঁদের পাহাড় সিনেমাটি দেখার পর গল্পকার বা ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণের লেখায় কেমন ছিল ঘটনাটির বর্ণনা তা পড়ার জন্য শিক্ষার্থীদের মনে রসচেতনা জাগ্রত হয় এবং দ্রুত পঠনের দ্বারা সেই রসচেতনাকে তারা পূর্ণ করতে পারে।

- **দ্রুতপঠন শিক্ষাদান পদ্ধতি :**

দ্রুতপঠন পুস্তক পড়াবার জন্য কয়েকটি পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার। এই বইগুলি পড়ানোর মূল উদ্দেশ্য হল নীরব পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পঠিত বিষয়ের অর্থ যাতে খুব দ্রুত বুঝতে পারে তার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া। তাই দ্রুত পঠন বই পড়ানোর জন্য যে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে সেগুলি হল—

(১) উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করতে হবে : দ্রুত পঠন বইগুলিতে সাধারণত ছোটদের উপযোগী কিছু গল্প থাকে। শিক্ষার্থীদের কোন গল্প পড়তে বলার আগে শিক্ষক ঐ গল্পটির কিছু আকর্ষণীয় ঘটনা শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন। তাহলে শিক্ষার্থীরা নিজে থেকে গল্পটি পড়বে এবং গল্পটি পড়ার পর খুব সহজে অন্যের কাছে গল্পটি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। সুতরাং শিক্ষার্থীরা দ্রুতপঠন বই পড়বার আগে শিক্ষক উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করবেন।

(২) পূর্ব রচিত প্রশ্নের সাহায্য গ্রহণ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দ্রুতপঠন পুস্তকের কোন বিষয় পড়তে বলার আগে বোর্ডে কিছু প্রশ্ন লিখে দেবেন এবং শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিষয়টি পড়ে উত্তর দিতে বলবেন। তাহলে শিক্ষার্থীরা দ্রুতপঠন গ্রন্থ পড়তে আগ্রহী হবে।

(৩) নির্ধারিত সময়ের পর পূর্বরচিত প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করা ও সারাংশ লিখন : শিক্ষক বোর্ডে যে প্রশ্ন লিখে দিয়েছিলেন নির্ধারিত সময়ের পর তার উত্তর জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের সহায়তায় পঠিত অংশটির সারাংশ বোর্ডে লিখে দেবেন। শিক্ষার্থীরা বোর্ডে লেখা সারাংশ খাতায় তুলে নেবে।

(৪) কঠিন শব্দের অর্থ অনুমান করে নেওয়ার অভ্যাস গঠন : শিক্ষার্থীরা পড়বার সময় কোন কঠিন শব্দের সম্মুখীন হলে শিক্ষক কখনও পূর্বের পড়া বিষয় থেকে অনুমান করে নেওয়া নির্দেশ দেবেন, আবার কখনও অর্থ বলে দিয়ে সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীদের কঠিন শব্দের অর্থ অনুমান করার অভ্যাস গঠন করতে হবে। তা না হলে শিক্ষার্থীরা পড়বার গতি বৃদ্ধি করতে পারবে না।

(৫) শিক্ষার্থীদের দ্রুতপঠনের গতি বৃদ্ধি করা : শিক্ষার্থীরা যাতে দ্রুতপঠনের গতি বৃদ্ধি করতে পারে সেজন্য শিক্ষক একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যাংশ পড়বার জন্য নির্ধারিত সময়ের মাত্রা আস্তে আস্তে কমিয়ে দেবেন। শিক্ষককে আরও লক্ষ্য রাখতে হবে পড়বার সময় কোন শিক্ষার্থী যেন শব্দ করে না পড়ে তাহলে অন্যের পড়ার ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

এছাড়া আরও কতকগুলি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে—

ক) দ্রুতপঠন শিক্ষককে মনোবিজ্ঞান সম্মতভাবে শিক্ষা দিতে হবে।

খ) দ্রুতপঠন যেন নীরব পাঠের মধ্যদিয়েই সম্পন্ন হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে।

গ) শিক্ষার্থীদের বয়স, আগ্রহ, রুচি, চাহিদা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদির কথা মাথায় রেখেই শিক্ষা দিতে হবে।

ঘ) বিষয়বস্তুর সঙ্গে কবি, লেখক, প্রাবন্ধিকের পরিচয় দিতে হবে।

ঙ) মূল বিষয়বস্তুকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে সেগুলি শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে হবে।

চ) শিক্ষার্থীরা যাতে পাঠে আগ্রহী হয় সেজন্য ভাবগম্ভীর জটিল বিষয়গুলি সুন্দর সহজ সরলভাবে তাদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে।

ছ) পড়ার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগী করে তুলতে হবে।

জ) পাঠদানকালে উপযুক্ত পরিমাণে শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।

ঝ) শিক্ষকের সাহায্য ছাড়া শিক্ষার্থীরা যাতে দ্রুতপঠনের অভ্যাস গঠন করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৪.১২ বানান সমস্যা ও কারণসমূহ এবং প্রতিকারের উপায় :

'বর্ণ' ধাতুর সাথে অনট্ প্রত্যয় যোগ করে 'বর্ণন' শব্দ এবং তার থেকে 'বানান' শব্দটি এসেছে। আসলে বানান হল শব্দকে বিশ্লেষণ করা। বর্ণযোজনার মাধ্যমে গঠিত শব্দের সমাজ অনুমোদিত লিখিত রূপকে আমরা বানান বলি। অর্থাৎ বানান হল কোন শব্দের অস্থি মর্জায় নির্মিত দেহ, আর অর্থ হল শব্দের প্রাণ। প্রত্যেকটি ভাষার মতো বাংলা ভাষারও দুটি রূপ আছে। যথা মৌখিক ভাষা এবং লিখিত ভাষা। মৌখিক ভাষা ব্যবহারের জন্য কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন বা বানানের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু লিখিত ভাষার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করতে হলে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ও বানানের প্রয়োজন হয়। প্রতিটি ভাষার স্থায়ী সাঙ্কেতিক চিহ্ন হল লিপি বা বর্ণমালা। আর লিপি বা বর্ণমালার সাহায্যে শব্দ গড়ে ওঠে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলির বানানের সর্বজন স্বীকৃত ও বিজ্ঞানসম্মত নিয়মকানুন নেই বললেই চলে। বরং বাংলা ভাষার নিজস্ব কতকগুলি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য বাংলা বানানের ক্ষেত্রে নানারকম জটিলতা ও সমস্যা দেখা দিয়েছে। বাংলা বানান সমস্যার পিছনে কতকগুলি কারণ রয়েছে। নীচে সেগুলি বর্ণনা করা হল। যথা—

(১) ভাষাতাত্ত্বিক কারণ : বাংলা বানান সমস্যার ভাষাতাত্ত্বিক কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে কয়েকটি বিশেষ দিক থেকে এই সমস্যার স্বরূপকে বুঝতে হবে। যথা- (ক) বর্ণমালাঘটিত বানান সমস্যা, (খ) ভাষার প্রয়োগরীতি সংক্রান্ত বানান সমস্যা, (গ) ভুল শব্দ প্রয়োগ জনিত সমস্যা, (ঘ) উচ্চারণ ঘটিত বানান সমস্যা।

(ক) বর্ণমালা ঘটিত বানান সমস্যা : আমাদের বাংলা বর্ণমালায় নানান সমস্যা রয়েছে যেগুলি হল—

(i) বাংলা বর্ণমালার সংখ্যাধিক্য : বাংলা বর্ণমালাগুলি মূলত সংস্কৃতকে অনুসরণ করে রচিত। সংস্কৃতে ৫৩টি বর্ণ ছিল। তার থেকে 'ঋ' আর '৯' বাদ দিয়ে বাংলার বর্ণসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫১টি। তাছাড়া বাংলা বর্ণমালায় একাধিক যুক্তাক্ষর রয়েছে। অন্যদিকে ইংরাজি ভাষার বর্ণমালা মাত্র ২৬টি। বাংলা ভাষায় অনেকগুলি বর্ণ থাকায় বর্ণগুলির আলাদা উচ্চারণ মনে রাখা যেমন কঠিন তেমনি প্রায় সমপ্রকৃতির বর্ণগুলির উচ্চারণ পার্থক্যও বোঝা যায় না।

(ii) সমোচ্চারিত বর্ণ ঘটিত সমস্যা : বাংলা বর্ণমালায় প্রায় সমপ্রকৃতির বর্ণগুলির উচ্চারণ পার্থক্য বোঝা যায় না বলে সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন- 'ঙ', 'ঞ', 'ন', 'ণ', 'ম' প্রভৃতি নাসিক্য ব্যঞ্জনগুলি সংস্কৃত ভাষায় উচ্চারণ পার্থক্য নিয়ে উচ্চারিত হতো কিন্তু বাংলা উচ্চারণের কোন পার্থক্য নেই। আবার বাংলায় 'শ', 'ষ', 'স' এই তিনটি শিস্ ধ্বনিরও আলাদা উচ্চারণ নেই। আবার অন্ত:স্থ 'য', বর্গীয়- 'জ' এরও আলাদা উচ্চারণ নেই। ফলে সমস্যা দেখা দেয়।

(iii) যুক্তাক্ষর সমস্যা : এমনিতে ইংরাজি বর্ণমালা অপেক্ষা বাংলা বর্ণমালার সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ, তাতে আবার যুক্তাক্ষরের আকৃতি জটিলতা শিক্ষার্থীদের আরও সমস্যায় ফেলে দিয়েছে। যে বর্ণগুলি নিয়ে যুক্তবর্ণ তৈরী হয় সেগুলির আকার আর তার একক বর্ণের আকার সম্পূর্ণ আলাদা। ফলে বর্ণবিশ্লেষণ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা অনেক সময় বিভ্রান্তিতে পড়ে যায় এবং কষ্টসাধ্য হয়ে যায় তাদের পক্ষে। যেমন- শুক্র/শুক্র (ক্র/ক্র), আবার শত্রু/শত্রু (উচ্চারণ হল শোত্ত্রু) (ত্র/ত্রু)

যদিও বাংলা একাদেমি বানান এসে এই সমস্যা অনেকটাই কমে গিয়েছে।

(iv) সংস্কৃতের মতো বাংলা বর্ণমালা বৈজ্ঞানিকভাবে সজ্জিত। যেমন- হ্রস্ব-'ই', দীর্ঘ-'ঈ', হ্রস্ব 'উ', দীর্ঘ ''ঊ'। কিন্তু সংস্কৃতে উচ্চারণের স্বাতন্ত্র থাকলেও বাংলায় কোনরূপ উচ্চারণ পার্থক্য বোঝা যায়না। তেমনি আবার বর্গের প্রথম এবং তৃতীয় বর্ণগুলি- অল্পপ্রাণ বর্ণ, আর দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণগুলি মহাপ্রাণ বর্ণ, আবার বর্গের প্রথম দ্বিতীয় বর্ণগুলি অঘোষ বর্ণ এবং বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণগুলি ঘোষ বর্ণ। কিন্তু সেগুলি মধ্যেও খুব একটা উচ্চারণ পার্থক্য দেখা যায় না।

(খ) ভাষার প্রয়োগরীতি সংক্রান্ত বানান সমস্যা : বাংলা ভাষা যেহেতু একটি মিশ্র ভাষা তাই বাংলা শব্দভাণ্ডার তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী ইত্যাদির সমন্বয়ে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। তৎসম শব্দগুলির বানান সংস্কৃত ভাষা থেকে অনুসৃত হয়েছে বলে সেখানে সংস্কৃতের নিয়ম রক্ষা করা হয়। কিন্তু সংস্কৃত-এর নিয়ম তদ্ভব, দেশী-বিদেশীর বেলা প্রয়োগ করা যায়না। ফলে নানা কারণে বানান সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

(i) তৎসম থেকে সরাসরি পরিবর্তিত হয়ে যে তদ্ভব শব্দগুলির সৃষ্টি হয়েছে সেগুলির কিছু ক্ষেত্রে ব্যাকরণের নিয়ম রক্ষা করা হলেও সংস্কৃতে যে নাসিক্য বর্ণ ছিল অনেক সময় তদ্ভবে এসে সেই নাসিক্যি বর্ণের পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে তৎসম থেকে তদ্ভবে রূপান্তর করতে গিয়ে অনেক সময় শিক্ষার্থীরা তৎসমে নাসিক্যি বর্ণ যেটা ছিল তদ্ভবে সেটা কি হবে, সেটা নিয়ে সমস্যায় পড়ে। যেমন কৃষ্ণ (কৃষ্ণ) > কানাই/কানু (এখানে মূর্ধন্য-'ণ' পরিবর্তিত হয়ে দন্ত্য-'ন' হয়েছে। কিন্তু ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী 'র'/'ত্র' ফলার পরে মূর্ধন্য-'ণ' বসে, তৎসমে ব্যাকরণের এই নিয়ম রক্ষা করা হয়েছে। আবার তদ্ভবে 'র' ফলা বা তেমন কোন

সমস্যা ছিল না বলে দন্ত্য-ন বসে। ফলে একটা নিয়ম রক্ষা করা হলেও নাসিক্যি ধ্বনির পরিবর্তন জনিত সমস্যা রয়েছে।

তেমনি আবার তৎসম 'শ্রবণ' পরিবর্তিত হয়ে 'শোনা' শব্দটি হয়েছে। ণ > ন

(ii) সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ বাংলা বানান সমস্যার আরও একটি কারণ। একই রকম উচ্চারণ কিন্তু তাদের অর্থ আলাদা। কাজেই এই ধরণের একটি শব্দের অর্থ জানতে গেলে পুরো বাক্যটিই আগে জানতে হবে তা হলে বোঝা যাবে সমোচ্চারিত শব্দগুলির কোনটিকে আসলে বলতে চাইছে। যেমন– শব-মৃতদেহ, সব-সকল

প্রয়োগ — শব নিয়ে যাচ্ছে।

সব নিয়ে যাচ্ছে।

(iii) বানান এবং উচ্চারণের সাদৃশ্য থাকলেও অনেক সময় একটি শব্দের একাধিক অর্থ থাকে। সেক্ষেত্রে পুরো বাক্যটি পড়লে তবেই শব্দটির অর্থ জানা যাবে। যেমন ডাল- গাছের শাখা-প্রশাখা আবার ডাল অর্থাৎ তরকারি বিশেষে

প্রয়োগ — ডালে পাখি বসে আছে।

ডাল-ভাত খাওয়া শরীরের পক্ষে ভালো।

(iv) বাংলা ভাষার দুটি লিখিত রূপ- সাধু এবং চলিত। সাধুভাষায় ব্যবহৃত অনেক শব্দকে অনেক সময় চলিত ভাষায় আর চলিত ভাষায় ব্যবহৃত অনেক শব্দকে অনেক সময় সাধুভাষায় পরিবর্তন করে নিতে হয়। ফলে বানান সমস্যা সৃষ্টি হয়। যেমন সাধু ধূলি > চলিত ধুলা/ধুলো।

(v) সন্ধি, সমাস-প্রত্যয়ের অজ্ঞতার কারণেও আমরা অনেক সময় বানান ভুল করে থাকি।

যেমন সন্ধিজনিত ভুল— সম্ + ন্যাসী = সন্ন্যাসী (সন্ন্যাসী নয়)

দিক্ + অম্বর = দিগম্বর (দিকম্বর নয়)

প্রত্যয় জনিত ভুল— গৈরিক = গিরি + ষ্ণিক্/ইক্ (গিরিক হবে না)

বচ্ + তব্য = বক্তব্য (বচ্তব্য নয়)

সমাস জনিত ভুল— যেমন- হস্তীনীর শাবক = হস্তিশাবক, ছাগীর দুগ্ধ = ছাগদুগ্ধ ইত্যাদি।

(vi) বাংলা বিকল্প বানানও বানান সমস্যা কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংস্কৃত ব্যাকরণের থেকে নেওয়া কিছু তৎসম বিকল্প বানান আছে যেগুলি বাংলা বানান সমস্যার জন্য দায়ি। সেগুলির দু-একটি উদাহরণ হল — কিশলয়/কিসলয়, পাখি/পাখী ইত্যাদি।

(গ) ভুল শব্দ প্রয়োগ জনিত সমস্যা : শিক্ষার্থীরা যেসব বই পড়ে সেগুলির ছাপার অক্ষরে ভুল বানান থাকলে শিক্ষার্থীদের মনে অনেক সময় ভুলটিই গেঁথে যায় এবং সেগুলি তারা মন থেকে মুছতে পারে না।

যেমন—

(i) সর্গ — পরিচ্ছেদ

স্বর্গ — দেবলোক

'মেঘনাদ বধ' কাব্যের ষষ্ঠ সর্গের নাম কি?

ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

(ii) কি/কী

প্রথম 'কি' প্রশ্নবোধক চিহ্ন। অর্থাৎ যখন প্রশ্ন করা হবে এবং তার উত্তর জানতে চাওয়া হবে তখন 'কি' বসবে। যেমন- তুমি কি করছো? তুমি কি স্কুলে যাবে? ইত্যাদি

আর যখন বিস্ময় প্রকাশ করা হবে তখন 'কী' বসবে। যেমন- কী সুন্দর! কী দারুণ! ইত্যাদি।

(iii) ভারি/ভারী

ভারি শব্দের অর্থ হল অত্যন্ত, অত্যাধিক ইত্যাদি।

যেমন- ছেলেটি ভারি সুন্দর!

ভারি দুষ্টু ছেলে তো!

আবার ভারী শব্দের অর্থ হল ওজন বিশিষ্ট বা ওজন বোঝাতে 'ভারী' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

যেমন- দেখতো ব্যাগটা কতটা ভারী হবে?

(iv) লক্ষ্য/লক্ষ

'লক্ষ্য' অর্থাৎ বৃহৎ উদ্দেশ্য বা দেখা।

যেমন- জীবনের লক্ষ্য ঠিক না রাখলে খুব বিপদ।

পরীক্ষা এসে গেল তবুও ছেলেটির পড়াশুনার দিকে লক্ষ্য নেই।

আবার 'লক্ষ' শব্দটি ১০০ হাজার বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন- সে আমাকে এক লক্ষ টাকা দেবে বলল ইত্যাদি।

(ঘ) উচ্চারণ ঘটিত বানান সমস্যা :

(i) বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের বানান উচ্চারণ ভিত্তিক নয়। সেইজন্য শব্দের উচ্চারণের সঙ্গে বানানের সামঞ্জস্যের অভাব থেকেও অনেক ক্ষেত্রে বানান সমস্যার উদ্ভব ঘটে। যেমন- এক (অ্যাক) ও একটি (একটি) এবং একটা (অ্যাকটা)। আবার শেখা (শেখা) কিন্তু মেলা (ম্যালা), খেলা (খ্যালা)। একই রকম দেখতে কিন্তু তাদের উচ্চারণ আলাদা। তাই সমস্যায় পড়তে হয়।

(ii) বাংলা ভাষায় এমন অনেক বর্ণ আছে যেগুলি স্বতন্ত্র কোন উচ্চারণ নেই। তাই অনেক সময় বানান সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন- ই (ঈ), উ (ঊ), খ (ক্ষ), ন (ণ), স (শ), জ (য)। বক্সের ভিতরের বর্ণগুলির কোন স্বতন্ত্র উচ্চারণ নেই।

(iii) আঞ্চলিকতার প্রভাবে অনেক শব্দের বিকৃতি ঘটে যায়। যেমন- লোক>নোক, রামু>আমু ইত্যাদি।

(iv) উচ্চারণের ত্রুটির জন্য অনেক সময় কোন কোন শব্দ স্বতোনাসিক্যিভবন-এর প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন- প্রাচীর > পাঁচিল, হাসপাতাল > হাঁসপাতাল।

(v) আবার অজ্ঞতার কারণ বা উচ্চারণের ত্রুটির জন্য যুক্তাক্ষর সঠিক উচ্চারণ না করতে পারলেও বানান সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন- সম্মান > সন্মান, লক্ষণ > লক্ষ্মণ ইত্যাদি।

(২) মনস্তাত্ত্বিক কারণ :

(i) আগ্রহের অভাব : ছোটো থাকতে শিক্ষার্থীদের বানানের অনুশীলন ভালো করে না করা থাকলে তারা বানান শিক্ষায় ততটা পরিপক্ক হয়ে ওঠে না। ফলে পরবর্তিকালে বানানের প্রসঙ্গ আসলেই তারা নিজেদের দূরে রাখে এবং আগ্রহ অনুভব করে না।

(ii) বানান না লিখে মুখস্থ করা : শিক্ষার্থীদের বানান শেখানোর সময় যদি খাতায় লিখে লিখে অনুশীলন করানো যায় তাহলে দীর্ঘদিন সেই বানান মনে থাকে। কিন্তু বানান না শিখিয়ে শুধু মুখস্থ করালে বেশিদিন মনে থাকে না।

(iii) মনোযোগের অভাব : বানান শেখানোর সময় শিক্ষার্থীরা যদি মনোযোগী না হয় তাহলে বানান শেখানো কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাই বানান শেখানোর সময় শিক্ষার্থীরা যাতে ঠিক-ঠাক মনোযোগী হতে পারে সেদিকে শিক্ষক নজর রাখবেন এবং যে কোন উপায়ে তাদের মনোযোগী করতে হবে।

(iv) মানসিক চাঞ্চল্য : কোন আনন্দ, উচ্ছাস, উত্তেজনা বা কোন বিক্ষোভ সৃষ্টি হওয়া কারণে হঠাৎ শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক চাঞ্চল্য দেখা দিলে জানা বানানও অনেক সময় শিক্ষার্থীরা ভুল লিখে ফেলে। তাই লেখার সময় মানসিক চাঞ্চল্য থাকলে চলবে না, মানসিক স্থিরতা থাকা দরকার।

(v) ভুল বানান দেখেও শিক্ষার্থীরা অনেক সময় দোলাচলে পড়ে এবং কোন বানানটি ঠিক তা অনুমান করতে না পেরে ভুল বানান মাঝে মাঝে লিখে ফেলে।

(৩) পরিবেশ ঘটিত কারণ : পরিবেশের প্রভাবে অনেক সময় শিক্ষার্থীরা নানা ধরনের ভুল করে ফেলে। যেমন—

(i) আঞ্চলিক প্রভাব : আঞ্চলিকতার প্রভাবে শিক্ষার্থীরা অনেক শব্দের উচ্চারণ ভুল করে বা বিকৃত উচ্চারণ করে। যেমন অনেক স্থানে 'র' এবং 'ড়' গুলিয়ে ফেলে। যেমন- 'আমরা'কে বলে 'আমড়া', 'দরজা'কে বলে 'দড়জা'। আবার বাঙ্গালি উপভাষায় 'ড়'-এর উচ্চারণ 'র'-এর মতো হয়। যেমন- বাড়ি/বারি। আবার বাঙ্গালি উপভাষায় 'রাম'কে বলে 'আম' আর 'রস'কে বলে 'অস' ইত্যাদি।

(ii) পাঠ্যবইয়ে ভুল : শিক্ষার্থীরা সাধারণত পাঠ্যপুস্তককে ধ্রুব সত্য বলে মনে করে। তাই স্বাভাবিকভাবে পাঠ্যপুস্তকে কোন ভুল ছাপা থাকলে তার প্রভাব শিক্ষার্থীদের উপর পড়ে এবং স্বাভাবিকভাবেই বানান ভুলের পরিমাণ বাড়তে থাকে।

(iii) শিক্ষকের লেখায় বানান ভুল : শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষককে শ্রদ্ধা করে এবং তাকে অনুকরণ করার চেষ্টা করে। তাই শিক্ষক যদি ব্ল্যাকবোর্ডে বা পরীক্ষিত উত্তরপত্রে মন্তব্য লেখার সময় বানান ভুল করে তার প্রভাবও শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়ে এবং শিক্ষকের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা থেকে তারা এই ভুল করে। কাজেই শিক্ষককে বানান লেখার সময় যথেষ্ট সচেতন থাকতে হবে।

(iv) অক্ষরের অস্পষ্টতা : পাঠ্যপুস্তক অথবা শিক্ষকের লেখায় বানানের অস্পষ্টতা থাকলেও শিক্ষার্থীরা ভুল শেখে।

(v) সমাজের বিভিন্ন স্থানে ভুল : নানা ধরনের বিজ্ঞাপন, পোষ্টার, প্রচার পত্র প্রভৃতিতে ভুল থাকলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দোলাচল দেখা দেয়। কোন শিক্ষার্থীদের মধ্যে যদি উপযুক্ত পরিমাণে বানান শিক্ষার প্রশিক্ষণ নেওয়া না থাকে তাহলে সে ঐ পোষ্টার, বিজ্ঞাপন দেখে বানান ভুল করতে পারে।

শিক্ষার্থীদের লেখায় সাধারণত যে ভুলগুলি দেখা যায় —

(ক) উচ্চারণ জনিত ভুল	**ভুল**	**সঠিক**
আ-কার জনিত ভুল	ব্যাথা	ব্যথা
	ব্যাকারণ	ব্যাকরণ
	ব্যাক্তি	ব্যক্তি
	ব্যাঞ্জন	ব্যঞ্জন
ই/ঈ কার জনিত ভুল	শারিরীক	শারীরিক
	বাল্মিকী	বাল্মীকি
	নিপিড়িত	নিপীড়িত
	জীবীত	জীবিত
উ/ঊ কার জনিত ভুল	ভূল	ভুল
	মুহুর্ত	মুহূর্ত
	পুজা	পূজা
	মুমুর্ষূ	মুমূর্ষু
ন/ণ জনিত ভুল	আহ্নিক	আহ্নিক
	পূর্বাহ্ন	পূর্বাহ্ণ
	প্রাঙ্গন	প্রাঙ্গণ
শ/ষ/স জনিত ভুল	পরিস্কার	পরিষ্কার

	ভুল	সঠিক
	পুরষ্কার	পুরস্কার
	শষ্য	শস্য
	ধ্বংশ	ধ্বংস
ব- ফলা জনিত ভুল	স্বরস্বতী	সরস্বতী
	সত্ত্বা	সত্তা
	উজ্জল	উজ্জ্বল
	সচ্ছ্বল	সচ্ছল
	উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস
	উচ্ছ্বল	উচ্ছল
ত, থ জনিত ভুল	পাকিস্থান	পাকিস্তান
	প্রশস্থ	প্রশস্ত
	মুখস্ত	মুখস্থ
	আশ্বস্থ	আশ্বস্ত
	বিশ্বস্থ	বিশ্বস্ত
ৎ জনিত ভুল	উচিৎ	উচিত
	কুৎসিৎ	কুৎসিত
	উৎপাৎ	উৎপাত
	সত্যজিত	সত্যজিৎ
ট, ঠ জনিত ভুল	যথেষ্ঠ	যথেষ্ট
	ঘনিষ্ট	ঘনিষ্ঠ
	হটাৎ	হঠাৎ
	কাষ্ট	কাষ্ঠ
	অনিষ্ঠ	অনিষ্ট
	স্পষ্ঠ	স্পষ্ট
য- ফলা জনিত ভুল	অনিন্দ	অনিন্দ্য
	অনিন্দ্যনীয়	অনিন্দনীয়
	লক্ষ্যণীয়	লক্ষণীয়

	ভুল	সঠিক
	বৈচিত্র	বৈচিত্র্য
	বুৎপত্তি	ব্যুৎপত্তি
র / ড় জনিত ভুল	আধ-মড়া	আধ-মরা
	ঘড়বাড়ি	ঘরবাড়ি
	তোলপার	তোলপাড়
ঙ / ঙ্গ জনিত ভুল	টাঙা	টাঙ্গা
	ভঙুর	ভঙ্গুর
	টাঙী	টাঙ্গী
	রঙ্গিন	রঙিন
	কাঙ্গালি	কাঙালী
	বাঙ্গালী	বাঙালী
‘ ঁ ’ জনিত ভুল	পাঁপড়ি	পাপড়ি
	কাঁচ	কাচ
	হাঁসপাতাল	হাসপাতাল
‘ং’ জনিত ভুল	অংক	অঙ্ক
	বংগ	বঙ্গ
	সঙ্গা	সংজ্ঞা
ম্ম / ন্ম জনিত ভুল	সন্মান	সম্মান
	সন্মুখ	সম্মুখ
	সন্মতি	সম্মতি
ক্ক / ক্ক জনিত ভুল	ধাক্কা	ধাক্কা
	পক্ক	পক্ক
	আক্কেল	আক্কেল
	নিক্কন	নিক্কন
ক্ষ / ক্ষ্ম জনিত ভুল	যক্ষ্ম	যক্ষ

	ভুল	সঠিক
	পক্ষ্ম	পক্ষ
	যক্ষা	যক্ষ্মা
	লক্ষ্মণ (চিহ্ন)	লক্ষণ
	লক্ষণ (রামের ভাই)	লক্ষ্মণ
সন্ধি জনিত ভুল	দুরাবস্থ	দুরবস্থা (দুঃ + অবস্থা)
	নিরোগ	নীরোগ (নিঃ + রোগ)
	অত্যাধিক	অত্যধিক (অতি + অধিক)
	মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট (মনঃ + কষ্ট)
	বাগেশ্বরী	বাগীশ্বরী (বাক্ + ঈশ্বরী)
সমাস জনিত ভুল	যোগীগণ	যোগিগণ
	অহোরাত্রি	অহোরাত্র
	নিরপরাধী	নিরপরাধ
	রাজাগণ	রাজগণ
	দিবারাত্র	দিবারাত্রি
প্রত্যয় জনিত ভুল	পৌরহিত্য	পৌরহিত্য
	বাহুল্যতা	বাহুল্য, বহুলতা
	সখ্যতা	সখ্য / সখিত্ব
	দারিদ্রতা	দারিদ্র, দরিদ্রতা
	সৌজন্যতা	সৌজন্য / সুজনতা

- **বানান ভুল প্রতিকারের উপায় :**

শিক্ষার্থীদের বানান ভুল নিবারণের জন্য সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন মাতৃভাষা শিক্ষক তথা বাংলা ভাষা শিক্ষক। শিক্ষার্থীরা যাতে বানান ভুলের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমাতে পারে তার জন্য শিক্ষক যে যে ব্যবস্থা নিতে পারেন সেগুলি হল —

(i) শিক্ষার্থীদের বানান শেখানোর সময় শিক্ষক মনে রাখবেন যে শিক্ষার্থীদের বয়স শ্রেণী ও সামর্থ অনুযায়ী কিন্তু বানান তাদের শেখাতে হবে; বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সমস্ত বানান শেখানো তার উদ্দেশ্য নয়, তাই বানান শেখাবার সময় শ্রেণী ও বয়সের উপযোগী একটি শব্দ তালিকা তৈরী করবেন।

(ii) শিক্ষার্থীদের শ্রেণীর অনুপযোগী শব্দের বানান শিক্ষক শেখাবেন না। তিনি বানান শেখানোর সময় সহজ থেকে ধীরে ধীরে কঠিন বানান শেখাবার চেষ্টা করবেন।

(iii) বানান শেখাবার সময় শিক্ষক নজর রাখবেন যে, শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি এবং পেশী যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে কিনা। এই তিনের সমন্বয়েই সার্থক বানান শিক্ষা সুসম্পন্ন হয়।

(iv) বানান শিক্ষা দেবার সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে বারবার অনুশীলন করিয়ে নেবেন। তাহলে সেই বানান শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন মনে রাখতে পারে।

(v) শিক্ষক যান্ত্রিকভাবে বানান শিক্ষা দেবেন না। কখনও খেলাচ্ছলে, কখনও আনন্দময় পরিবেশের মধ্য দিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বানান শিক্ষা দেবেন।

(vi) শিক্ষার্থীদের বিচ্ছিন্নভাবে বানান শিক্ষা না দিয়ে শব্দগুলি বাক্যের পটভূমিতে স্থাপন করে বানান শিক্ষা দিতে হবে। কখন কখন শব্দগুলি প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের বাক্য রচনা করতে বলতে হবে।

(vii) ব্ল্যাকবোর্ডে লেখার সময় শিক্ষককে সচেতনভাবে লিখতে হবে যাতে বানান ভুল না হয়।

(viii) বাংলা ব্যাকরণ পড়াবার সময় শিক্ষক ব্যাকরণে বানান সংক্রান্ত যে সব নিয়মাবলী রয়েছে তা শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দেবেন।

(ix) পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করার সময় নির্ভুলভাবে ছাপা পাঠ্যপুস্তক যাতে মনোনীত হয় সেদিকে বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে।

(x) নিম্ন শ্রেণী থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাংলা অভিধান ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে, যাতে সমস্যায় পড়লেই তারা অভিধান দেখে চটপট সমস্যার সমাধান করে নিতে পারে।

(xi) তৃতীয় শ্রেণীর পর থেকে শিক্ষক বানান শেখানোর জন্য শ্রুতিলিখন পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে। বানান শিক্ষার পিছনে শ্রুতি লিখনের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। শ্রুতি লিখনকে শিক্ষামূলক ও পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

(xii) বানান শিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের কাজে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য শিক্ষক ক্রীড়াভিত্তিক পদ্ধতির সাহায্য নিতে পারেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রথমে বোর্ডে একটি শব্দ লিখে দেবেন। তারপর ঐ শব্দের অক্ষরগুলির সাহায্যে নতুন শব্দ গঠন করতে বলবেন। যে যত বেশী শব্দ গঠন করতে পারবে সে বেশী নাম্বার পাবে। কিন্তু বানান ভুল করলে নাম্বার কাটা যাবে।

(xiii) উচ্চারণের ত্রুটির জন্য যে বানানগুলি ভুল হয় সেগুলি স্পষ্ট উচ্চারণ করে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন।

যেমন- কাঁচ নয় কাচ,

হাঁসপাতাল নয়, হাসপাতাল

নিরপরাধী নয়, নিরপরাধ

দারিদ্রতা নয়, দারিদ্র বা দরিদ্রতা ইত্যাদি।

(xiv) লিখতে গিয়ে যেসব বানান ভুল করে ফেলে কিন্তু উচ্চারণ পার্থক্য থাকে না সেগুলি কখনও বাক্য রচনা করে, কখনও বোর্ডে লিখিয়ে অনুশীলন করে, কখন অর্থ বলে দিয়ে অভ্যাস করাতে হবে।

যেমন- 'ভুল' বানানে দীর্ঘ-ঊ ('ূ') কার দিলে বানানটিই হয় ভুল। ব্যাথা বানানে 'আ' কার দিলে লাগে বড় ব্যথা ইত্যাদি।

তেমনি শব/সব, কূজন/কুজন, পুরস্কার, পরিষ্কার, মুহূর্ত, বাল্মীকি ইত্যাদি।

(xv) শিক্ষার্থীদের সন্ধি, সমাস, প্রত্যয় প্রভৃতি বিষয় সংক্রান্ত নিয়মগুলি ভালোভাবে শেখাতে হবে।

(xvi) বানান শেখানোর জন্য শিক্ষক প্রয়োজনে spelling drill এবং ব্যবহার করতে পারেন।

(xvii) শিক্ষার্থীদের কোন একটি বড় শব্দের বর্ণগুলির সাহায্যে নতুন শব্দ গঠন করতে বলতে হবে।

(xviii) শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাতে হবে।

(xix) বানান শেখার সময় বানান ভুল করা যে খুব লজ্জাকর ও ঘৃণার ব্যাপার এই মনোভাব যেন শিক্ষার্থীদের মধ্যে তৈরী না হয় তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

(xx) বানান শেখানোর সময় ব্ল্যাকবোর্ডের সঠিক ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষক কঠিন শব্দগুলির বানান সুস্পষ্টভাবে বোর্ডে লিখে দেবেন।

(xxi) শিক্ষার্থীদের লেখায় বানান ভুল থাকলে শিক্ষক সহানুভূতির সঙ্গে সংশোধনের ব্যবস্থা করবেন।

(xxii) যুক্তাক্ষরগুলির বানান এবং উচ্চারণ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকার উপর শিক্ষক গুরুত্ব আরোপ করবেন।

৪.১৩ সাহিত্যানুশীলনমূলক কর্যাবলী প্রয়োজনীয়তা :

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষার রসোপলব্ধির সহায়করূপে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রকার সাহিত্যানুশীলনমূলক কার্যাবলী প্রচলন করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কারণ বিদ্যালয়ে সাহিত্যানুশীলন কার্যাবলীর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। সেগুলি হল—

(1) পুঁথিগতভাবে কাব্য ও সাহিত্য পাঠ করে শিক্ষার্থীরা সব সময় উপযুক্ত রসোপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু আবৃত্তি বা অভিনয়ের মধ্য দিয়ে রসোপলব্ধি অনেকটা সহজ হয়ে ওঠে।

(2) পরীক্ষা-ব্যবস্থার চাপে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ্যালয়ে কাব্য ও সাহিত্যের রসাস্বাদনের উপযোগী পাঠদান করা সম্ভবপর হয় না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের সাহিত্য রসোপলব্ধির সহায়করূপে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রকার সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী প্রচলন করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

(3) মাঝে মাঝে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর মধ্যদিয়ে বিদ্যালয়ের নিয়মিত পড়ার চাপ থেকে শিক্ষার্থীরা মুক্তি পেতে পারে।

(4) এই ব্যবস্থার মাধ্যমে আনন্দপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা আনন্দ লাভ করে।

(5) আনন্দপূর্ণ পরিবেশে এবং স্বাগ্রহে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাগ্রহণ করে বলে এই শিখন দীর্ঘদিন যাবৎ মনে থাকে।

(6) মাতৃভাষায় রচিত কাব্য-সাহিত্যের উপর নাট্যাভিনয়-আবৃত্তি-আলোচনা করলে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনে সহায়ক হয়ে ওঠে।

(7) সাহিত্যানুশীলন কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৌন্দর্য সৃষ্টির আকাঙ্খা, সৌন্দর্য-সম্ভোগের আকাঙ্খা, মানসিক চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটে।

(8) এই ধরনের কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উন্নত ও পরিমার্জিত রুচিবোধের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া মাতৃভাষায় রচিত কাব্য ও সাহিত্যের উপর সাহিত্যানুশীলনমূলক কার্যাবলী প্রচলন করলে শিক্ষার্থীদের মানস জীবনের উপর যা প্রভাব বিস্তার করে অন্য কোন ভাষা সাহিত্যে উপর তা করলে ততটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

(9) সাহিত্যানুশীলনমূলক কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের সৃজনশক্তির বিকাশ ঘটবে।

- **সাহিত্যানুশীলনমূলক কার্যাবলীর প্রকারভেদ :**

সাহিত্যানুশীলনমূলক কার্যাবলীর কয়েকটি উদাহরণ হল—

(1) আবৃত্তি (2) বিতর্ক (3) আলোচনা (4) অভিনয় (5) নাটক-আবৃত্তি (6) বক্তৃতা (7) গল্প-উপন্যাস নাটীকরণ (8) সাহিত্য বৈঠক (9) দেওয়াল পত্রিকা (10) চিত্র সংকলন (11) মুদ্রিত পত্রিকা (12) সাহিত্য সংঘ (13) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (14) সংগীত (15) চিত্রাঙ্কন (16) সাহিত্য প্রতিযোগিতা (17) সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা।

(1) আবৃত্তি :

ছোট থেকেই ছড়া বা আবৃত্তির তাল-ছন্দ-দোলালাগার প্রতি শিশুদের একটা ভাব-ভালোবাসা-ভালোলাগা থাকে। আবৃত্তি হল এক ধরণের আর্ট। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের যদি উপযুক্তভাবে কবিতা আবৃত্তি করতে শিক্ষা দেওয়া যায় তাহলে কবিতা পড়ে তারা প্রচুর আনন্দ পাবে এবং কবিতার অন্তর্নিহিত রস আস্বাদন করতে সক্ষম হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে এবং ছন্দ-লয় বজায় রেখে কবিতা আবৃত্তি করতে পারে সেজন্য শিক্ষক উপযুক্ত শিক্ষা দেবেন। কবিতা পড়ার সময় কোথায় কোন শব্দের উচ্চারণ কেমন করে করতে হবে, কোথায় টান দিতে হবে, কোথায় লঘু, কোথায় গুরু কণ্ঠস্বর দরকার, কোন কবিতায় কোন লয় থাকবে তেমনভাবে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দেবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক কখনও রেকর্ডিং ব্যবহার করতে পারেন। আবার কখনও কখনও বিদ্যালয়ে কবিতা আবৃত্তির ক্লাসের আয়োজন করা ভালো। এ প্রসঙ্গে আরও ভালো কাজ হতে পারে যদি মাঝে মাঝে আবৃত্তি প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয় এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা আবৃত্তিতে অংশ নেয়। তাহলে তাদের নিজে থেকে আবৃত্তি শেখার প্রতি একটা আগ্রহ জন্মায়।

(2) বিতর্ক :

কোন এক বিশেষ বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে বাকযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অপরের বক্তব্যকে খণ্ডন করে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করার নামই হল বিতর্ক। সাধারণত অল্প বয়সি শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরণের বাক্-বিতর্ক করতে ভালোবাসে। এই ধরণের বিতর্কে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের বোধবুদ্ধি, প্রত্যুক্তপন্নমতিত্ব,

বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা, যুক্তিবোধ প্রভৃতির বিকাশ ঘটে। সেই জন্য বিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে বিভিন্ন রকম বিষয়কে কেন্দ্র করে বিতর্কের আয়োজন করা দরকার। অবশ্য শিক্ষার্থীদের বয়স আগ্রহ-বুদ্ধি অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করা দরকার। তাহলে তাদের বুদ্ধির বিকাশ ঘটবে এবং জ্ঞান ভাণ্ডারও বৃদ্ধি পাবে।

(3) আলোচনা :

কোন একটি বিশেষ বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক মত বিনিময় করাকে আলোচনা বলে। ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দেশপ্রেম, সামজিক, রাজনীতি-ধর্মনীতি ইত্যাদি বিষয়ের উপর কোন একটি টপিক নির্বাচন করে বিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা সভার আয়োজন করা উচিত। এক্ষেত্রে আলোচনার বিষয়বস্তু আগে থেকে নির্বাচন করা থাকবে। শিক্ষার্থীরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে এবং ঐ আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর স্বচ্ছ ধারণা জন্মাবে এবং তাদের চিন্তাশক্তি, বিচারশক্তি ও বুদ্ধির বিকাশ ঘটবে।

(4) অভিনয় :

বিদ্যালয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান খুবই কার্যকরি। পদ্ধতি অভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান করলে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, মনোযোগ প্রভৃতির বিকাশ ঘটে এবং শিক্ষার্থীরা আনন্দলাভ করে এবং সহজের ঐ পাঠ্য বিষয়ের রস-উপলব্ধি করতে পারে। সাহিত্যে বর্ণিত বিভিন্ন নাটক, গল্প, ঐতিহাসিক ঘটনা প্রভৃতি থেকে বিভিন্ন বিষয় নির্বাচন করে নাটক মঞ্চস্থ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করবে এবং অভিনেতা-অভিনেত্রী ও দর্শকদের পারস্পরিক সহযোগিতায় নাটক অনুষ্ঠানগুলি সাফল্য মণ্ডিত হয়ে ওঠে। অভিনয় দর্শনকালে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না-বেদনা-অনুভূতির সঙ্গে শিক্ষার্থীরা একাত্মতা লাভ করে এবং সহজে নাট্য বিষয়ের রস উপলব্ধি করতে পারে।

(5) নাটক-আবৃত্তি :

সাধারণত কাব্য-নাট্যের ক্ষেত্রে আবৃত্তির মাধ্যমে নাটকাভিনয় করা হয়। এক্ষেত্রে নাটক আবৃত্তির জন্য পাঠকের স্পষ্ট উচ্চারণ ক্ষমতা ও নিজ কণ্ঠস্বরের উপর উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন এবং নাট্য বিষয়ের অন্তর্নিহিত ভাবকে উপলব্ধি করার উপযুক্ত ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। তা না হলে সেই শিক্ষার্থীরা উক্ত নাট্য-কাব্যে আবেদন দর্শক শ্রোতাদের মধ্যে সঠিকভাবে পৌছে দিতে পারবে না। তাই প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নাটক আবৃত্তি করার শিক্ষা দেওয়া দরকার। তাহলে দর্শক-শ্রোতা উভয়ের খুব সহজেই নাট্য-কাব্য বা কাব্য-নাট্যের রস উপলব্ধি করতে পারবে।

(6) বক্তৃতা :

বক্তৃতাও এক ধরণের শিল্প কর্ম। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কিভাবে বক্তৃতা দিতে হয় প্রয়োজনে তার দু-একটা নমুনা তাদের সামনে উপস্থিত করবেন। শিক্ষক বিভিন্ন মণীষীদের দেওয়া বক্তৃতার রেকর্ডিংও ব্যবহার করতে পারেন শিক্ষা সহায়ক উপকরণ হিসাবে। শিক্ষক বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা দান করবেন। বিভিন্ন উপমা-উদ্ধৃতি, ব্যঙ্গ-কৌতুক, যুক্তি-তর্কের মধ্য দিয়ে কোন একটা বিষয়কে উপলক্ষ্য করে শিক্ষার্থীরা তাদের বক্তৃতা কার্য সম্পন্ন করবে। বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ ক্ষমতার বিকাশ ঘটে, বক্তব্য পরিবেশন করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ ঘটে।

(7) গল্প-উপন্যাস নাটকীকরণ :

শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যবই থেকে গল্প-উপন্যাসের বিষয় সংগ্রহ করে নাট্যরূপ দিতে বলা হয়। ঐ গল্প-উপন্যাসগুলিতে মানব জীবনের বিচিত্র ঘটনার বর্ণনা দেওয়া থাকে। শিক্ষার্থীরা উক্ত বিষয়ে বর্ণিত ঘটনার উপর নাট্যরূপ দেওয়ার চেষ্টা করে। ফলে গল্প-উপন্যাসে বর্ণিত কোন ঘটনার নাট্যরূপ দিলে ঐ ঘটনার স্বরূপটি শিক্ষার্থীরা খুব সহজে উপলব্ধি করতে পারে।

(8) সাহিত্য বৈঠক :

সাহিত্য সম্পর্কিত কোন বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য যে সভা অনুষ্ঠিত হয় তাকে সাহিত্য বৈঠক বলে। সাহিত্যের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে মাঝে মাঝে এই ধরণের বৈঠকের আয়োজন করতে পারেন। সাহিত্য শিক্ষকের পরিচালনায় এই ধরনের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বয়স ও ক্ষমতানুযায়ী ছোটগল্প বা উপন্যাসের কোন চরিত্র পর্যালোচনা, ঘটনার সার্থকতা, নামকরণের সার্থকতা, নাট্যাংশের নাটকীয়তা বিচার, কবিতার রসাস্বাদনমূলক আলোচনা ইত্যাদি বিষয় নির্বাচন করে দেবেন এবং শিক্ষার্থীরা তার উপরে আলোচনা করবে। এই ধরণের আলোচনা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাহিত্যের গুণাগুণ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অবহিত হতে পারে এবং শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি ও বিচারশক্তির বিকাশ ঘটে।

(9) দেওয়াল পত্রিকা :

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা একত্রিতভাবে কিংবা শ্রেণীর অনুযায়ী বাৎসরিক, মাসিক কিংবা পাক্ষিক ভাবে এক বা একাধিক দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ করতে পারে। শিক্ষার্থীরা যাতে ছবি, গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী, সমালোচনা, নক্সা ইত্যাদি দিয়ে দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ করে তার জন্য শিক্ষক তথা সাহিত্য শিক্ষককে বেশি মাত্রায় সচেষ্ট হবে। শিক্ষক যেমন শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা দান করবেন তেমনি আবার আগ্রহী সমস্ত শিক্ষার্থী যাতে এ বিষয়ে অংশ নিতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষক উপযুক্ত সুযোগের ব্যবস্থা করবেন। দেওয়াল পত্রিকা শিক্ষার্থীদের সাহিত্য রস উপলব্ধি করতে সহায়তা করে, সৃজনশক্তির বিকাশে সাহায্য করে।

(10) চিত্র সংকলন গ্রন্থ :

শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে যাতে একটি করে চিত্র সংকলন গ্রন্থ তৈরী করে সে বিষয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন। চিত্রসংকলন গ্রন্থে শিক্ষার্থীরা সংগ্রীহিত বিভিন্ন চিত্র একত্রিত করে চিত্রের পাশে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখে রাখবে। অবশ্য চিত্র সংকলন গ্রন্থের ঐ চিত্রগুলির সঙ্গে যেন শিক্ষার্থীদের পঠিত বাংলা পাঠ্য বইয়ের কোন কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ কিংবা নাটকের ঘটনা বা চরিত্র্যের মিল থাকে। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীরা সেইসব পাঠ্যবই থেকে ছবির সঙ্গে মিলযুক্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ লাইন টুকে রাখতে পারে। এগুলির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে রুচিবোধ জন্মাবে এবং সাহিত্য পাঠের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

(11) মুদ্রিত পত্রিকা :

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের রচনার গুণগত মানের উপর নির্ভর করে, নির্বাচিত কয়েকটি লেখা নিয়ে বছরে একটি নির্দিষ্ট সময় একটি মুদ্রিত পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মুদ্রিত পত্রিকায় যে সব শিক্ষার্থীরা মনোনীত হয় তারা সাধারণত নিজেদের উৎকৃষ্ট সাহিত্যকৃতি পত্রিকায় প্রকাশ করে। ফলে ঐসব শিক্ষার্থীদের

মধ্যে সাহিত্য সৃষ্টির আগ্রহ দেখা দেয় এবং তাদের দেখে বাকি অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মধ্যেও সাহিত্য সৃষ্টির আকাঙ্খা জাগতে পারে।

(12) সাহিত্য সংঘ :

সাহিত্যচর্চার জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন করে সাহিত্য-চক্র কিংবা সাহিত্য-সংঘ গঠন করা যেতে পারে। এই সংঘে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা আবৃত্তি, সঙ্গীত, স্বরচিত কবিতা-পাঠ, সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে সাহিত্যরসসিক্ত উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলবে। এই সাহিত্য সংঘের নিজস্ব দেওয়াল পত্রিকা, হাতে লেখা পত্রিকা ইত্যাদি থাকবে এবং মাঝে মাঝে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাহিত্যালোচনায় অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানাবে এবং সাথে সাথে সাহিত্য সংঘ মাঝে মাঝে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে।

(13) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান :

প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা দিবস ও মহাপুরুষদের জন্মজয়ন্তী উৎসব বা বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিয়োগিতা উপলক্ষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। এইসব অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা একক কিংবা দলগতভাবে অভিনয়, আবৃত্তি, বিতর্ক, বক্তৃতা, সঙ্গীত চর্চায় অংশগ্রহণ করে একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার চেষ্টা করবে, ফলে শিক্ষার্থীদের সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মাবে এবং সৃজনশক্তির বিকাশ ঘটতে পারে।

(14) সংগীত :

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে শিক্ষার্থীরা ঘাতে সংগীত চর্চায় অংশগ্রহণ করে সেজন্য তাদের উৎসাহিত করতে হবে। সংগীত চর্চার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা সাহিত্য চর্চায় আগ্রহী হতে পারে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের উচ্চারণক্ষমতার বিকাশ ঘটতে পারে। এজন্য প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে অন্যান্য বিষয়ের মতো সংগীতকেও পাঠ্যক্রমে একটি বিশেষ স্থান দেওয়া দরকার।

(15) চিত্রাঙ্কন :

চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটে, শিল্পীসত্তার বিকাশ ঘটে, রুচি ও সৌন্দর্যবোধের বিকাশ ঘটে, বর্ণ ও শব্দ সুন্দরভাবে লেখার ক্ষমতা জন্মে। তাই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং শ্রেণীতে চিত্রাঙ্কনের ব্যবস্থা করা দরকার।

(16) সাহিত্য প্রতিযোগিতা :

শিক্ষার্থীদের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধির জন্য বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কবিতা, গান, আবৃত্তি, কবি-সাহিত্যিকদের সম্পর্কে বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে। শিক্ষক এখানে কখনও পরামর্শ দেবেন কখনও পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করবেন।

(17) সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা :

মূলত ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করবেন শিক্ষার্থীরা যাতে বিভিন্ন গল্প, কবিতা, ভ্রমণকাহিনি ইত্যাদি লেখার জন্য নিজে থেকেই উৎসাহিত হয়। তার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন লেখা

আনার জন্য উৎসাহ দেবেন এবং লেখাগুলির কোথায় ভুল আছে, কোথায় কোন লেখাটি সংযোজন করতে হবে, কোথায় কি সংশোধন করতে হবে তা শিক্ষক ঠিক করে দেবেন। এতে শিক্ষার্থীদের সৃজনশক্তি, কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটবে। তাই বলা যায় শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নতির জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে সাহিত্যানুশীলনমূলক বিভিন্ন কার্যাবলীর আয়োজন করা দরকার।

৪.১৪ শিক্ষা সহায়ক উপকরণ : ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা :

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষাসহায়ক উপকরণের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। গতানুগতিক পদ্ধতিতে শিক্ষক কোন গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা পড়ানোর সময় বক্তৃতা পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। উচ্চশ্রেণীতে এই পদ্ধতি কার্যকরী হলেও নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি ততটা পরিপক্ক না হওয়ায় তারা শিক্ষকের বক্তব্য বেশিক্ষণ শুনতে আগ্রহবোধ করেনা। সেইজন্য আধুনিক শিক্ষাবিদরা মনে করেন বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বিষয়ের মতো বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হলে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা জরুরি। অবশ্য বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার্থীদের ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদান করার সময় শিক্ষক যদি উপযুক্ত সময়ে শিক্ষা সহায়ক উপাদান উপকরণগুলি ব্যবহার করতে পারেন তাহলে শিক্ষাণীয় বিষয় অনেকটা সহজবোধ্য হয়। তাছাড়া শিক্ষাসহায়ক উপকরণের সাহায্যে বিমূর্ত বিষয়কে খুব সহজে মূর্ত করে তোলা যায়।

শিক্ষাসহায়ক প্রদীপন ও উপকরণ

প্রদীপন কথাটির অর্থ হল প্রকৃষ্ট রূপে উদ্দীপন। অর্থাৎ যা প্রকৃষ্টরূপে উদ্দীপনা জাগায় তাই হল প্রদীপন। অর্থাৎ যে বস্তু বা কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মনে উদ্দীপনা জাগানো যায়, তাকে শিক্ষামূলক প্রদীপন বলে। অন্যদিকে, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের পাঠদানকে সক্রিয় করে তুলতে সাহায্যকারী হিসাবে যে সব বস্তু বা সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয় তাকে উপকরণ বলে। আসলে উপকরণ শব্দটি ক্ষুদ্র অর্থে ব্যবহৃত আর প্রদীপন কথাটি বৃহৎ অর্থে ব্যবহৃত।

শিক্ষামূলক প্রদীপনের প্রয়োজনীয়তা :

শিক্ষামূলক প্রদীপন ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কী তা নিম্নে আলোচনা করা হল—

(1) মূল ধারণা সংগঠনকে জীবন করে তোলা যায়

শিক্ষামূলক প্রদীপনের সাহায্যে কোন জটিল বিষয়কে সহজ ও জীবন্ত করে তোলা যায়। শিক্ষকের বোঝানো বিষয় শিক্ষার্থীদের কাছে অনেক সময় খুব কঠিন হয়ে পড়ে তখন চিত্রের সাহায্যে দেখিয়ে দিলে শিক্ষার্থীদের কাছে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি কবিতা 'বারোমেসে' সেখানে বারোমাসের প্রকৃতি বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক যদি ওই কবিতাটি পাঠদান করার সময় বারোমাসের প্রাকৃতিক চিত্র বর্ণিত একটি রঙিন চার্ট ব্যবহার করেন তাহলে শিক্ষার্থীরা পাঠে আনন্দ লাভ করবে তাহলে জটিল ধারণা একত্রিতভাবে সহজ সরলভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে উঠে আসবে।

(2) শিক্ষার্থীদের মনোযোগী করে তোলা যায় :

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণকার্য চলাকালীন অনেক সময় শিক্ষার্থীরা অমনোযোগী হয়ে পড়ে এবং বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে। তখন শিক্ষক যদি বিষয় রিলেটেড কোন চার্ট ব্যবহার করেন বা ব্ল্যাকবোর্ডে ছবি এঁকে দেন কিংবা

কোন সিনেমার গল্প বলেন অথবা কোন গান গেয়ে শোনান অথবা কোন গানের রেকর্ডিং ইত্যাদি ব্যবহার করেন তাহলে শিক্ষার্থীরা আস্তে আস্তে মনোযোগী হয়ে পড়ে। অবশ্য ওই প্রদীপনগুলি শিক্ষককে খুব সচেতনভাবে উপযুক্ত সময়ে ব্যবহার করতে হবে, তা না হলে বিশৃঙ্খলা আরো বেড়ে যেতে পারে।

(3) বিমূর্ত ধারণাকে মূর্ত করে তোলা যায় :

শিক্ষা সহায়ক উপকরণের সাহায্যে বিমূর্ত ধারণাকে মূর্ত করে তোলা যায়। ধরা যাক, তাজমহলকে নিয়ে লেখা কোন গল্প, উপন্যাস বা ভূগোল, ইতিহাসের কোন পাঠ্যবিষয় শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করা হচ্ছে। শিক্ষক যদি তখন তাজমহলের মডেল ব্যবহার করেন তাহলে বিমূর্ত ধারণাকে সহজে মূর্ত করে তোলা যায়। আবার নাটক পড়ানোর ক্ষেত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে বা ভিডিও রেকর্ডিং ব্যবহারের মাধ্যমে সহজে শিক্ষার্থীদের সামনে মূর্ততা স্থাপন করা যায়।

(4) ভাষার বিকাশ

শিক্ষামূলক প্রদীপন ব্যবহার করে অনেক সময় শিক্ষার্থীদের ভাষার বিকাশ ঘটানো যায়। যেমন বাংলা বানান ভুল বা উচ্চারণ রীতি বা ধ্বনিতত্ত্ব পড়ানোর সময় আমরা আদর্শ উচ্চারণের রেকর্ডিং ব্যবহার করতে পারি। কিংবা বিভিন্ন সংবাদ চ্যানেল বা এফ.এম-এর উচ্চারণের উদাহরণ দিয়ে শিক্ষার্থীদের ভাষা দক্ষতার বিকাশ ঘটানো যায়।

(5) জ্ঞানের প্রয়োগ :

শিক্ষামূলক প্রদীপনের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারে। আবার অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারে।

(6) বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন :

শিক্ষামূলক প্রদীপন ও উপকরণ বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে সাহায্য করে। ধরা যাক, বন্য পরিবেশের উপরে লেখা কোন গল্পের উপর শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণকার্য চালানো হচ্ছে তখন ঐ রিলেটের কোন রঙিন চার্ট ব্যবহার করা হলো। ঐ চিত্রের পুরো বিষয়টাই পরিবেশ বিজ্ঞানের বিষয়। আবার সেখানে পশু-পাখির ছবি থাকলে সেগুলি জীবন বিজ্ঞানের বিষয়। আবার স্থান সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করলে সেটা ভূগোলের বিষয়। কোন রকম সংখ্যা গণনার বিষয় আসলে সেটা অঙ্কের বিষয়। আবার পশু-পাখির ইংরাজি নাম জিজ্ঞাসা করেও আমরা ইংরাজির সাথে সমন্বয় সাধন করতে পারি। ফলে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধি বেড়ে যায়। এ দিক থেকে শিক্ষা সহায়ক প্রদীপনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

শিক্ষা সহায়ক প্রদীপনের শ্রেণীবিভাগ :

শিক্ষা সহায়ক প্রদীপন তথা শিক্ষা সহায়ক উপকরণ প্রধানত পাঁচ প্রকার। যথা — (1) দর্শনভিত্তিক উপকরণ (2) শ্রবণভিত্তিক উপকরণ (3) দর্শন শ্রবণভিত্তিক (4) সক্রিয়তাভিত্তিক উপকরণ এবং (5) স্বয়ং শিক্ষণমূলক উপকরণ।

(1) দর্শনভিত্তিক উপকরণ :

দর্শনভিত্তিক উপকরণগুলি হল (ক) পাঠ্যবই (খ) ব্ল্যাকবোর্ড (গ) চার্ট (ঘ) মডেল (ঙ) অভিনয় (চ) রেখাচিত্র (ছ) ফিল্ম প্রজেক্টর, (জ) পকেট-বোর্ড (ঝ) এপিডায়োস্কোপ (ঞ) বুলেটিং বোর্ড ইত্যাদি।

(ক) পাঠ্যবই :

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ বা প্রদীপন হল পাঠ্যবই। পাঠ্যবই অনুযায়ী শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করা হয়। পাঠ্যবিষয় নির্বাচন ও পাঠে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য পাঠ্যবই একান্ত অপরিহার্য। ব্যাকরণ শিক্ষার ক্লাসে তো পাঠ্যবই অবশ্যই উপযোগী। পাঠ্যবই বা পাঠ্যক্রম না থাকলে শ্রেণীতে পঠন-পাঠন কার্য চালানো কষ্টকর হয়ে পড়ে।

(খ) ব্ল্যাকবোর্ড :

শ্রেণীকক্ষে ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের বিশেষ উপযোগিতা আছে। শ্রেণীকক্ষে নানাভাবে ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করা যায়। শ্রেণীতে শিক্ষণকার্য চলাকালীন ছবি আঁকা, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়া, লিখে দেওয়া, গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ও তার অর্থ লিখে দেওয়া, রেখাচিত্র আঁকা, মানচিত্র আঁকা ইত্যাদির মাধ্যমে ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করা যায়।

(গ) চার্ট :

শ্রেণীশিক্ষণে চার্টকে উপযুক্ত শিক্ষা সহায়ক উপকরণ হিসাবে কাজে লাগানো যায়। বিভিন্নভাবে চার্ট ব্যবহার করা যায়। যেমন বাংলা শিক্ষণের ক্ষেত্রে কবি-নাট্যকার লেখকদের প্রতিকৃত ও পরিচিতি, তুলনীয় উদ্ধৃতি, বিষয় রিলেটেড ছবি ইত্যাদির জন্য চার্ট ব্যবহার করা যায়। আবার ইতিহাস-ভূগোল শিক্ষার ক্ষেত্রে মানচিত্র, অঙ্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে সংখ্যামূলক হিসাব বা ছবি ব্যবহার করা যায় ইত্যাদি। চার্টের লেখা ও ছবি একটু বড় সাইজের হয়।

(ঘ) মডেল :

মডেল হল কোন প্রকৃত বস্তুর প্রতিরূপ। শ্রেণীকক্ষে যে মডেল ব্যবহার করা হয় তা বিভিন্ন সাইজের হতে পারে। মডেল কখনও মূল বস্তুর চেয়ে বড়ও হতে পারে। আবার ছোট হতে পারে, মডেল ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠে ভালো মনোযোগী করা যায়।

(ঙ) অভিনয় :

অভিনয় ও একরকম শিক্ষাসহায়ক উপকরণ। অনেক সময় কোন পাঠ্য বিষয় শিক্ষার্থীদের সামনে জীবন্ত করে তোলার জন্য অভিনয় করে দেখানো হয়। অভিনয় পদ্ধতি ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীদের মনে পাঠ্যবস্তু অনেকদিন জায়গা করে নিতে পারে।

(চ) রেখাচিত্র :

বিদ্যালয়ে জ্যামিতির ক্লাস করানোর জন্য রেখাচিত্রের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। রেখাচিত্রের সাহায্য জ্যামিতির বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা যায়।

(ছ) ফ্লিম প্রজেক্টর :

ফ্লিম প্রজেক্টরের সাহায্যে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রজেক্টর দেখানো যেতে পারে। অবশ্য এই ব্যবস্থা বেশীরভাগ বিদ্যালয়ে নেই। ফিল্ম প্রজেক্টর শিক্ষার উন্নতির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এই প্রজেক্টর শিক্ষার্থীদের মনোযোগী করতে ও জ্ঞান বৃদ্ধি করতে খুব কাজে লাগতে পারে।

(জ) পকেট-বোর্ড :

এটি এক ধরনের শিক্ষা সহায়ক উপকরণ। একটি চার্টে আড়াআড়ি ভাবে স্কেলের মতো দেখতে টুকরো টুকরো কাগজ জুড়ে এই বোর্ড তৈরী করা হয়। এমনভাবে টুকরো কাগজগুলি জুড়তে হবে যেন টুকরো কাগজের নিচের দিকটা চার্টের গায়ে আটকে থাকে আর বাকি দিকগুলি খোলা থাকে। টুকরো টুকরো কাগজে লেখা অক্ষর বা সংখ্যা শ্রেণীকক্ষে প্রয়োজন অনুযায়ী পকেটে প্রবেশ করানো বা বের করানো যেতে পারে। এটি একটি স্বল্প খরচের আকর্ষণীয় উপকরণ।

(ঝ) এপিডায়োস্কোপ :

এর সাহায্যে কোন ছবি বা তথ্যকে বড় পর্দায় ফেলে শিক্ষার্থীদের দেখানো যেতে পারে।

(ঞ) বুলেটিন বোর্ড :

বুলেটিন বোর্ডও একধরণের দর্শনভিত্তিক উপকরণ। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণকার্য্য চলাকালীন শিক্ষক বিভিন্ন ধরণের চার্ট, ছবি, রেখাচিত্র, মানচিত্র, সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ অংশ শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে পারেন।

(2) শ্রবণভিত্তিক উপকরণ : এফ.এম, রেডিও, টেপরেকর্টার ইত্যাদি।

(3) দর্শন-শ্রবণভিত্তিক উপকরণ : টিভি, সবাক চলচ্চিত্র, কম্পিউটার ইত্যাদি।

(4) সক্রিয়তাভিত্তিক উপকরণ : শিক্ষামূলক ভ্রমণ, আবৃত্তি, নাট্যানুষ্ঠান, অভিনয় ইত্যাদি।

(5) স্বয়ং শিক্ষণমূলক উপকরণ : কমপিউটার, ডকুমেন্টারি ফিল্ম, ইন্টারনেট ইত্যাদি।

শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ব্যবহারের সুবিধা :

(1) শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীরা খুব সহজে আকৃষ্ট ও মনোযোগী হতে পারে।

(2) শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহারের দ্বারা অনেক সময় জটিল বিষয়কে খুব সহজ করে শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরা যায়।

(3) শিক্ষামূলক উপকরণ দ্বারা অনেক বিমূর্ত বিষয়কে খুব সহজে মূর্ত করে তোলা যায়।

(4) শিক্ষাসহায়ক উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দর্শন-শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের বিকাশ যথার্থ হয়। তাছাড়া শিশু শিক্ষার্থীদের কাছে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষা বেশী উপযোগী।

শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ব্যবহারের অসুবিধা :

(1) শিক্ষাসহায়ক উপকরণ বেশী পরিমানে ব্যবহার করলে শ্রেণীতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে।

(2) এই জাতীয় উপকরণ পরিকল্পনা মাফিক ব্যবহার না করলে পাঠে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে।

(3 শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে উপকরণগুলি যেন ঠিক স্থানে উপযুক্ত সময় ব্যবহার করা হয়। তা না হলে শিক্ষণে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে।

৪.১৫ ভাষা-পরীক্ষাগার বা গবেষণাগারের ধারণা ও পরিকল্পনা :

শিক্ষার্থীদের একক কিংবা দলগতভাবে বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্য অনুশীলনের জন্য নানান শিক্ষাসহায়ক উপকরণে সুসজ্জিত বৃহৎ কক্ষ প্রয়োজন, যেখানে শিক্ষার্থীদের প্রেষণা সৃষ্টির পাশাপাশি শ্রবণ, কথন, পঠন ও অনুশীলনের পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত ব্যবস্থা থাকবে। একজন প্রশিক্ষক কর্মী এই কক্ষের সমস্ত ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে থাকবেন। ভাষা শিক্ষাদানের জন্য যেসব শিক্ষা সহায়ক উপকরণ থাকবে ঐ কক্ষে সেগুলি হল চার্ট, মডেল, ইন্টারনেট, মাইক্রোফোন, টেপরেকর্ডার, সিডি প্লেয়ার, কম্পিউটার, সাউন্ড বক্স ইত্যাদি। এই ধরনের একটি কক্ষকে বলা যায় ভাষা-পরীক্ষাগার বা ল্যাংগুয়েজ ল্যাবোরেটরি।

প্রথমদিকে ভাশা পরীক্ষাগারগুলি ক্যাসেট প্লেয়ার সজ্জিত ছিল, বর্তমানে আধুনিকতার ছোঁয়ায় তার কিছুটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। ক্যাসেট প্লেয়ারের স্থানে এসে গেছে অত্যাধুনিক কম্পিউটারের মাল্টিমিডিয়া। এখানে এসে প্রথম প্রথম শিক্ষক যে নির্দেশনাগুলি দেন শিক্ষার্থীরা সেগুলি মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং পরবর্তীকালে কানে হেড সেট লাগিয়ে ভাষার ব্যবহারগুলি শুনতে থাকে। বারবার শ্রবণ আর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের শ্রবণশক্তির বিকাশ ঘটে, এই পদ্ধতি যে কোন শিক্ষণীয় বিদেশী ভাষা শিক্ষার্থীরা খুব সহজেই আয়ত্তে এনে ফেলে। হেড ফোনের পাশাপাশি তাদের মুখেও মাইক্রোফোন লাগানো থাকে, যার মাধ্যমে তার ভাষাটি বলার চেষ্টা করে এবং তাদের উচ্চারিত ভাষাও কম্পিউটারে রেকর্ডিং হয়ে থাকে। পরে নিজেদের উচ্চারিত ভাষার রেকর্ডও শুনতে থাকে এবং ভুলগুলি চিহ্নিত করতে পারে। আবার সংশোধন করার চেষ্টা করে।

টেপরেকর্ডারকেন্দ্রিক ভাষা পরীক্ষাগুলি খুব বেশী জনপ্রিয় হতে পারেনি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে মাল্টিমিডিয়া প্রযুক্তির বিপুল উন্নতির জন্য ভাষা পরীক্ষাগারের ধারণাটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ভাষা পরীক্ষাগারের সফ্‌ট্‌ওয়্যারগুলির ক্রমোন্নতি ঘটেছে। বর্তমানে ভাষা পরীক্ষাগার বলতে শুধু শ্রবণ-কথনভিত্তিক পরীক্ষাগার বোঝায় না। এই পরীক্ষাগারগুলিতে ভিডিও, ফ্ল্যাশ গেমস্, ইন্টারনেট ইত্যাদি ভাষা শিক্ষাসহায়ক প্রচুর সুযোগ-সুবিধা থাকে। Digital Language Laboratory-এর আবির্ভাব ভাষা পরীক্ষাগারের কর্মপদ্ধতিকে যেমন সহজ করে দিয়েছে তেমনি এর ফলপ্রসূতার দিকটিরও বহুগুণ উন্নতি ঘটেছে।

সব ভাষা পরীক্ষাগারের বৈশিষ্ট্য একরকম নাও হতে পারে। সফ্‌টওয়্যার কেন্দ্রীক পরীক্ষাগারগুলি একটু উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন। সফট্‌ওয়্যার কেন্দ্রীক পরীক্ষাগারগুলিতে শিক্ষার্থীদের কথন—অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ভুলগুলি সংশোধনের নির্দেশ পাওয়া যায়। টেপরেকর্ডার কেন্দ্রীক পদ্ধতিতে রেকর্ডিং সম্পূর্ণ হবার পর সেগুলি চালিয়ে ভুলগুলি শুনে নিয়ে পরে শিক্ষকের নির্দেশে সংশোধ ন করে নিতে হতো। কিন্তু ডিজিটাল পদ্ধতিতে এগুলি একই সঙ্গে অত্যন্ত কার্যকারিতার সাথে সম্পাদিত হয়। সেইজন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থী কাউকেই কিছু করতে হয় না। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাহায্য ছাড়া নিজেরাই অডিও, ভিডিও ,ওয়েবভিত্তিক মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে নিজেদের শিক্ষাকর্মকে গতিশীল করে তোলে।

ভাষা পরীক্ষাগারে শিক্ষকের ভূমিকা :

ভাষা পরীক্ষাগারে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বিভিন্ন অডিও, ভিডিও, ইন্টারনেট, ওয়েবভিত্তিক মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে শিক্ষা সম্পন্ন করে। কিন্তু শিক্ষক এখানে কো-অর্ডিনেটর হিসাবে কাজ করবেন। শিক্ষকের ভূমিকাগুলি হল—

(1) শিক্ষক ভাষা পরীক্ষাগারে শিক্ষণ সহায়ক উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

(2) শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও প্রেষণা দান করা শিক্ষকের কাজ।

(3) ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা দান করবেন।

(4) ভাষা পরীক্ষাগারে মাল্টিমিডিয়া প্রযুক্তির যন্ত্রপাতিগুলির ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধারণা দেবেন।

(5) ইন্টারনেট ও সফটওয়্যার ব্যবহার করতে গেলে যে যে বিষয় সতর্ক থাকতে হবে তা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দেবেন।

(6) শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করানো এবং শৃঙ্খল ও নিয়ম মেনে চলার জন্য শিক্ষক নির্দেশ দেবেন।

(7) শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে কাজ করলেও শিক্ষক কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্ব পালন করবেন।

(8) প্রয়োজনে প্রধান শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান ভূমিকা পালন করবেন।

ভাষা পরীক্ষাগারের প্রয়োজনীয়তা :

নানা কারণে ভাষা পরীক্ষাগারের প্রয়োজন আছে। কারণগুলি হল—

(ক) ভাষা পরীক্ষাগারে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি অনুসারে পঠন-পাঠন ক্রিয়া চলে।

(খ) ভাষা পরীক্ষাগারে খুব দ্রুতগতিতে শিক্ষার্থীদের ভাষা দক্ষতার বিকাশ ঘটে।

(গ) ভাষা পরীক্ষাগার শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও প্রেষণা বাড়িয়ে তোলে।

(ঘ) ভাষা শিক্ষার জন্য সময় এবং পরিশ্রম দুটোই কম হয়।

(ঙ) এখানে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে।

(চ) শিক্ষার্থীরা যেহেতু নিজে নিজে শিখে নিতে পারে তাই শিক্ষক নির্ভরতাও অনেকটা কমে যায়।

(ছ) ভাষা পরীক্ষাগারে শিখন আনন্দপূর্ণ হয় এবং শিক্ষার্থীরা নিজ আগ্রহে শেখে। তাই শিখন ফলটিও দীর্ঘস্থায়ী হয়।

(জ) শ্রবণ-কথন-শিখন দক্ষতার বিকাশে ভাষা পরীক্ষাগারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

(ঝ) শিক্ষার্থীরা নিজের ভুল নিজেই শুধরে নিতে পারে।

(ঞ) স্বমূল্যায়নের ক্ষেত্রে ভাষা পরীক্ষাগারের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

(ট) বিদেশীভাষা শেখার ক্ষেত্রে ভাষা পরীক্ষাগারের গুরুত্ব কম নয়।

(ঠ) সাধারণমেধার শিক্ষার্থীদের কাছে মাল্টিমিডিয়া অত্যন্ত কার্যকরী ব্যবস্থা।

৪.১৬ সংক্ষিপ্তকরণ (Summing Up) :

- আধুনিক মনোবিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা কতকগুলি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষা, খেলারছলে শিক্ষা, কর্ম ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের শিক্ষা ও সহজ থেকে জটিল, জানা থেকে অজানায় যাওয়ার শিক্ষা ইত্যাদি।
- মাতৃভাষা শিক্ষাদানের কয়েকটি পদ্ধতি হল বর্ণক্রম শব্দক্রম বাক্যক্রম, ছড়া, গল্প বলা, আলোচনা, কথোপকথন, প্রকল্প, অবরোহী পদ্ধতি ইত্যাদি।
- শ্রবণ, কথন, পঠন, লিখনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাইরে থেকে যেমন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে, আবার অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটাতেও পারে। সঠিক শোনা ও পড়া অভ্যাস গঠন হলেই তার সঠিকভাবে মানুষ কথন ও লিখনের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে। শ্রবনের মাধ্যমে ভাষার ধ্বনিরূপ গ্রহণ ও কথনের মাধ্যমে ভাষার ধ্বনিরূপের প্রকাশ করে মানুষ। পঠনের মাধ্যমে ভাষার গঠনের বা আঙ্গিক রূপের গ্রহণ ও লিখনের মাধ্যমে আঙ্গিক রূপের প্রকাশ ঘটানো যায়।
- মাতৃভাষা শিক্ষায় কবিতা, গদ্য, ব্যাকরণ, রচনা, অনুবাদ ইত্যাদি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নিয়ম অনুসৃত হয়। মাতৃভাষা শিক্ষায় এইগুলির গুরুত্ব কম নয়, প্রত্যেকের নিজের নিজের জায়গায় নিজস্ব ব্যক্তিত্বে পরিপূর্ণ; যা শিক্ষার্থীদের নানাভাবে প্রভাবিত করে
- বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমিক শিক্ষার পাশাপাশি সাহিত্যানুশীলনমূলক কার্যাবলী শিক্ষার্থীদের সৌন্দর্য পিপাসা-সৌন্দর্য সম্ভোগ-সৌন্দর্য সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা, রুচিবোধের পরিমার্জন, সৃজনশক্তির বিকাশ তথা, সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করে। আর শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ শ্রেণীকক্ষ পরিচালনায় শিক্ষককে সহায়তা করে এবং শিক্ষার্থীদের মটিভেট করতে সহায়ক শিক্ষার্থীরাও আনন্দপূর্ণ পরিবেশে পঠনে মনোযোগী হয়।

৪.১৭ অনুশীলনী :

(ক) বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অনুশীলনে সরব পাঠ ও নীরব পাঠের উপযোগিতা তুলনামূলকভাবে বিচার করুন। চর্বনা, স্বাদনা ও আয়তীকরণ পাঠের মধ্যে কীভাবে পার্থক্য করবেন, উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

(খ) বাংলা বানান সমস্যার কারণগুলি উল্লেখ করুন। কিভাবে এর প্রতিকার করা যায় যুক্তি দিন।

(গ) ব্যাকরণ শিক্ষাদানের সমস্যাগুলি উল্লেখ করুন। ব্যাকরণ শিক্ষাদানে শিক্ষকের ভূমিকা কি?

(ঘ) শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ কি? বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

৪.১৮ গ্রন্থপঞ্জী :

(১) গুপ্ত, অশোক, 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতির রূপরেখা সেন্ট্রাল লাইব্রেবী, কলকাতা, ২০১৩।

(২) শ', ডঃ রামেশ্বর, 'সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' ২৪ নভেম্বর ১৯৯৬।

(৩) মিশ্র, সুবিমল, 'বাংলা শিক্ষণ পদ্ধতি', রীতা পাবলিকেশন, সেপ্টেম্বর, ২০১০।

(৪) চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক, 'মাতৃভাষা শিক্ষণ-বিষয় ও পদ্ধতি' রীতা পাবলিকেশন, আগষ্ট ২০১৪-২০১৫।

(৫) সেন, মলয় কুমার, 'শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান' সোমা বুক এজেন্সি, ২০১২-২০১৩।

বিভাগ - খ

একক পাঁচ : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষণ কৌশল সংক্রান্ত পদ্ধতি

বিন্যাস :

৫.১ প্রস্তাবনা

৫.২ উদ্দেশ্য

৫.৩.১ শিক্ষণ সম্পর্কে সঠিক ধারণা

৫.৩.২ শিখন সম্পর্কে সঠিক ধারণা

৫.৩.৩ অনুকৃতি পাঠ। ব্যাপ্ত শিক্ষন ও অনুশিক্ষণের তুলনা

৫.৩.৪ অনুশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য

৫.৩.৫ অনুশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

৫.৪ আদর্শ পাঠ পরিকল্পনার সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা

৫.৫.১ আদর্শ পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে কী কী দরকার

৫.৫.২ আদর্শ পাঠ পরিকল্পনা বৈশিষ্ট্য

৫.৫.৩ পাঠপরিকল্পনা নমুনা

৫.৬ সংক্ষিপ্তকরণ

৫.৭ অনুশীলনী

৫.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৫.১ প্রস্তাবনা

পরিকল্পনাহীন কোনো কাজ যথার্থ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সমর্থ হয় না। সেজন্য যে কোনো কার্যক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্বেই যথাযথ পরিকল্পনা করে নিতে হয়। শিক্ষাক্ষেত্রেও কাঙ্খিত ফল পেতে তাই বিভিন্ন প্রকার পরিকল্পনা করে এগোতে হয়। পরিকল্পনা করতেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতি সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এখানে শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্দেশ্য পূরণ করতে শিক্ষক মহাশয়ের শিক্ষণ সম্পর্কে অনুকৃতি পাঠ সম্পর্কে এবং পাঠপরিকল্পনা সম্পর্কে ঠিক কি ধরনের দৃষ্টিপাত কাম্য তা দেখে নেওয়া যাবে।

৫.২ উদ্দেশ্য

আলোচ্য পাঠ করার পর আপনি —

- শিক্ষণ ও শিখন সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করবেন।

- অনুকৃতি পাঠ কাকে বলে — অনুকৃতি পাঠের সময় — দলের মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা — অনুকৃতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানবেন।
- আদর্শ পাঠ কাকে বলা যায়, আদর্শ পাঠের উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- আদর্শ পাঠ-পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে কোন কোন বিষয়ের প্রয়োজন তা জানতে পারবেন।
- বিভিন্ন শিক্ষণ দক্ষতা সম্পর্কে অবগত হবেন।
- পাঠ-পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত হবেন

৫.৩.১ শিক্ষণ সম্পর্কে সঠিক ধারণা :

প্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষণ কথাটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সেইযুগে শিক্ষণ কথাটি খুবই সীমিত ও সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হত। তখন গুরু ও শিক্ষার্থীর মধ্যে দাতা ও গ্রহীতার সম্পর্কই ছিল প্রধান। তখনকার বিচারে গুরুর জ্ঞানপাত্র থেকে শিষ্যের শূণ্যপাত্রে জ্ঞান পরিবেশন করার কাজকে শিক্ষণ বা Teaching হিসাবে বিবেচনা করা হত। কিন্তু সভ্যতা ও শিক্ষাবিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে শিক্ষণ সম্পর্কে ধারণার ও পরিবর্তন ঘটেছে।

অনেক শিক্ষাবিদ শিক্ষণকে শিক্ষার্থীর শিখনে সহায়তা করার প্রক্রিয়া হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের সামনে কিছু জ্ঞানসামগ্রী উপস্থাপন করলে সে সক্রিয় হয়ে উঠবে এবং জ্ঞান লাভ করবে। কিন্তু শিক্ষণ কি শুধুমাত্রই জ্ঞান বিতরণ করা বা জ্ঞানসামগ্রী উপস্থাপন করা? এডগার ডেল শিক্ষণকে শিক্ষক এবং তাঁর শিক্ষার্থীর মনের সংযোগ এবং সমন্বয়ের প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করেছেন। আবার অনেকে কেবলমাত্র সংযোগের (merging) উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আবার শিক্ষাতত্ত্বে বলা হয়েছে শিক্ষা একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীদের প্রতি কিছু ক্রিয়া করেন, পরিবর্তে শিক্ষার্থীরাও কিছু প্রতিক্রিয়া করে। আবার কোন কোন শিক্ষাবিদ বলেছেন শিক্ষণ প্রক্রিয়া হল সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক পারস্পরিক ক্রিয়া এবং তার যে ফল তা হল শিখন। শিক্ষণের এই জাতীয় সংজ্ঞায় শুধু কলাগত দিকই প্রকাশ পেয়েছে।

শিক্ষণের সময় শিক্ষক শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কাজ করেন তাই নয়। তিনি তাঁর শিক্ষণকে কেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ করে, বিভিন্ন আচরণ সম্পাদন করেন, শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেন এবং বিষয়বস্তুর বিন্যাসও ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, কারণ, নীতি নির্ধারণ করেন এবং মূল্যায়ণ করেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, শিক্ষণ কার্য চলাকালীন শিক্ষক শিক্ষণ সংক্রান্ত যে আচরণ করেন তা তাঁর সামাজিক আচরণ থেকে আলাদা। আধুনিক কালে যারা শিক্ষণকে বিজ্ঞানসম্মত করার পক্ষপাতী, তাঁরা বলেন— ''শিক্ষকতা বৃত্তির জন্য যে মৌলিক বৈজ্ঞানিক কৌশলের প্রয়োজন হয় তাই হল শিক্ষণ।'' অর্থাৎ বিষয়বস্তুর নির্বাচন, বিষয়বস্তুর বিন্যাস, বিষয়বস্তুর উপস্থাপন ইত্যাদি কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য বৈজ্ঞানিক কৌশল প্রয়োজন হয় তাই হল শিক্ষণ। সর্বাধুনিক অর্থে বলা যায় — ''শিক্ষার্থীদের শিখন সহায়তায়, বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী ও কৌশল সমূহের সার্থক সমন্বয়ে ব্যক্ত শিক্ষক নির্ভর প্রক্রিয়াই হল শিক্ষণ।'' অর্থাৎ শিক্ষণের উপাদান হল বৈজ্ঞানিক কিন্তু তার প্রকাশ হল একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কলা বা Art.

শিক্ষণের আবার তিনটি পর্যায় (i) প্রাক্ সক্রিয়তা পর্যায় (ii) পারস্পরিক ক্রিয়ার পর্যায় এবং (iii) উত্তর সক্রিয়তা পর্যায়।

(i) প্রাক্ সক্রিয়তা স্তর বলতে পরিকল্পনামূলক স্তর বা আমরা যাকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষণ বলি তার পূর্বে শিক্ষককে যে কাজগুলি করতে হল, এই পর্বে যে কাজগুলি করা হয় তা হল—

(ক) উদ্দেশ্য নির্ধারণ

(খ) বিষয়বস্তু নির্বাচন

(গ) বিষয়বস্তু বিন্যাস

(ঘ) কৌশল ও পদ্ধতি নির্বাচন

(ঙ) পরিকল্পনা।

(ii) পারস্পরিক ক্রিয়া পর্যায়ে শিক্ষণ পাঠ্য বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন এবং বিভিন্ন ধরনের কাজের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থী পারস্পরিক ক্রিয়া সংঘটিত হতে থাকে। শিক্ষণের এই পর্যায়ে শিক্ষক যে কাজগুলি সম্পাদন করেন সেগুলি হল —

(ক) শ্রেণী বিন্যাস

(খ) প্রাথমিক মূল্যায়ণ

(গ) সক্রিয়তা সৃষ্টি

(iii) শিক্ষণের সর্বশেষ পর্যায়ের নাম উত্তর সক্রিয়তা পর্যায় বা মূল্যায়ণ পর্যায়। এই পর্যায়ে শিক্ষক বিশেষভাবে মূল্যায়ণ সংক্রান্ত কৌশলগুলি সম্পাদন করে এবং তাঁর শিক্ষণ প্রচেষ্টার সার্থকতা শিক্ষার্থীদের শিখন উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেন। এই পর্যায়ে শিক্ষককে যে কাজগুলি করতে হয় তা হল —

(ক) মূল্যায়ণ কৌশল নির্বাচন

(খ) কৌশল প্রয়োগ মূল্যায়ণ

(গ) শিক্ষণ পুনর্বিন্যাস

৫.৩.২ শিখন সম্পর্কে সঠিক ধারণা :

শিক্ষাবিজ্ঞান এবং মনোবিদ্যায় 'শিক্ষা' এবং 'শিখন' নামে দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়। সাধারণ ব্যবহারে শিক্ষক বা অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তিরা এই দুটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পান না। তবে বাস্তবে শিক্ষা এবং শিখন এর অর্থ আলাদা, শিক্ষাবিজ্ঞানী ও মনোবৈজ্ঞানিকরা এ সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ ও আলোচনা করেছেন। শিক্ষক হিসাবে আমাদেরও উভয়দিকের জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। শিখনই এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়। মনোবৈজ্ঞানিক ধারণা অনুযায়ী শিখন এক ধরনের Process বা প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া ব্যক্তির মধ্যে আচরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম এবং ঐ প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি বাস্তবে একজন ব্যক্তির জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রকমের আচরণ সম্পাদন করায়। মনোবিদদের মতে একজন মানুষের ব্যক্তিসত্তার বিকাশের জন্য বংশগতি ও পরিবেশ নামে দুটি উপাদানের প্রয়োজন। তাই ব্যক্তিমনের যে কোনো অগ্রগতিকে এই দুই শ্রেণীর উপাদানের

পারস্পরিক ক্রিয়া দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। জীবনের প্রতিমুহূর্তে ব্যক্তির মধ্যে যে আচরণের সৃষ্টি হয়ে চলেছে তার মধ্য দিয়ে বংশগতি ও পরিবেশ এই দুই উপাদানের মধ্যে সমন্বয় ঘটে চলেছে। শিশুদের জীবনে এই ধরনের ঘটনার প্রাবল্য বেশি। ফলে জন্মগত আচরণগুলির মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে, পরিবেশের তারতম্যের দরুন বা বিশেষভাবে পরিবেশের চাহিদার দরুন। ফলে ব্যক্তি বা শিশুর মধ্যে পরিবর্তিত আচরণ দেখা যায়। পরিবর্তিত আচরণটি নতুন আচরণ যা ইতিপূর্বে সম্পাদিত হয়নি।

পরিবর্তিত আচরণ সম্পাদনের জন্য ব্যক্তি তার বংশগতি বা অতীত কোন আচরণগত অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণের সঙ্গে পরিবেশের চাহিদার সার্থক অভিযোজনের তাগিদ অনুভব করছে, এর ফলেই সৃষ্টি হয়েছে নতুন আচরণ। পারস্পারিক ক্রিয়ার ফল হল একটি নতুন আচরণ। অর্থাৎ নতুন আচরণ প্রকাশের পূর্ব ঘটনাকে শিখন বলে। সাধারণ ভাষায় আমরা বলি শিখেছে। মনোবিদগণ শিখনকে তার এই মৌলিক অর্থে বিচার করে বলেছেন, অতীত অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণের প্রভাবে আচরণের পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হল শিখন।

প্রাচীন মনোবিদ্যার শিখন সম্পর্কিত ধারণার মধ্যে কোন ভুল না থাকলেও কিছু অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। ম্যাকগক এবং আইরায়ন বলেছেন, ''সক্রিয়তা, অভ্যাস এবং অভিজ্ঞতার শর্তসাপেক্ষে কর্ম সম্পাদন ধারার পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হল শিখন।'' আবার মনোবিদ হিলগার্ড শিখনকে এককভাবে প্রশিক্ষণ লব্ধ প্রক্রিয়া বলেছেন। অর্থাৎ শিখন প্রক্রিয়াই মানসিক প্রক্রিয়া থেকে পৃথক এবং তার উপর নির্ভর করে না। তিনি আরও বলেছেন প্রশিক্ষণ ছাড়া শিখন হয় না। গিলফোর্ড অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে শিখন সম্পর্কে বলেছেন— ''Learning is change in behaviour resulting from behaviour.'' প্রত্যেক মনোবিদই শিখনের অসম্পূর্ণ সংজ্ঞা দিয়েছেন। তবে মনোবিদ ম্যাকগক এবং আইরায়ন শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ ছাড়া, তার নিজস্ব সক্রিয় প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ তাঁরা শিখন প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করার জন্য ব্যক্তির বা শিক্ষার্থীর দিক থেকে যে সক্রিয়তার প্রয়োজন তা স্বীকার করে তাকে আধুনিক শিক্ষার ধারণার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। অর্থাৎ এই সংজ্ঞাটি অনেকটাই বাস্তবসম্মত।

বাস্তবে 'শিখন' এমন একটি জটিল ধারণা যে তাকে সংজ্ঞা দিয়ে সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না। শিখনের প্রথাগত এবং ব্যবহারিক সংজ্ঞায়, ব্যক্তির পূর্ব অভিজ্ঞতা বা তার সাধারণ জন্মগত বৈশিষ্ট্যগুলির এবং পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, শিখন প্রক্রিয়া সংগঠিত হয়। আবার কোন বাইরের পরিবেশের তাগিদে যখন ব্যক্তির আচরণ পরিবর্তন একান্তভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়ে তখন ঐ পরিবর্তনের জন্য তার মধ্যে শিখন প্রক্রিয়া সংগঠিত হয়। আবার কখনও বহির্জগৎ বা পরিবেশ ব্যক্তির মধ্যে অভিযোজনের তাগিদ আনে যার ফলস্বরূপ ব্যক্তি পরিবর্তিত নতুন আচরণ সম্পাদন করতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ পরিবেশের তাগিদে ব্যক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তার শিখন হয়। সাধারণ অর্থে প্রায় সকলে শিখনকে বিশেষ ব্যক্তির সক্রিয়তার ফল হিসাবে বিবেচনা করে থাকেন। বাস্তবে, কোনো বিশেষ বিষয়ে জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জন করার জন্য একজন ব্যক্তির শিক্ষার্থীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে সময় পরিসর তার মধ্যে তাদের যে পরিবর্তনমূলক ক্রিয়াগুলি ঘটে থাকে তাই শিখন।

শিখন প্রক্রিয়া তার প্রারম্ভিক স্তরে থেকে সর্বশেষ স্তর পর্যন্ত কতকগুলি আবশ্যিক অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই আবশ্যিক অবস্থাগুলি শিখনের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ। সেগুলি হল —

(ক) পরিবেশের চাহিদা

(খ) ব্যক্তি বা শিক্ষার্থীর চাহিদা

(গ) ব্যক্তি বা শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা বা আত্মসক্রিয়তা

(ঘ) ব্যক্তি বা শিক্ষার্থীর প্রেষণা

(ঙ) সম্পাদিত আচরণের পরিবর্তন

(চ) ক্রম পরিবর্তনশীল বিকাশ

(ছ) বিশেষ শর্তভিত্তিক কৃত্রিমতা

৫.৩.৩ অনুকৃতি পাঠ : ব্যাপ্ত শিক্ষণ ও অণুশিক্ষণের তুলনা

শিক্ষক-শিক্ষণ কর্মসূচিকে বৈজ্ঞানিক করার জন্য অনুকৃতি পাঠ একধরনের কৌশল। পাঠ প্রক্রিয়াকে অর্থপূর্ণ ও ফলদায়ী করার প্রচেষ্টার জন্য অনুপর্বের গুরুত্বও কম নয়। অনুকৃতি পাঠ হল শিক্ষণ-শিখন সংক্রান্ত বিভিন্ন চলরাশি ও তার দক্ষতাসমূহ যৌক্তিকভাবে অনুসন্ধান করার জন্য একটি বৈচিত্র্যগত গবেষণা সাধণী। অনুশিক্ষণ বা অনুকৃতি পাঠ সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বিভিন্ন মত দিয়েছেন —

রবার্ট বুশ(Buch) বলেছেন "A Teacher education technique which allows teachers to apply clearly defined teaching skills to carefully prepared lessons in a planned series of five to ten minutes encounters with a small group of real students often with an opportunity observe the results on video tape." অর্থাৎ অণুশিক্ষণ হল এক ধরণের শিখন কৌশল, এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী - শিক্ষক স্পষ্ট সংজ্ঞাত নির্দিষ্ট কয়েকটি শিক্ষণ দক্ষতা স্বল্প সময়ের মধ্যে, শ্রেণী কক্ষের বাস্তব পরিস্থিতিতে অনুশীলন করেন।

Allen বলেছেন — "Micro Teaching may be described as scaled down teaching encounter in class size and class time." অর্থাৎ এই ধারণা অনুসারে সময়ও শ্রেণীসংজ্ঞাকে মাপণী সারণি অনুযায়ী সংক্ষেপিত শিক্ষণকে বলে অনুশিক্ষণ।

আবার Young বলেছেন — "Micro teaching is a device which provides the novice and experienced teacher alike, new approach and opportunities to improve teaching." এছাড়া ইয়ং আরো বলেছেন অনুশিক্ষণ - সময়ও শ্রেণী সংজ্ঞাকে মাপণী সারণী অনুযায়ী সংক্ষেপিত। এরূপ বাস্তব বা প্রকৃত শিক্ষণকে অনুশিক্ষণ বলে।

এই তিনটি সংজ্ঞা থেকে বলা যায় —

"The teaching which permits exercise of a teaching skill for a shorter time in a more or less simpler and micro environment is called micro teaching." অর্থাৎ অনুকৃতি পাঠ বা অনুশিক্ষণ হল, শিক্ষণ সংক্রান্ত একক দক্ষতার অপেক্ষা ক্ষুদ্র সরল পরিবেশে স্বল্প সময়ের চর্চার জন্য শিক্ষণ এবং শিক্ষণ দক্ষতা পর্যালোচনার জন্য সংশোধনী নির্দেশ।

● **ব্যপ্ত শিক্ষণ ও অনুশিক্ষণের তুলনা :**

ব্যাপ্ত শিক্ষণ	অনুশিক্ষণ
(i) ব্যপ্ত শিক্ষণে শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-ভিত্তিক জ্ঞান লাভে সহায়তা করা হয়।	(i) অনুশিক্ষণের উদ্দেশ্য হল শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া।
(ii) ব্যপ্ত শিক্ষণে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশী।	(ii) অনুশিক্ষণে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক কম।
(iii) সাধারণত কোন বিদ্যালয়ের কোন শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা শিক্ষার্থী।	(iii) শিক্ষার্থীরাই এখানে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী।
(iv) সময়কাল দীর্ঘ। 35-40 মিনিট সাধারণত।	(iv) সময়কাল স্বল্প। সাধারণতঃ 5-10 মিনিট।
(v) সংশ্লেষধর্মী।	(v) বিশ্লেষধর্মী।
(vi) তিনটি স্তরে সীমাবদ্ধ পরিকল্পনা প্রয়োগ ও মূল্যায়ণ।	(vi) অন্তত 6টি স্তর-পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, প্রস্তুতি অনুশীলন, মূল্যায়ণ ও সঞ্চালন।
(vii) সংস্কারমূলক ব্যবস্থা অনেক পরে আসে।	(vii) তাৎক্ষণিক প্রতিসংকেত দেওয়া হয়।
(viii) শিক্ষার্থী শিক্ষক নিজ ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন নাও হতে পারেন।	(viii) এখানে নিজস্ব ত্রুটি সম্পর্কে শিক্ষার্থী শিক্ষক খুব সহজেই জানতে পারেন।
(ix) ফিডব্যাক পেতে অপেক্ষা করতে হয়।	(ix) ফিডব্যাক সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়।
(x) শ্রেণী পরিস্থিতি বাস্তব এবং স্বাভাবিক।	(x) শ্রেণী পরিস্থিতি কোন কোন সময় কৃত্রিম হয়।

৫.৩.৪ অনুশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য

অনুশিক্ষণের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য হল—

(1) নতুন পরীক্ষণ :

শিক্ষক - শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুশিক্ষণ নতুন পরীক্ষণ। বিশেষ করে শিক্ষার্থী শিক্ষণ বা শিক্ষণ অনুশীলনকালীন এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

(2) শিক্ষক - প্রশিক্ষণ কৌশল :

অনুশিক্ষণের উদ্দেশ্য হল শিক্ষকের আচরণের বা শিক্ষণ দক্ষতার উন্নতি ঘটানো।

(3) স্বাভাবিক ও বাস্তব শিক্ষণ :

শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু অর্থাৎ শিক্ষণের তিনটি মূল উপাদান অনুশিক্ষণে বর্তমান। তাই অনুশিক্ষণ হল স্বাভাবিক ও বাস্তব শিক্ষণ।

(4) স্বল্পস্থায়ী শিক্ষণ :

সময়সীমা 5 - 10 মিনিট

(5) ক্ষুদ্রশ্রেণী শিক্ষণ :

অনুশিক্ষণে শিক্ষার্থীর সংখ্যা 5 - 10 জন।

(6) তাৎক্ষণিক প্রতিসংকেত :

অনুশিক্ষণে ত্রুটি সংশোধন ও প্রেষণা সঞ্চার তাৎক্ষণিক প্রতিসংকেতের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

(7) বিশ্লেষণাত্মক :

এখানে শিক্ষণ পরিস্থিতি ও শিক্ষণ দক্ষতার বিশ্লিষ্ট একটি অংশকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(8) ব্যক্তিভূত প্রশিক্ষণ :

অনুশিক্ষণ হল সর্বোচ্চ মানের ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ নেওয়ার কৌশল।

(9) সুযোগ্য শিক্ষক প্রস্তুতি :

সুযোগ্য শিক্ষক তৈরী করার জন্য অনুশিক্ষণ একটি উপযুক্ত কৌশল।

(10) সংস্কার :

শিক্ষার্থী-শিক্ষক যতক্ষণ না পর্যন্ত নির্দিষ্ট দক্ষতাটি সঠিকভাবে অর্জন করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত বারংবার প্রয়োগের সুযোগ দেওয়া হয়।

৫.৩.৫ অনুশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা :

শিক্ষাবিজ্ঞানের গবেষণা এবং অনুসন্ধানে বারংবার দেখা গেছে অনুশিক্ষণ একটি অত্যন্ত কার্যকরী শিক্ষণ কৌশল, ভালো শিক্ষক তৈরী করার উপায়ও বটে। নানা কারণে তাই অনুশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সেগুলি হল —

(1) ব্যাপ্ত শিক্ষণের মতো অনুশিক্ষণও স্বাভাবিক ও বাস্তব শিক্ষণ। এই শিক্ষণে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু এই তিনটি উপাদানই বর্তমান থাকে।

(2) অনুশিক্ষণ হল সর্বোচ্চ মানের ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ নেওয়ার কৌশল।

(3) সুযোগ্য শিক্ষক তৈরীর জন্য অনুশিক্ষণ একটি উপযুক্ত কৌশল।

(4) অনুশিক্ষণে জ্ঞানলাভের পরিমাণ বিশাল।

(5) অনুশিক্ষণের ফোকাস হল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট দক্ষতার বিকাশ ঘটানো। এই দক্ষতাকে পাণ্ডিত্য অর্জন করানো যেতে পারে।

(6) অনুশিক্ষণে সাধারণত শ্রেণি শিক্ষকের জটিলতাকে শ্রেণীসাইজ, বিষয়বস্তু ও সময় অনুযায়ী ছোটো করে নেওয়া হয়।

(7) শিক্ষণ প্রোগ্রামে উচ্চমাত্রার নিয়ন্ত্রণ আনা হয় এবং প্রতিসংকেত দেওয়া হয়।

(8) ব্যপ্ত শিক্ষণে ফিডব্যাক পেতে অনেক সময় লাগে। কিন্তু অনুশিক্ষণে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে খুব দ্রুত ফিডব্যাক পাওয়া যায়। এদিক থেকে অনুশিক্ষণ বেশী ফলদায়ী।

(9) ব্যপ্ত শিক্ষণের তুলনায় অনুশিক্ষণের দ্বারা শিক্ষার্থী শিক্ষক খুব দ্রুত নিজের ত্রুটি সম্পর্কে জানতে পারে এবং নিজেকে সংশোধন করতে পারে।

(10) শিক্ষকের পারদর্শিতা বৃদ্ধির জন্য অনুশিক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজন।

(11) শিক্ষার্থী শিক্ষক যতক্ষন না পর্যন্ত নির্দিষ্ট দক্ষতাটি সঠিকভাবে অর্জন করতে পারে ততক্ষন পর্যন্ত তাকে সংশোধনের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।

(12) অনুশিক্ষণের দক্ষতা থাকলে অনেকক্ষেত্রে কম সময়ে ও কম শিক্ষার্থী থাকলেও শিক্ষক পঠনকার্য বিনা অবহেলায় যে কোন পরিস্থিতিতে চালিয়ে যেতে পারেন।

(13) সবশেষে বলা যায় যে বাস্তবে একজন দক্ষ শিক্ষকের অনুশিক্ষণ ও ব্যপ্ত শিক্ষণ উভয় দিকের জ্ঞান থাকা দরকার। ফলে যে কোন পরিস্থিতিতে যে কোন সময়ে তিনি তাঁর শ্রেণীকে কখনও বিশ্লেষণ করে কখনও সংশ্লেষণ করে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন। তাই অনুশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না।

আদর্শ পাঠ-পরিকল্পনার সংজ্ঞা; উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় বর্তমানে শিশুর আগ্রহ, চাহিদা এবং সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষাদানের জন্য বহুবিধ শিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে কোন পদ্ধতিতে কিভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করলে শিক্ষার্থীরা বেশী উপকৃত হবে সে সম্পর্কে আলোচনার শেষ নেই। বিদ্যালয়ে গতানুগতিকভাবে যে শিক্ষণ পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাতে শিক্ষক বক্তা এবং শিক্ষার্থীরা শ্রোতার ভূমিকা পালন করে। শিক্ষকই সেখানে সর্বেসর্বা এবং শিক্ষার্থীদের ভূমিকা নিতান্তই গৌণ। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ জন এডামস্ এর ভাষায় — ''Education is a bio-polar process.'' অর্থাৎ শিক্ষা হল একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। Bining Bining পাঠ পরিকল্পনা সম্পর্কে বলেছেন — ''Daily Lesson Planning involves defining the objectives, selecting and arranging the subject matter and determining the method and procedure.'' LK Davies মূলত Planing, Organising, Leading and Controlling এই চারটি শিক্ষণ পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেন — ''Lessons must be Prepared for there is nothing so fatal to a teacher's Progress as unpreparedness.''

Ryburn বলেছেন — পাঠ পরিকল্পনার ফলে ছাত্র-শিক্ষক উভয়েই উপকৃত হন এবং এর দ্বারা একজন শিক্ষক সুষ্ঠভাবে পাঠ দিতে সক্ষম হন। তিনি আরও বলেছেন— ''To teach we must use experience already gained as starting point of our work.'' অর্থাৎ শিক্ষণ প্রক্রিয়ার একদিকে আছেন শিক্ষক, অপরদিকে রয়েছে শিক্ষার্থী। শিক্ষকের সহায়তায় শিক্ষার্থী যাতে সক্রিয়ভাবে শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে অংশগ্রহণ করতে পারে তার জন্য শিক্ষককে এমনভাবে পাঠ পরিকল্পনা (Lesson Plan) রচনা করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ ও উৎসাহের সঞ্চার হতে পারে।

- **পাঠ পরিকল্পনার উদ্দেশ্যবলী :**

1) পাঠপরিকল্পনা তৈরী করা থাকলে শিক্ষার্থী-শিক্ষককে শ্রেণীতে পাঠদানকালে অপ্রস্তুত হতে হয় না।

2) শিক্ষার্থীরা মডেল অনুযায়ী পাঠদান একক তৈরী করতে পারবে।

3) শিক্ষণকার্য চালানোর সময় শিক্ষার্থীরা যে সমস্যায় পড়েন পাঠ পরিকল্পনা তৈরী করা থাকলে সেই সমস্যাগুলি পূর্ব থেকেই সমাধান করা সম্ভব হয়ে ওঠে।

4) পাঠ পরিকল্পনা তৈরীর ফলে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মিথস্ক্রিয়া দৃঢ় হয়।

5) পাঠ পরিকল্পনা তৈরী করা থাকলে শিক্ষার্থী শিক্ষক শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু, শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষণ কৌশলের কার্যকারিতা সম্পর্কে অবগত হতে পারেন এবং প্রয়োজন অনুসারে প্রতিক্ষেত্রে সংযোজন ও সংশোধন করে প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নতিসাধন করতে পারেন।

6) পাঠ পরিকল্পনা তৈরীর ফলে শিক্ষক আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে শ্রেণীতে পাঠদান করতে পারেন।

7) বিষয়বস্তুর ব্যাপারে শিক্ষকের কোনো জটিলতা থাকে না।

8) পাঠ পরিকল্পনা তৈরী থাকলে শিক্ষক তাঁর শ্রেণীকে খুবই সহজে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারেন।

9) পাঠ পরিকল্পনা তৈরীর সুবিধাগুলি খুব সহজে বুঝতে পারেন।

10) শ্রেণীতে সময়ের বিভাজন সম্পর্কে শিক্ষক সচেতন হতে পারেন ইত্যাদি।

11) পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষকের শিক্ষণ পটুত্ব বা দক্ষতা বিকাশে সহায়ক।

12) পূর্বকৃত পাঠ পরিকল্পনা পাঠদানকালে শিক্ষকের যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস দান করে।

13) পাঠ পরিকল্পনা তৈরীর ফলে শিক্ষকের চিন্তায় স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা আসে, চিন্তায় প্রতিবন্ধকতা থাকে না।

14) পাঠ পরিকল্পনা তৈরী থাকলে শিক্ষক তার পাঠে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকেন বলে ক্লাসে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে অপ্রস্তুত হতে হয় না। ফলে ক্লাসে শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়।

- **পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা :**

যে কোন উদ্দেশ্যমূলক কাজের মতো শিক্ষণ কার্য চালানোর জন্য পাঠ-পরিকল্পনা প্রয়োজন। আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠ পরিকল্পনা রচনা করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেখা দিয়েছে।

প্রয়োজনীয়তাগুলি হল —

(1) পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষে তাঁর পাঠদানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

(2) পাঠ পরিকল্পনা রচনা করার সময় শিক্ষক পাঠদানের বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করে নিতে পারেন।

(3) পাঠ পরিকল্পনা রচনা করলে শিক্ষক শিক্ষণ প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে সজাগ থাকতে পারেন।

(4) পাঠ পরিকল্পনা পাঠক্রমের প্রতিটি একককে সুন্দরভাবে বুঝতে সাহায্য করে।

(5) পাঠ্যবিষয়কে কিভাবে উপস্থিত করলে শিক্ষার্থীরা পাঠে আগ্রহী হবে তা পাঠ পরিকল্পনার দ্বারা ঠিক করা যায়।

(6) কিরূপ প্রশ্নের সাহায্যে গ্রহণ করলে, শিক্ষার্থীরা উত্তর দিতে পারবে এবং বিষয়টি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ জন্মাবে তা পাঠ পরিকল্পনা দ্বারা ঠিক করা যায়।

(7) পাঠ পরিকল্পনা থাকলে শিক্ষক খুব সহজেই শ্রেণীকক্ষের অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে এনে শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে বিশেষভাবে কার্যকরী করে তুলতে পারেন।

৫.৫.১ আদর্শ পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত করার কী কী দরকার :

(1) বিষয়ের জ্ঞান (Knowledge of the subject) : যে বিষয় নিয়ে পাঠটীকা প্রস্তুত করা সেই বিষয়ের উপর শিক্ষকের যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। পাঠ্যবই ছাড়া অন্যান্য সহকারী বইয়ের সাহায্য শিক্ষক এক্ষেত্রে নিতে পারেন।

(2) উদ্দেশ্যের স্বচ্ছতা (Clarity of Objectives) : যে বিষয়টির উপর পাঠটীকা রচনা করা হবে সেই বিষয়টি পড়ানোর কী কী উদ্দেশ্য রয়েছে সেই বিষয়ে শিক্ষকের সঠিক ধারণা থাকা দরকার।

(3) পূর্বজ্ঞানের ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা : পাঠ পরিকল্পনা রচনাকালে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য অনুযায়ী পূর্বজ্ঞানের ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা রাখবেন।

(4) শিক্ষণ নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা : শিক্ষণ নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দরকার পাঠ পরিকল্পনা রচনার জন্য।

(5) সমস্ত বিষয়ের ওপর সাধারণ ধারণা : পাঠ পরিকল্পনা রচনার সময় শিক্ষক নিজের বিষয়সহ সেই সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখবেন।

(6) শ্রেণীস্তর বা পর্যায় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা : কোন শ্রেণীর জন্যে শিক্ষক পাঠ পরিকল্পনা তৈরী করবেন সেদিকে তিনি নজর রাখবেন। অর্থাৎ তিনি শিক্ষার্থীদের রুচি সামর্থ, আগ্রহ অনুযায়ী পাঠ পরিকল্পনা রচনা করবেন।

(7) বিষয়কে উপএককে বিভাজন : পাঠ পরিকল্পনা রচনার সময় শিক্ষক পাঠ্যাংশ অবলম্বনে প্রয়োজনে বিষয়কে কয়েকটি উপএককে ভাগ করে নেবেন। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষক - শিক্ষার্থীদের সহায়তায় এবং তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কতটা পাঠদান করতে পারবেন সেই অনুযায়ী পাঠ - পরিকল্পনার একক - উপএককের বিভাজন করবেন।

(8) শিক্ষন পদ্ধতি নির্বাচন : পাঠ পরিকল্পনা রচনার সময় শিক্ষক নিজের কল্পনায় পাঠদান পদ্ধতিও ঠিক করে নিতে থাকেন। ফলে শিক্ষার্থী - শিক্ষক উভয়েই উপকৃত হয়।

(9) শিক্ষোপকরণের ব্যবহার : শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকষর্ণের জন্য পাঠটীকা রচনাকালে শিক্ষোপকরণে সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষক কল্পনা করে নেবেন।

(10) সময়জ্ঞান : পাঠ পরিকল্পনা রচনার সময় শিক্ষককে মনে রাখতে হবে সমগ্র পরিকল্পিত বিষয়ের কোন অংশে কত সময় লাগবে এবং শিক্ষাসহায়ক উপকরণগুলি এই নির্দিষ্ট সময়ের কোন অংশে কিভাবে দেখাবেন তা ঠিক করে রাখবেন। তাই শিক্ষকের সময়-জ্ঞান থাকা অবশ্যই জরুরি।

(11) নমনীয়তা : পাঠ-পরিকল্পনার নির্দিষ্ট নিয়ম থাকলেই শিক্ষক প্রয়োজনে পঠন-পাঠনকালে তা পরিবর্তন করতে পারেন। শিক্ষকের প্রধান কাজ হল বিভিন্ন শিক্ষা সহায়ক উপকরণ সহযোগে শিক্ষার্থীদের কাজে সহজ সরলভাবে মূল বিষয়টি পৌঁছে দেওয়া।

৫৫.২ আদর্শ পাঠ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য :

আদর্শ পাঠ পরিকল্পনার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। যথা—

(1) পূর্বজ্ঞান : পাঠ পরিকল্পনা রচনা করা হবে অবশ্য পূর্বজ্ঞান ভিত্তিতে।

(2) এককের উপএককে বিভাজন : তিন ধরনের পাঠটীকা আছে জ্ঞানমূলক, দক্ষতামূলক এবং রসবোধমূলক পাঠ — এই তিন ধরনের পাঠটীকা নির্মিতিতে যে পদ্ধতিক্রম আছে তা মেনে চলতে হবে। প্রত্যেকটি পাঠকে প্রয়োজনে কয়েকটি একক এবং উপএককে ভাগ করে নিতে হবে।

(3) উদ্দেশ্যভিত্তিক : প্রত্যেকটি পাঠ পরিকল্পনা রচনার কতকগুলি উদ্দেশ্য থাকে। পাঠ পরিকল্পনা রচনার কতকগুলি সাধারণ উদ্দেশ্য ও কতকগুলো বিশেষ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে দিতে হবে।

(4) উপযুক্ত শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার : পাঠ পরিকল্পনা রচনাকালে চক্, ডাস্টার, বই, ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদি সাধারণ উপকরণ ছাড়াও চার্ট, ছবি, মডেল, ডায়াগ্রাম ইত্যাদি কী কী বিশেষ উপকরণ ব্যবহৃত হবে তা শিক্ষক আগে থেকে ঠিক করে নেবেন। এবং সেগুলি যাতে ঠিক ঠিক সময় ব্যবহৃত হয় শিক্ষক সেটি মনে রাখবেন।

(5) শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষণ কৌশল ব্যবহার : শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে কোন শিক্ষণ পদ্ধতি, কোন শিক্ষণ কৌশল কী পরিস্থিতিতে কীভাবে প্রয়োগ করবেন তা পাঠ পরিকল্পনা রচনা করার সময় মনে রাখবেন। সে অনুযায়ী তিনি পাঠ পরিকল্পনা রচনা করবেন।

(6) কার্যপদ্ধতি স্থিরীকরণ : শ্রেণীকক্ষে পাঠদানকালে শিক্ষক কীভাবে মূল বিষয়টি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করবেন, কখন চার্ট দেখাবেন, কখন মডেল দেখাবেন, বোর্ডে কখন কী লিখবেন, শিক্ষার্থীদের কীভাবে কী প্রশ্ন করবেন, প্রশ্নগুলি কেমন হবে ইত্যাদি পাঠ পরিকল্পনা রচনাকালে শিক্ষককে ঠিক করে নিতে হবে।

(7) ভাষার সারল্য : সহজ-সরল চলিত ভাষায় পাঠ পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। কোন অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। শিক্ষকের উচ্চারণ স্পষ্ট ও আদর্শ হতে হবে, কোনরকম আঞ্চলিকতা থাকলে চলবে না।

(8) অনুবদ্ধ প্রণালীর ব্যবহার : পাঠ পরিকল্পনায় ব্যবহৃত প্রত্যেকটি বক্তব্যের মধ্যে যেন পারস্পরিক পারম্পর্য রক্ষা হয় এবং যেন বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(9) ব্যক্তিগত নির্দেশনা : প্রত্যেকটি পাঠটীকায় ব্যক্তিগত নির্দেশনা থাকা দরকার। শ্রেণীকক্ষে কারও কোন সমস্যা থাকলে যেন সহজেই তার সমাধান করা যায়।

(10) সময়চেতনা : নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যতটুকু অংশ শিক্ষণ দেওয়া যাবে, সেই অনুযায়ী পাঠ পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। তাই শিক্ষণ কার্য চালানোর জন্য এবং পাঠটীকা তৈরীর সময় শিক্ষকের জ্ঞান থাকা জরুরি।

(11) অনুসন্ধানী প্রশ্নের সুযোগ : পাঠ পরিকল্পনায় যাতে অনুসন্ধানী প্রশ্নের সুযোগ থাকে এবং শিক্ষার্থীরা যাতে সেগুলি প্রয়োগ করার সুযোগ পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(12) ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার : ব্ল্যাকবোর্ড হচ্ছে শ্রেণীতে সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যবহৃত উপকরণ। পঠনকার্য চলাকালীন ব্ল্যাকবোর্ড যাতে ঠিকঠাকভাবে ব্যবহার করা যায় তা পাঠ পরিকল্পনা রচনাকালে শিক্ষক ঠিক করে রাখবেন।

(13) মূল্যায়ণ : মূল্যায়ণের মাধ্যমে শ্রেণী শিক্ষণে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির হার যাচাই করা হয়। সেজন্য পাঠ-পরিকল্পনা রচনায় মূল্যায়ণের একটা সুযোগ থাকে।

(14) বাড়ির কাজ : প্রত্যেকটি পাঠ পরিকল্পনায় বাড়ির কাজের একটা জায়গা থাকে। শ্রেণীকক্ষের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যেগুলি করা সম্ভব নয় তার উপর ভিত্তি করে কোন দক্ষতামূলক বা রচনাধর্মী বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন বাড়ির কাজের জন্য বরাদ্দ রাখা দরকার। উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে আদর্শ পাঠ-পরিকল্পনা গড়ে ওঠে।

৫.৫.৩ পাঠ পরিকল্পনার নমুনা

বিদ্যালয়ের নাম —
শ্রেণী — অষ্টম
বিভাগ —
গড় বয়স — ১৩ +
সময় — ৪০ মিনিট
শিক্ষার্থী সংখ্যা — ৩৮
উপস্থিতি — ৩২
শিক্ষার্থী শিক্ষকের নাম
তারিখ

বিষয় — বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
একক — 'বনভোজনের ব্যাপার'
— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
উপএকক —
*(ক) ''হাবুল সেন বলে যাচ্ছিল ... রক্ত পড়ছে তখন।''
(খ) ''রাজহাঁস এমন রাজকীয়...একটা বেজে গেল।''
(গ) ''টেনিদা...বাগানের দিকে ছুটল।''
আজকের পাঠ- * চিহ্নিত অংশ

পূর্বার্জিত জ্ঞান

* শিক্ষার্থীরা ইতিপূর্বে প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের গদ্য রচনা পাঠ করেছে।
* চড়ুইভাতি, পিকনিক, ফিস্ট ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটেছে।
* এই পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের কয়েকটি প্রশ্ন করা হবে।

(1) তোমরা কি কেউ পিকনিক করেছো?
(2) বলতো পিকনিক বলতে আমরা কি বুঝি?

উদ্দেশ্য

(ক) সাধারণ উদ্দেশ্য/অনুভূতিমূলক স্তর :

(i) শিক্ষার্থীরা গদ্যপাঠে অনুরাগী হবে।
(ii) শিক্ষার্থীরা গদ্যটির অর্থ সম্পর্কে অবহিত হবে।
(iii) শিক্ষার্থীদের মধ্যে চিন্তন শক্তি বিকাশ সাধিত হবে।

(খ) বিশেষ উদ্দেশ্য বৌদ্ধিক স্তর :

জ্ঞানমূলক

(i) শিক্ষার্থীরা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে জানতে পারবে।
(ii) গল্পটি মূল বিষয়বস্তু স্মরণ করতে পারবে।
(iii) গল্পটিতে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ শব্দও প্রসঙ্গগুলি চিহ্নিত করতে পারবে।

বোধমূলক

(i) শিক্ষার্থীরা গদ্যের বিভিন্ন অংশের মূল বক্তব্য অনুভব করতে পারবে।

(ii) গদ্যে বর্ণিত বনভোজনের প্রকৃতি উপলব্ধি করতে পারবে।

(iii) শিক্ষার্থীরা নিজেদের জীবনে করা পিকনিকের সঙ্গে গদ্যে বর্ণিত বনভোজনের মধ্যে সম্পর্ক নিরুপণ করতে পারবে।

প্রয়োগমূলক

(i) শিক্ষার্থীরা গদ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দগুলির বাক্যরচনা করতে পারবে।

(ii) বনভোজনের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

(iii) শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শব্দের সমার্থক শব্দ নির্ণয় করতে পারবে।

অভিব্যক্তিমূলক

শিক্ষার্থীরা গদ্যটির উপলব্ধি করে নিজের ভাষায় অভিব্যক্ত করতে পারবে।

(গ) সঞ্চালনমূল স্তর/দক্ষতামূলত :

সুষ্ঠু উচ্চারণে, ছেদ-যতি-বিরামচিহ্নের যথাযথ প্রয়োগের দ্বারা শিক্ষার্থীরা গদ্যাংশটি পাঠ করতে পারবে।

শিক্ষা সহায়ক উপকরণ

(ক) সাধারণ উপকরণ — চক, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদি।

(খ) বিশেষ উপকরণ — চার্ট, নির্দেশক দণ্ড, ভিডিও রেকর্ডিং ইত্যাদি।

শিক্ষকের ক্রিয়াকলাপ	শিক্ষার্থীর ক্রিয়াকলাপ
মিথস্ক্রিয়ামূলক প্রশ্নাবলী ও প্রতিপোষণ	প্রত্যাশিত অনুক্রিয়া ও প্রতিপোষণ
১) পিকনিক করতে তোমাদের ভালো লাগে?	১) হ্যাঁ ভালো লাগে।
২) বনে পিকনিক করলে তাকে কী বলা হয়?	২) বনভোজন।
৩) টেনিদা চরিত্রটি কার সৃষ্টি বলত।	৩) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

পাঠ ঘোষণা

আজ তোমরা সেই বিখ্যাত লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'বনভোজনের ব্যাপার' গদ্যের প্রথম অংশ (অনুচ্ছেদ ১-৪২) নিয়ে আলোচনা করব।

গদ্য

'বনভোজনের ব্যাপার' — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

''হাবুল সেন বলেদিচ্ছিল — পোলও, ডিমের ডালনা, ... দরদর করে রক্ত পড়ছে তখন।''

শিক্ষকের ক্রিয়াকলাপ		শিক্ষার্থীর ক্রিয়াকলাপ
বিষয়সংক্ষেপ - অভীষ্টের ক্রমানুযায়ী	মিথস্ক্রিয়ামূলক প্রশ্নাবলী ও প্রতিপোষণ	প্রত্যাশিত অনুক্রিয়া ও প্রতিপোষণ
লেখক পরিচয় : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৯১৭ সালে দিনাজপুর জেলায় বালিডাঙিতে জন্মান। আদিবাড়ি বাংলাদেশে। তাঁর আসল নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। উপনিবেশ, সূর্যসারথি, ইতিহাস ইত্যাদি গ্রহ তিনি রচনা করেন। ১৯৭০ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। বিষয়সংক্ষেপ : পিকনিকে কি কি খাওয়া হবে তারই একটা তালিকা টেনিদা তৈরী করেছেন। সঙ্গে রয়েছেন হাবুল সেন, লেখক স্বয়ং ও ক্যাবলা। পোলাও, ডিমের ডালনা, রুইমাছের কালিয়া, মাংসের কোর্মা ইত্যাদি। টেনিদা ওতে রাজি হয়নি। নতুন তালিকা খিচুরি, আচার, পোনামাছের কালিয়া, আলু ভাজা ইত্যাদি কে কী রান্না করবে, ডিম আনতে গিয়ে লেখক প্রাণে বাঁচতে পেরেছিলেন।	১) লেখকের নাম কি? ২) তাঁর কত সালে জন্ম? ৩) আদি বাস কোথায়? ৪) আসল নাম কি? ৫) তিনি কত সালে মারা যান? ৬) পিকনিকের দলপতি কে? ৭) কতজন ছিলেন? ৮) তাদের নাম কি? ৯) পোনামাছের কি রান্না হবে? ১০) কার হাতে হাঁস কামড়ে ছিল?	১) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। ২) ১৯১৭ খ্রীঃ। ৩) বাংলাদেশ। ৪) তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৫) ১৯৭০ খ্রীঃ ৬) টেনিদা। ৭) চারজন। ৮) টেনিদা, হাবুল সেন, লেখক ও ক্যাবলা। ৯) কালিয়া। ১০) লেখকের হাতে।

মূল্যায়ন	
শিক্ষকের ক্রিয়াকলাপ	শিক্ষার্থীর ক্রিয়াকলাপ
(1) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি গ্রন্থের নাম বল।	(1) সূর্যসারথি।
(2) পিকনিকে কি রান্না হবে ঠিক হল?	(2) খিচুড়ি।
(3) মিষ্টির মধ্যে কি ছিল? / কি মিষ্টি ছিল বনভোজনের আয়োজনে?	(3) রসগোল্লা।
(4) লেখকের হাতে কিসে কামড়ে দিয়েছিল?	(4) রাজহাঁস।

৫.৬ সংক্ষিপ্তকরণ

- প্রাচীণকালে 'শিক্ষণ' কথাটি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হত। তখন শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে দাতা-গ্রাহীতার সম্পর্ক আছে ধরা হত। কিন্তু বর্তমানে — বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী ও কৌশল সমূহের সার্থক সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন সহায়তার জন্য শিখন কার্য চলাকালীন শিক্ষক যে শিক্ষণীয় আচরণ করেন, তাকে শিক্ষণ বলা যায়।
- অন্যদিকে, বর্হিজগৎ বা পরিবেশ ব্যক্তির মধ্যে অভিযোজন করার তাগিদ সৃষ্টি করে তখন ব্যক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে, যার ফলস্বরূপ ব্যক্তি নতুন আচরণ সৃষ্টি করে, ঐ নতুন আচরণ সৃষ্টিপূর্ব মুহূর্তকে শিখন বলে।
- শিক্ষণ সংক্রান্ত একক দক্ষতা মাত্র ৫-১০ মিনিটে মধ্যে শ্রেণী কক্ষের বাস্তব পরিস্থিতিতে অনুশীলন করাকে অনুকৃতি পাঠ বলা যায়। অনুকৃতি পাঠে দশ জনে একটা গ্রুপ থাকে। এই অনুকৃতি পাঠ অনুশীলন চক্রে প্রত্যেক শিক্ষার্থী এক একবার শিক্ষক হন, অন্য দুজন করে পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় থাকেন, বাকী ৭জন পর্যায়ক্রমে ছাত্রদের ভূমিকা পালন করেন। সমস্ত শিক্ষার্থীকেই বিভিন্ন skill-এর উপরে TLM সহযোগে পাঠদান করতে হয় এবং Lesson তৈরী করতে হয়।
- অন্যদিকে ব্যাপ্ত পাঠে কোন বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষে বিদ্যালয়ের সময় তালিকা অনুসরণ (৩৫-৪০ মিনিট) করে শিক্ষার্থী শিক্ষককে শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে পাঠদান প্রক্রিয়া চালাতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষকে Lesson, TLM ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার ইত্যাদি সহযোগ ব্যাক্তিত্ব দৃঢ় করার সুযোগ থাকে। আলোচনা-প্রশ্নোত্তর, বিষয়ের মূর্ততা, শিক্ষোপকরেণ ব্যবহার, সময় জ্ঞান, শিক্ষার্থীদের রুচি ও সামার্থ মেনে পাঠ দিতে হয়।
- পাঠ-পরিকল্পনা প্রস্তুত করলে শিক্ষকের বিষয়ের স্পষ্ট জ্ঞান, উদ্দেশ্যের স্বচ্ছতা, সময় জ্ঞান, TLM ব্যবহারে কৌশল জানা, ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার সম্পর্কে সঠিক ধারণা তৈরী হয়।

৫.৭ অনুশীলনী

ক) পাঠ-পরিকল্পনা প্রস্তুতির উদ্দেশ্য কী? পাঠ-পরিকল্পনা প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা বিচার করুন?

খ) আদর্শ পাঠ-পরিকল্পনা কাকে বলে? পাঠ-পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১) সেন, 'মলয় কুমার' 'শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞান' সোমা বুক এজেন্সি, ২০১২-২০১৩।

২) গুপ্ত, অশোক, 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতির রূপরেখা' সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০১৩।

৩) চট্টোপাধ্যায় কৌশিক, ''মাতৃভাষা শিক্ষণ-বিষয়ও পদ্ধতি', রীতা পাবলিকেশন, আগষ্ট ২০১৪-২০১৫।

৪) মিশন, সুবিমল, 'বাংলা শিক্ষণ পদ্ধতি', রীতা পাবলিকেশন, সেপ্টেম্বর ২০১০।